

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়

হিরণ্ময় ঘোষাল



ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল, পোলদেশের ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব
ধ্যাপক, প্রায় বারো বছর ইউরোপ-প্রবাসের পর সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।
নি ফরাসী, ইংরেজী, রুশীয় ও পোলীয় ভাষা এবং সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী।
া' ছাড়া প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় আর্য্যভাষা ও সাহিত্য এঁর অল্প-বিস্তর জানা
াছে। বারো বছর প্রবাসকালে ইনি খাঁটি বাঙ্গালী তথা ভারতীয় মন
নয়ে ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হবার প্রয়াস পেয়েছেন।
ার এই ব্রতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে
ার রচিত এই বইখানিতে।

পোল-জার্মান যুদ্ধ ইনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এই বর্তমান মহাসমরের
তিবৃত্ত তাঁর গ্রন্থের স্থধু প্রতিপাদ্য-বস্তু মাত্র। বইখানির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা
রেছে তাঁর অপূর্ব্ব রচনা-ভঙ্গী। তাঁর যুদ্ধের বিবৃতি-বিষয়ক এই গ্রন্থ বাংলা
াহিত্যে অভিনব এবং অভূতপূর্ব্ব। যাঁরা যুদ্ধের অরঞ্জিত, বাস্তব রূপকে
র্চক্ষে দেখতে চান্ তাঁরা এই বইখানি পড়ে' দেখুন। এর যে-কোনো
াতা খুললেই পাঠক উপলব্ধি করবেন, ডক্টর ঘোষাল পাণ্ডিত্যের পুষ্টিতে
ার সূক্ষ্ম ও সজীব মনকে স্থূলকায় ও নির্লিপ্ত হ'তে দেন নি।

ডক্টর ঘোষালের জন্ম কলিকাতায়, ১৩১৫ সালে, শ্রাবণ মাসে। প্রেসিডেন্সী
লেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেই থেকে
িনি ইউরোপের বহু দেশে স্থধু ভ্রমণ নয়, বসবাসও করেছেন। ইনি ভারশৌ
শ্ববিদ্যালয় থেকে রুশীয় ও পোলীয় সাহিত্যে ডক্টরেট্ উপাধি অর্জন করেন।

ইউরোপ-প্রবাসকালে ইনি বহু ভাষায় নানা রচনা প্রকাশ করেছেন।
ন্তু তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের সেবা করা। তাঁর
ই ঐকান্তিক কামনার প্রথম পরিপূর্তি—মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়।

প্রকাশক।

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি

ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল

ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং

১০৫ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৮ ।

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত ; এবং ট্রুথ প্রেস ৩, নন্দন রোড হইতে
শ্রীসুধাংশু রঞ্জন সেন কর্তৃক মুদ্রিত ।

শুনহ মানুষ ভাই।

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

ভাষা ও জাতিগত পার্থক্য হিসেবে সারা ইউরোপটাকে মোটামুটি তিন ভাগে অংশিত করা যায়। লাতিন, জর্ম্মান ও স্লাভ। ইঙ্গস্থানের দ্বীপময় যুক্তরাজ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিচারে ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হ'লেও, এবং ভাষা ও জাতিতে ব্রিতানীয়রা ইউরোপীয়দের অগ্রগণ্য হ'লেও, ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কারণে ব্রিতানিয়া ইউরোপের বহির্ভুক্ত। উপরি-উক্ত তিন মহাজাতি বহু শতাব্দী যাবৎ এমনভাবে অধ্যুষিত যে, কোনো শক্তিমান্ নায়কের উত্তেজনায় অধুনা-বিভক্ত উপজাতিসমূহের ভেতর একটি বিশেষ মহাজাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠা আশ্চর্য্য নয়। এক গোষ্ঠী-ভুক্ত উপজাতিদের মধ্যে প্রতিবেশী অন্য গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতিদের প্রতি বিরূপতা ইউরোপ-মহাদেশে সহজেই নজরে পড়ে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁদের কেতাবে কেবল ইউরোপের নানা খণ্ড খণ্ড দেশের অভ্রভেদী জাতীয়তা-বোধের কথাই দেখতে পাই। কিন্তু ইউরোপের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এমন কি পুল্‌ম্যান্ বা ভাগঁলি'র ডাব্বায় চড়ে' টহল দিয়ে এলেই বুঝতে পারি, ওদেশের জাতিভেদ গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে। শুনি, এক অপরের প্রতি লাতিন, জর্মান বা স্লাভ বলে' গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ

করছে। কথাটা খুব সরল বলে'ই উনবিংশ শতাব্দীর নানা ফ্যাসান্ বিলাসী রাষ্ট্রনৈতিক ইস্কুলে পড়া রাষ্ট্রবিধাতাদের মাথায় তা প্রবেশ করে নি। ইউরোপে গোষ্ঠী-ভেদ যে ব্যক্তি প্রথম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করলে তার হাতে না ছিল সাদা দস্তানা, মাথায় না ছিল আভিজাত্যের কালো টোপর-টুপি। পরন্তু, তার প্রথম যৌবনে বাঁ হাতে ছিল রঙের বাল্‌তি, ডান হাতে ছিল ঘরে-দোরে রং লাগাবার বুরুশ্। বন্ধু ও পরিচিতদের অভিবাদন করবার সময় বেচারাকে রং-মাখানো হাতের তেলো দেখিয়ে করমর্দনে অসামর্থ্য-জ্ঞাপন করতে হ'তো। তার পর গত মহাযুদ্ধে সেনা-বিভাগে আর্দালী-গিরি করবার সময় এবং পরজীবনে নানা বিবর্তন-বিপর্যায়ের ভেতর দিয়ে যাবার সময়, এই লোকটি এই সামান্য কথাটা গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে, জার্মানীর উৎকর্ষ সুধু তদানীন্তন জর্মান রাষ্ট্রের নয়, সমগ্র জর্মান গোষ্ঠীর প্রাধান্য ব্যতিরেকে হওয়া অসম্ভব। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর থেকে সে দিবারাত্র জর্মান গোষ্ঠীর একত্রীকরণের নেশায় মশ্‌গুল্ হয়ে থাক্‌তো, এবং একদা নেশার ঘোরে এই একত্রীকরণের বীজমন্ত্র তার কাছে অভিব্যক্ত হলো—"আর্য্য, উত্তর-কৌরব!"

ভূগোল, পুরাণ, ইতিহাস কিছুরই তোয়াক্কা না রেখে এই ব্যক্তি ঘোষণা করলেন, যে "উত্তর-কুরুর" প্রসার হ'চ্ছে নরোয়ে থেকে আউস্ট্রিয়া পর্য্যন্ত এবং হলান্দ্ থেকে জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত। এই নব-পরিকল্পিত জর্মান উত্তর-কুরুকে বাস্তবে পরিণত করার পথে চারটি প্রধান অন্তরায় দেখা গেল। জর্মান-গোষ্ঠী-ভুক্ত উপজাতির জাতীয়তা-বোধ, এবং যথাক্রমে ব্রিতানীয় যুক্তরাজ্য, লাতিনী গোষ্ঠী ও স্লাভ-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা। চারটি প্রশ্নের আপাত-ব্যবহার্য্য সমাধান মিলতে দেরী লাগলো না। জর্মান-গোষ্ঠী-ভুক্ত উপজাতিসমূহের ভেতর চললো নানা রংচঙে প্রোপাগান্দা। ব্রিতানীয়ার

উদ্দেশে বর্ষিত হ'লো বাছা বাছা, মুখরোচক এবং উম্‌দা স্তোকবাক্য। সাহিত্যে ও দৈনিকে ছাপা হ'তে লাগ্‌লো ভূরি ভূরি ব্রিতানীয় সাম্রাজ্যের পাঁচালী।

শেষোক্ত দুই প্রশ্নের সমাধান অত সহজে হবার নয়। কারণ এখানে গোষ্ঠী-বিরোধ। ইউরোপের তিন মহাজাতির মধ্যে স্লাভরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হ'লেও তারা নানা ঐতিহাসিক কারণে শতধা বিভক্ত—এবং লাতিনদের মধ্যে গোষ্ঠী-প্রীতি থাকলেও তারা ভাবপ্রবণ। উভয় মহাজাতিরই গোষ্ঠী-প্রীতিকে চূর্ণ করে' তাদের কাবু করতে হ'লে চাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদনীতি। এই ভেদনীতির খেলায় এই ব্যক্তির মত খেলোয়াড় দ্বিতীয় মিললো না। চললো লাতিন আর স্লাভদের ঘরভাঙানোর খেলা।

ইস্পানিয়া ও ইতালিয়াকে ফরাসী সাম্যবাদ ও রুশ বল্‌শেভিক্‌বাদের জুজু দেখিয়ে হাত করা হ'লো। তা ছাড়া ইতালিয়ার কাণে দিবারাত্র ফিস্‌ফিসিনি চলতে লাগলো, তার নব উদীয়মান সাম্রাজ্যের পরম শত্রু ব্রিতানীয় ও ফরাসী সাম্রাজ্য, যাদের সঙ্গে তার স্বার্থের সংঘাত প্রতি পদে, বিশেষ করে' আফ্রিকায়, এই সব কথা বলে'। মুসোলিনীর সঙ্গে এই ব্যক্তির ঘন ঘন মোলকাৎ ও প্রেম-তেলেগ্রাম বিনিময়ের ফলে সৃষ্টি হ'লো কৃত্রিম রোম-বার্লিন অক্ষদণ্ড।

ইউরোপের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে স্লাভ-গোষ্ঠীর ভেতরও জার্মানীর ভেদনীতি পূরোদমে চালু হ'লো। চেক্ আর রুশদের বিরুদ্ধে তাদের জ্ঞাতিশত্রু পোলদের উত্তেজিত করা হ'লো, এবং যুগোস্লাভিয়াকে অর্থনৈতিক অসুবিধার ভয় দেখিয়ে রুশদের সঙ্গে বিশেষ মাথামাখি করতে দেওয়া হ'লো না। তার ওপর একেবারে হাতের মুঠোয় পাওয়া গেল উক্রাইনীদের, যাদের এক প্রাগৈতিহাসিক দেশ অধিকার করার জন্যে পোল আর রুশদের ওপর সমান আক্রোশ।

'৩৮ সালের গোড়ায় আউস্ট্রিয়া অধিকার করার পরই হৃতসম্ভ্রম মুসোলিনীর সঙ্গে এই ব্যক্তির দহরম-মহরম বেড়ে গেল। সুতরাং লাতিন-গোষ্ঠী দস্তুরমত জখম হ'লো। অপেক্ষাকৃত সহজ, জর্মান-গোষ্ঠীর একীকরণের কাজ আপাততঃ স্থগিত রেখে ইনি স্লাভদের দিকে চোখ ফেরালেন।

এরই বিশ্ব-বিশ্রুত "মাইন্ কাম্প্ফ্" বা "আমার গুণ্ডামি" নামক পুঁথিতে ঠারেঠোরে এবং প্রকাশ্যে এসব মৎলবের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। পশ্চিমে ফরাসীদেশের ওপর চড়াও হওয়া এবং পূর্বে উরালপর্বত পর্য্যন্ত গোটা ইউরোপীয় রুশদেশটাকে জয় করা ও তৎসহ পোলদের, চেক্‌দের ও অন্য নানা খুচরো খাচরা স্লাভ দেশ এবং জাতিদের জার্মানীর তাঁবের আনা, "আমার গুণ্ডামি" কেতাবের সদভিসন্ধিগুলির অন্যতম। বইখানি ছাপা ও নানা ভাষায় অনূদিত হওয়া সত্ত্বেও সবাই ভাবলে, লেখক ষ্টিভেন্ লী ককের কায়দায় ওজস্বিনী ভাষায় নিছক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আউস্ট্রিয়া অধিকার করবার পর অনেকেই উপলব্ধি করলে, ভদ্রলোকের কথার ঠিক আছে, এবং তিনি আর যাই করুন, রস-বোধের তোয়াক্কা রাখেন না।

স্লাভ-গোষ্ঠী ধ্বংস করবার প্রথম সোপান ক্ষিপ্র বর্দ্ধিষ্ণু চেকোস্লোভাকিয়া। আউস্ট্রিয়া অধিকারের পর বৃহত্তর জার্মানীর বাহুবেষ্টনী এই উদ্বুদ্ধ ও প্রগতিশীল স্লাভ রাষ্ট্রকে আপন পরিধিভুক্ত করবার জন্য উদ্যত হ'লো। এইখানেই বর্তমান সংগ্রামের প্রারম্ভ।

স্লাভ-গোষ্ঠীর দুই সমৃদ্ধ রাষ্ট্র, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোলদেশের ধ্বংসের ইতিহাস নিয়েই উপস্থিত মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়। এই দুই শান্তিপ্রিয় স্লাভ-জাতির ওপর হিটলার-বাহিনীর যথেচ্ছ আক্রমণের সময়ে যা যা কর্ণ-গোচর ও দৃষ্টি-গোচর হয়েছে,তারই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিম্নবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পংক্তিবদ্ধ করলাম।

'৩৬ সালের গরমের ছুটির সময় প্রাহায় ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের এক জল্‌সা হয়। তখন আমি পোলদেশের ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। পাশাপাশি দেশ, তবুও এতদিন প্রাহায় যাওয়া ঘটে ওঠে নি। ভারতীয়দের জল্‌সায় আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্রই চেকোস্লোভাকিয়া যাত্রা করলাম।

পোলদেশের সীমান্ত জেব্‌ঝিদোভীৎসে আর চেক্‌ প্রত্যন্ত পেত্রোভিৎসে, কোথায় যে এদের সুরু আর কোথায় শেষ, তা বলা শক্ত। রেলকর্মচারী ও পুলিসের পোষাকের হেরফের ছাড়া আর কোনো বিশেষ পার্থক্য ঠাহর হয় না। পোলভাষা জানা থাকলে সহযাত্রী চেক্‌ বা স্লোভাক্‌দের সঙ্গে চালদালের দাম থেকে আরম্ভ করে' আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি পর্য্যন্ত, সব বিষয়ে অক্লেশে আলোচনা করা চলে। পরের দিন ভোরে প্রাহায় পৌঁছে মনে হ'লো, যেন ক'লকাতা ছেড়ে গৌহাটি বা কটকে এসে পড়েছি। কতকটা কটক বলেই মনে হয়, কারণ চেক্‌রা "ল" "স্থানে" "ড়" উচ্চারণ করে। "পলিতিকা"র জায়গায় শুনি "পড়িতিকা", "লিতেরাতুরার" স্থলে শুনি "ড়িতেরাতুরা।"

বহু শতাব্দী ধরে জার্মানীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হ'য়েও মধ্যযুগের

বনেদী ঘরের মেয়ে বোহেমিয়া আজও আত্মবিস্মৃত হ'তে পারে নি। তার আভিজাত্যের আত্মকাহিনী প্রাহার পথে ঘাটে উৎকীর্ণ। এতদিন তার ওপর পড়েছিল জার্মানী আর আউস্ট্রিয়ার "কুলটুরের" কলঙ্ক। মহর্ষি মাসারিক্ বোহেমিয়ার বিলুপ্ত খান্দান্ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। স্বাধীন চেকো-স্লোভাকিয়ার ঘরে-দোরে জার্মাণ "সভ্যতার" ছাপ লেগে ছিল, তা অল্প আয়াসেই ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে গেল। প্রদেশ, নগর, পথ-ঘাট সর্বত্র স্লাভ্-ভাষার প্রচলন হ'লো, এমন কি দোকান-পাটের নাম-লিপি পর্য্যন্ত বিদেশী ভাষায় লেখা শাস্তি-বিধেয় বলে' ঘোষণা করা হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠ্‌লো চেকো-স্লাভদের বিস্মৃত জাতি-গৌরব। জগতের সভায়, সভ্য ও স্বাধীন বলে' পরিগণিত হওয়ার যে দায়িত্ব তা পরিপূর্ণরূপে পালন করবার জন্যে এবং আপন জাতি-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যে এই ক্ষুদ্র স্লাভ পরিবার বদ্ধপরিকর হ'লো।

প্রাহার পথ চলতে চলতে তারই রূপ সর্বত্র চোখে পড়ে।

চেকো-স্লোভাক্ রাষ্ট্রের অংশীদার যে শুধু চেক্‌রা নয়, তা তার নাম থেকেই সহজে প্রতীয়মান হয়। সংখ্যা-গরিষ্ঠ চেক্‌রা গুণ্‌তিতে ৭০,০০০০০, স্লোভাক্‌রা কুড়িয়ে বাড়িয়েও ৩০,০০০০০ হবে না, রুশিন্-উক্রাইনীদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৫,৫০০০০, হাঙ্গারীয়রা সংখ্যায় ৭,০০০০০ আর জার্মানরা অল্পাধিক ৩২,৫০০০০। '৩৮ সালের আদমসুমারির হিসেবে উপরি উক্ত অঙ্কগুলি পাওয়া যায়। প্রথম তিনটি জাতি স্লাভ-গোষ্ঠী-ভুক্ত। তার মধ্যে চেক্ আর স্লোভাক্‌দের পৃথক্ জাতি বলে' গণ্য করা সেই অনুপাতে সত্য, যেমন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গবাসীদের স্বতন্ত্র জাতি বলে' অভিহিত করা। আউস্ট্রিয়ার সূক্ষ্ম ভেদনীতি অধীন স্লাভজাতীসমূহের মধ্যে স্ব স্ব জাতীয়তাবোধ বরাবর জিইয়ে রেখেছিল, যাতে কোনোক্রমে স্লাভরা এককাট্টা হয়ে স্বাধীনতার দাবী না করতে পারে। স্বাধীন হবার

পর স্লোভাক্‌রা, যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই চাষাভূষো, "স্লোভাক্‌" নাম বর্জন করতে স্বীকৃত না হওয়ায় সৃষ্ট হ'লো চেকো-স্লোভাকিয়া। রুশিন্‌-উক্রাইনীদের বাদ দিলেও ১,০০,০০০০০ মানুষকে একজাতিভুক্ত বলে' ধরলে ভুল করা হবে না। সাতলাখ হাঙ্গারীয়রা যে শুধু সংখ্যায় নগণ্য তা নয়, তাদের বেশীর ভাগই এমনভাবে স্লোভাক্‌দের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, যে তথাকথিত হাঙ্গারীয় অধ্যুষিত অংশকে হাঙ্গারীর সঙ্গে যুক্ত করবার কোনো উপায়ই ছিল না। অবশিষ্ট ৩২,৫০০০০ জর্মান। এদের ভৌগোলিক অবস্থান জার্মানী ও চেকো-স্লোভাকিয়ার মধ্যবর্তী। সুদেতী জার্মানদের কুলজি হাঁটকালে অনেক ভেতরের কথা বেরিয়ে পড়ে। স্পষ্ট অক্ষরে দেখা যায়, যে এই তথাকথিত "উত্তর কৌরব" জার্মানরা কয়েক শতাব্দী আগে স্লাভ ছিল। জার্মানদের অধীনে থেকে এই সীমান্তবর্ত্তী স্লাভরা হ'য়ে উঠেছিল যাকে ফরাসীভাষায় বলে, "প্ল্যু কাতলিক্‌ ক্য ল্য পাপ্‌," পোপের চেয়ে গোঁড়া কাতলিক।

ভের্সাঈ-চুক্তির দোষগুণ আলোচনা না করে' উক্ত চুক্তি-প্রসূত চেকো-স্লোভাক রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, এই রাষ্ট্র গঠিত হবার পর তার সংখ্যা-গরিষ্ঠ বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সকল সম্প্রদায়ই লাভবান হয়েছিল। এবং শুধু লাভবান নয়, তারা সকলেই নিজেকে চেকো-স্লাভ অভিহিত করে' দস্তুরমত গৌরব অনুভব করতো। যে সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ '৩৬ সালে, তখন সুদেতীদের মধ্যে শ্রীমান্‌ হেন্‌লাইনের "সাদা মোজার" রেওয়াজ হয় নি।

রাজধানী প্রাহায় দেখি চেক্‌, স্লোভাক্‌, রুশিন্‌-উক্রাইনী, হাঙ্গারীয় ও ও জার্মানদের এক অপূর্ব সামাজিক সমবায়। চেকোস্লোভাকিয়ায় যে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতির প্রচলন ছিল, তাতে কোনো জাতি বা উপজাতির সত্তাকে খর্ব করা অসম্ভব ছিল। প্রাদেশিক, একত্র অবস্থিত উপজাতি-

সমূহের আপন আপন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের আত্মরক্ষা, বৃদ্ধি ও বিস্তারের সব রকম সুযোগ ও সুবিধা ত ছিলই, উপরন্তু রাজনীতিতেও অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ স্বাধীনতা সর্বতোভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। তার প্রথম পরিচয় পেলাম যখন দেখলাম প্রাহায় দু'টি উন্নত সংস্কৃতি পাশাপাশি গড়ে' উঠ্‌ছে। চেক্ আর জর্মান। চেক্‌দের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানদের বিশ্ববিদ্যালয়, চেক্‌দের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এবং জার্মানদের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, চেক্‌দের এন্‌জিনিয়ারিং কালেজ এবং জার্মানদের এন্‌জিনিয়ারিং কালেজ, চেক্‌দের মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক, জার্মানদেরও তাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া নানা উপজাতিসমূহের শিক্ষার জন্যে ইস্কুল-পাঠশালা ত আছেই, এমন কি দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতির অভাব নেই।

ম্‌ল্‌দাভা নদীর দুই উপকূলে অবস্থিত বোহেমিয়ার প্রাচীন নগরী প্রাহার রূপ বর্ণনা এ পুঁথির বিষয়ভুক্ত নয়। কিন্তু ম্‌ল্‌দাভার ওপর কারেল সেতুর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিপরীত দিকে তাকালে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তার তুলনা অন্ততঃ আমার মত ভবঘুরে মানুষের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। মধ্যযুগ ও অতি-আধুনিক যুগের স্থাপত্য নিয়ে প্রাহার গঠন, কিন্তু এই দুই স্থাপত্যের একত্র সমাবেশ যে এমন সুরমিলিয়ে হতে পারে তার নিদর্শন শুধু প্রাহাতেই দেখা যায়। তার মধ্যে খাপছাড়া, বেসুরো যা কিছু তা আউস্ত্রিয়ার কারসাজি, "বারক্"-ই মেজাজের খাম-খেয়ালী উচ্ছ্বাস, অলঙ্কারের বাহুল্যে ভারাক্রান্ত আউস্ত্রিয়ার নবাবী আমলের ইমারৎ-দৌলৎখানা। এক দিকে দেখি বোহেমিয়ার প্রাচীন দুর্গ হ্রাদ্‌চিন্, সরল সৌন্দর্য্যে আত্ম-সমাহিত, অপর দিকে দেখি মাসারিকের নামে প্রতিষ্ঠিত অতি-আধুনিক হাসপাতাল আধুনিক চেকোস্লোভাক্ জাতির আত্ম-

বিশ্বাসের প্রতীক, এবং সহরের মাঝে প্রকাণ্ড আউস্ত্রীয় প্রাসাদ "বারক্"-এর ঔদ্ধত্যে আত্ম-জাহির করছে।

প্রাহার নাগরিক সমবায়-ভবন তার বনিয়াদী খান্দানের সাক্ষ্য দেয়। তারই পাশে একটি মধ্যযুগের গির্জা, তাকে বাস্তব বলে মনে হয় না। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সন্তবৃন্দ একে একে আবির্ভূত হন, আবার ঘণ্টা থামলে অদৃশ্য হয়ে যান। একটু দূরেই প্রাহার প্রাচীন পল্লী, ছবি বলে' ভুল হয়। মকরচূড় মুকুটের মত তার তোরণগুলির তলা দিয়ে যাবার সময় তাদের স্পর্শ করে' উপলব্ধি করতে হয়, তারা অলীক নয়। সরু সরু গলি, দু'পাশে ছোট ছোট বাড়ী, বইয়ের দোকান, পুরাণো জিনিষের দোকান, বীয়ার-খানা, রেস্তোরাঁ, সব মিলিয়ে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, যাকে সাধারণ ভাষায় বলে' থাকি "বোহেমীয়।" ইউরোপের শিল্পী সমাজের "বোহেমিয়ার" উৎপত্তি এই সব পল্লী থেকেই কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়। এই সব পল্লীরই "বেদে" মনোভাবাপন্ন সুর-শিল্পীরা এক সময় ইউরোপের সমস্ত রাজ-দরবারে আহূত হ'তো। নদীর ওপারে একটি ছোট পাহাড়ের ওপর দ্বাদশ শতাব্দীর গৌরবের বস্তু, সন্ত ভীতের গির্জা, প্রাঙ্গণে অশ্বারোহী সন্ত জর্জ্ ড্রাগণের প্রাণসংহার করছেন। গির্জার পিছনে একটি সরু গলি, এক সারি ছোট ছোট বাড়ী। এখানে থাকতো মধ্যযুগের যাদুকর আর রাসায়নিকরা, যারা নানা রসায়ন সংযোগে সোণার আবিষ্কার করবার জন্যে জীবন পাত করেছে। পাহাড়ের আর একটু ওপরে পুরাণো একটি মঠ। তার গ্রন্থাগার অতুলনীয়। হাতেলেখা পুঁথির সৌন্দর্য্য আর সম্ভ্রম যাঁদের আনন্দে বিহ্বল করে, তাঁদের পক্ষে এ মঠ একমাত্র তীর্থস্থান। তাছাড়া ছাপা বইয়েরও অভাব নেই, মুদ্রা-যন্ত্রের শৈশব ও কৈশোরের পরিচয় পাই এই গ্রন্থাগারের প্রতি স্তরে। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্বাচীন, সুগম সাহিত্যের স্থান নেই এখানে। তার

পর পাহাড় থেকে পথ নেমে আসে হু হু করে বন্যার স্রোতের মত। আবার চলি মকরচূড় তোরণের তলা দিয়ে, প্রাচীন পল্লীর রহস্যসম্ভারের ভেতর দিয়ে। এবার উঠি আর এক পাহাড়ের ওপর। স্তরে স্তরে ছবির মত বাংলো-বাটিকা ছাত্রদের নিজের হাতে তৈরী ছোট ছোট ছাত্রাবাস, একপাশে সমগ্র প্রাহার কুটিল চিত্রপট আর একপাশে সবুজের বান ছুটেছে বাগান, মাঠ, প্রমদোদ্যান ছাপিয়ে। আবার সহরে নেমে আসি।

প্রাহার মত পরিচ্ছন্ন সহর ইউরোপে খুব বেশী দেখা যায় না। এর মূলে আছে প্রাহাবাসীদের নগর-গৌরব! বিদেশীদের সঙ্গে প্রাহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়, লক্ষ্য করি, এরা কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করে না। এই গৌরব-বোধের দায়িত্ব এদের প্রত্যেকেই সমানভাবে বহন করে। সহরের মাঝখানে বিঁড়ির বোঁটা আর ট্রামের টিকিটের আবর্জনার স্তূপ এখানে জমা ত হয়ই না, উপরন্তু রাস্তায় গড়িয়ে বেড়ানো অপ্রয়োজনীয় সিগারেটের বাক্স বা কাগজের টুকরো পড়ে' আছে দেখলে এরা স্থির থাকতে পারে না যতক্ষণ না তার গতি করতে পারে, অন্ততঃ ছড়ি বা পা দিয়ে নর্দামার ওপর সরিয়ে দেয়। সহরের মাঝখানে যে নাগরিক জীবনের স্রোত বইছে তা সভ্যতার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে। পণ্য-সামগ্রীর ঐশ্বর্য্যে স্তম্ভিত হ'তে হয়। যাবতীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য ও বিলাসের জিনিস ভারে ভারে, দোকানপাট ছাপিয়ে উঠেছে। সবই এদেশের তৈরী, মূল্যের প্রতিযোগিতায় এরা জাপানীদেরও হার মানিয়েছে। তার ওপর খাদ্যের প্রাচুর্য্য! কাফির সঙ্গে থাবা থাবা মালাই না হ'লে এদের মুখে পেয়ালা ওঠে না। রেস্তোরাঁয় একজনের খোরাক চাইলে আসে তিন জনের খোরাক, মাংস ছাড়া সব্জী পাওয়া যায় যার যত খুশী। ইঙ্গস্থানে তিন পেনিতে তিনটি আলু সিদ্ধ আর তিন পেনিতে, তিন তিরিক্খে ন'টি বীন খাওয়া যাঁদের অভ্যাস, তাঁদের কাছে এ একেবারে অবিশ্বাস্য। তার

পর সসেজ ও মিষ্টান্নের প্রকার ভেদের ইয়ত্তাই নেই। প্রাহার সুষ্ঠু, সুপরিসর ও আহার্য্য-বহুল রোস্তোরাঁগুলির দোসরা মেলে না। দেখে আশ্চর্য্য হই, এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে উদ্যোগ-শিল্প ও কৃষি-কার্য্যের সমান স্থান।

চেকো-স্লাভদের চরিত্রগঠনের পরিচয় পাই তাদের ব্যায়াম চর্চার কেন্দ্র "সকল্", সঙ্ঘে। "সকল্"-অর্থে বাজ-পাখী। প্রাচীন কালে "সকল্"-পাখীকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করে' স্লাভরা কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'তো। এই জমায়েতে অনুষ্ঠিত হ'তো যত রকমের ব্যায়াম ও খেলাধূলা। সমগ্র স্লাভ-গোষ্ঠীর মেলবার সুযোগ ছিল এই "সকল্"-উৎসব উপলক্ষে। প্রতীচ্য ও দক্ষিণী স্লাভরা যখন জার্মানী ও আউস্ট্রিয়ার অধীনে এলো, তখন তারা "সকল্"-উৎসবের কথা প্রায় ভুলে গেছে। তার পর বিগত শতাব্দীর শেষভাগে যখন বিজীত স্লাভ উপজাতিসমূহের মধ্যে জাতীয়তা-বোধের চাঞ্চল্য জেগে উঠলো, তখন তারা ব্যায়াম চর্চার প্রচ্ছাদনের তলায় আপন আপন জাতীয় সংহতি গড়ে' তুল্‌লে। স্ফূর্ত্তিবাজ স্লাভদের ব্যায়ামের উর্দি আর মাথায় টুপির ওপর বাজ-পাখীর পালক দেখে' তখন কারো মনে এ সন্দেহ জাগে নি, যে তারা একদিন "সকল্"-এর দিগন্ত-বিস্তীর্ণ পাখার তলায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে' উঠবে। মহাযুদ্ধের পর যখন তারা স্বাধীনতা পেলে, তখনও স্লাভদের জাতীয় জীবনে "সকল্"-সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তার কথা তারা বিস্মৃত হ'লো না। চললো জাতীয় চরিত্রগঠনের কাজ।

প্রাহায় যেখানে এসে উঠ্‌লাম সেটা "সকল্"-সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র। সঙ্ঘভবনের একটা দিকে হোটেল, গাঁ থেকে যে সব "সকল্"-বাচ্চারা সহরে আসে তাদের জন্যে। হোটেলের জান্‌লা খুললেই সমগ্র সঙ্ঘ ও তার কার্য্যাবলীকে পাই আপন দৃষ্টি বেষ্টনীর মধ্যে। তখন গরম কাল, ভোর পাঁচটায় শুনি যুবক যুবতীর সমস্বর সঙ্গীত। ব্যায়ামের পোষাক

পরে' শত শত ছেলেমেয়ে মাঠে জড়ো হয়েছে। সে এক দেখবার জিনিষ। পুরুষের পেশীবহুল অর্দ্ধনগ্ন দেহ, যেন য়ুনানী দেবতার প্রতিমূর্তি। তাদের পাশে যুবতীর সুষ্ঠু ও সচেতন তনু। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের কী অপূর্ব সমাবেশ! সুধু বেঁচে থাকবার আনন্দে এরা একেবারে আত্মহারা। শত শত নরনারী একসঙ্গে একই সঙ্কেতে অঙ্গসঞ্চালন করছে, মন তাদের একই আদর্শে লক্ষ্যবদ্ধ। জাতীয় সত্তার এমন সমাহিত রূপ এর আগে কখনো দেখি নি।

প্রাহায় থাকবার সময়ে নানা লোকের সংস্পর্শে আসি নানা উপজাতি-ভুক্ত মানুষের সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়ে ওঠে, বিশেষতঃ স্লাভদের সঙ্গে মন গড়া এক স্লাভ ভাষার সাহায্যে। স্লোভাক্, শ্লজাক্, রুশিন্-উক্রাইনী, সবার কাছে একই কথা শুনি—চেকো-স্লোভাক রাষ্ট্রে কারো কোনো দুঃখ নেই, সবাই খেতে পরতে পায়, সবারই সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, স্বাধীনভাবে গড়ে' উঠছে। কদাচিৎ কখনো চেক্‌দের প্রতি সামান্য ঈর্ষার ভাব লক্ষ্য করি, কারণ চেক্‌রা উদ্যোগশীল, তাদের দেশে গণ্ডায় গণ্ডায় কলকারখানা, তারা বড় মানুষ। এরকম প্রাদেশিক ঈর্ষা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ইঙ্গস্থান ও স্কটস্থানের মধ্যে যে রেষারেষি দেখেছি তার তুলনায় এ কিছুই নয়। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করি সুদেতী জার্মানদের, তাদের অবস্থা কেমন। তারা একবাক্যে বলে, এত ধন-দৌলত, সুযোগ-সুবিধা তাদের বাপ্-দাদারা জার্মানীতে পায় নি। তার পর স্বর নামিয়ে বলে, ভগবান করুন যেন জার্মানরা এদেশে না আসে। তারা এসে সমস্ত লুটে পুটে নেবে।

চেকো-স্লোভাকিয়ার সরকার তখন কমুনিজমের নীতি-বদ্ধ। রুশীয় বল্‌শেভিক্‌বাদের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় ঘটে' ওঠে নি। কিন্তু চালূ কমুনিজমের যে রূপ চোখে পড়লো চেকো-স্লোভাকিয়ায়, তাতে তার

প্রশংসা না করে' থাকা যায় না। আগেই বলা হয়েছে, যে উদ্যোগ ও কৃষি এখানে সমান পর্য্যায়-ভুক্ত। সুতরাং চাষায় মজুরে এখানে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বা একচোখোমি নেই। এবং যারা হাতের কাজ করে তারা মগজ ব্যবসায়িদের কাছে কোনো অংশে হেয় নয়। দেখলাম যারা লেখা পড়া করছে, দিস্তে দিস্তে কাগজের ওপর বোতল বোতল কালীর বান ডাকাচ্ছে, তাদের সঙ্গে চাষাভুষো মুটেমজুর, চাকর-বাকর বা রেস্তোরাঁয় পরিবেশনকারীদের সম্পর্ক একেবারে "জা পান্ ব্রাত্" বা "দাদামি"র কোঠা-ভুক্ত। অথচ প্রত্যেকেই কাজের সময় কখনো আত্মবিস্মৃত হয় না। পথে আমায় "কী দাদা ?" বলে' যে সম্বোধন করে, তার হোটেলে খেতে গেলে সে বাঁ হাতে ফর্সা ঝাড়ন নিয়ে আভূমি অভিবাদন জানায়। শ্রেণী-ঔদ্ধত্য এখানে শ্রেণী-বিরোধের স্থান দখল করে নি।

প্রাহা থেকে বিদায় নেবার সময় বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক পান্ ভিতল্দ্ লেস্নী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুরতার সঙ্গে সমস্ত মুখখানি হাসিতে ভরে' জিজ্ঞেস করেন, "কেমন লাগলো আমাদের দেশ ?" উত্তর দিতে গিয়ে বাধা পাই। খবরের-কাগজওয়ালারা সহর ফাটিয়ে চীৎকার করছে, ইস্পানিয়ার গৃহবিরোধ সুরু হয়েছে, এবং ভিয়েনার এক হোটেলে নাৎসীরা দাঙ্গা বাধিয়েছে। চেকো-স্লাভ রাষ্ট্রের পক্ষে এই দু'টি সংবাদই বিশেষ উদ্বেজক। জার্মানীকে যে ইংরেজ ও ফরাসীদের বাক্যাড়ম্বর বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, সে কথা চেকো স্লাভরা সেই দিন থেকে উপলব্ধি করতে সুরু করলে। সমস্ত প্রাহার আবহাওয়া এক নিমেষেই আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। ভারতীয় জল্সায় সভ্যের ভেল ধরে' আগত গ্যেব্বেল্স্ ডাক্তারের দু'টি ভারতীয় অনুচরকে প্রাহার আনাচে কানাচে ছবি তোলার অজুহাতে ফাটকে পোরা হয়েছে, খবর পেলাম। লজ্জিতভাবে অধ্যাপক লেস্নী ও চেকো-স্লোভাকিয়াকে আন্তরিক শুভইচ্ছা জানিয়ে সেই রাত্রেই ভারশোএর ট্রেনে উঠলাম।

তারপর দু'বছর কেটে গেছে। আউস্ত্রিয়া অধিকৃত হবার পর সুদেতী জার্মানদের ভেতর "সাদা মোজার" রেওয়াজ হয়েছে। এবং যারা এতদিন উঠতে বসতে অহরহ হিট্‌লারকে বাপান্ত করতো, তারাই হেন্‌লাইন্ নামক হিট্‌লারের একটি শিষ্যের পাল্লায় পড়ে' দলে দলে "হাইল্ হিট্‌লার" মন্ত্রে দীক্ষিত হ'চ্ছে, আর পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডামি করে' বেড়াচ্ছে। সুদেতীরা কি চায় তা তখনো স্পষ্ট জানা যায় নি। শুধু এইটুকু শুনি, তারা চেকো-স্লোভাক্ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত জার্মানদের উদ্ধার করতে চায়। কথাটা শুনে হাস্‌বার মত। দু'বছর আগে যাদের কেঁদো বাঘের মত বপু নিয়ে প্রাহার পথেঘাটে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে দেখেছি, তারা যে কোনো রকমে নির্য্যাতিত বা নিপীড়িত হ'চ্ছে, তাদের গরু-জরু কেড়ে নেওয়া হ'চ্ছে, তাদের শূলে দেওয়া হ'চ্ছে, তাদের নাক-কান কেটে দেওয়া হ'চ্ছে, বা তাদের বন্ধ থলেয় পূরে ভোজপুরী কায়দায় লাঠি-পেটা করা হ'চ্ছে, এমন দৃশ্য কল্পনা করা দস্তুরমত আয়াস-সাধ্য। জার্মানীর দিক থেকে নালিশের বিন্দু-বিসর্গও না আস্‌তে পারে, সেই জন্যে সুদেতীদের মন জুগিয়ে চলা, তাদের সর্বত্র সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া এবং তাদের বীয়ার-ভুঁড়ির গর্ভে যথেচ্ছ পরিমাণ মদ্য-মাংস প্রয়োগ করা, এই ছিল

চেকোস্লোভাক্ রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহের একটি। কিন্তু তত্রাচ শোনা গেল, চেক্‌রা দিনরাত্রি সুদেতীদের পাকা ধানে মই দিচ্ছে ও বুকে বাঁশ দল্‌ছে, এবং যতদিন তারা চেক্‌দের তাঁবেয় থাক্‌বে ততদিন এর প্রতিকার হবার আশা নেই, সুতরাং— । সুতরাং, আর কিছুই নয় চাই সুদেতীদের স্বায়ত্তশাসন।

স্বায়ত্তশাসনের ধুয়ো ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তা শুধু সুদেতীদের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। স্লোভাক্‌দের মধ্যে বহুদিন ধরে' হিট্‌লারের গুপ্ত প্রোপাগান্দা চলছিল। সুদেতীদের দেখাদেখি তারাও ব'লতে সুরু করলে, চেক্‌রা স্বাধীন হওয়া অবধি বরাবর নিজের কোলে ঝোল টেনে এসেছে, এবং চাকরী-বাকরী, ব্যাবসা-বাণিজ্যে স্লোভাক্‌রা বরাবর চেক্‌দের পক্ষপাতিত্ব সহ্য করে' এসেছে। সুতরাং তাদেরও স্বায়ত্তশাসন চাই।

এ্যাঙ্ গেল, ব্যাঙ্ গেল, সুতরাং খল্‌সে বললে, আমিও যাই। মুষ্টিমেয় রুশিন্-উক্রাইনীরা, যারা নিজেদের জার্মানীর পোষ্যপুত্র বলে' মনে করতো, এবং যাদের জন্যে হিট্‌লারের কোষাগার ছিল অবারিতদ্বার, তারাও বলে' বসলো, স্বায়ত্তশাসন চাই।

মাসের পর মাস ধরে' সারা দেশ জুড়ে চললো অশান্তির পর অশান্তি। হিট্‌লার ও গ্যেব্বেল্‌স্ ডাক্তারের প্ররোচনায় শ্রীমান্ হেন্‌লাইনের দল যেখানে সেখানে মারপিট সুরু করলে। শুধু মার দিলে নয়, মার খেলেও বটে। একপক্ষ মারতে আরম্ভ করলে, অপর পক্ষ চুপ করে' প্রেম বিতরণ করবে, এরকম পরামর্শ গান্ধীজী মার্ফৎ তখনো চেক্‌দের কাছে পৌছায় নি। কাজেই সুরু হ'লো মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। দু'একটা জার্মানী মাথা ধড়বিচ্যুত হবার সঙ্গেসঙ্গেই হিট্‌লার মহোদয় সুর চড়ালেন, পর্দার ওপর পর্দায়। এখন আর স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে শানালো না, চাই চেকো-স্লোভাক্ রাষ্ট্র থেকে সুদেতী মুলুকের সম্পূর্ণ অঙ্গচ্ছেদ।

হেন্‌লাইনের মত স্লোভাকদেরও এক দলপতি জুটে গেল। পাদ্রী-প্রবর হ্‌লীন্‌কা। পঁচাত্তর বছর বয়সের এই পাদ্রীটিকে দেখে মনে হ'তো, সম্প্রতি মিশরের এক কবর-গর্ভ থেকে তাঁকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। হিট্‌লারের দল এই মমীটিকে ঠেক্‌নো দিয়ে স্লোভাকী চাষাদের বিস্ফারিত চোখের সাম্‌নে তাদের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে খাড়া করে' দিলে। এবং এই মমী হরবোলার পুতুলের মত পেছনের মানুষটির মুখের সবকটি বুলি হুড় হুড় করে' আওড়াতে লাগলো। তার লম্বা-চওড়া কথার ঝাঁঝে স্বল্পবুদ্ধি, অদূরদর্শী স্লোভাকী চাষারা ক্ষেপে উঠলো, তাদেরও স্বাধীনতা চাই। রুশিন্‌-উক্রাইনীরাও ঠিক এই পথেই চললো।

চেকো-স্লোভাক্‌ রাষ্ট্রে যে রকম অরাজকতা সুরু হ'লো তাতে চেক্‌দের মেজাজ হিমের মত ঠাণ্ডা না হ'লে এবং তাদের সহিষ্ণুতা হিমাদ্রিকেও ছাড়িয়ে না উঠলে, একটা রসাতল কাণ্ড বেধে যেতো। এখানেই চেক্‌রা মস্ত ভুল করেছিল। তখন যদি তারা বেপরোয়াভাবে ডাণ্ডা চালাতো, তাহ'লে ব্যাপারটা অত তাড়াতাড়ি গুরুতর হয়ে উঠতো না। জার্মানরা যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সুরু করেছে, তখন মাত্র কয়েক খানা "ঋড়া"-মার্কা উড়োজাহাজ (যার বর্ণনা পোল যুদ্ধ সম্বন্ধে পরে পাওয়া যাবে) পথভুলে (?) জার্মান সীমান্ত পার হওয়াতে আলেমানী বীরপুরুষদের থরহরিকম্প উপস্থিত হয়েছিল, একথা হয়তো ভারতবর্ষের সংবাদপত্র-সমূহেও প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মানরা এতদিন সুধু চোখ রাঙিয়ে কাজ হাঁসিল করে' আসছিল। তাদের ইয়া ইয়া বপু দেখে সাধারণতঃ সব মানুষের অন্তরে ভীতির উদ্রেক হয়, তা সত্যি, কিন্তু তাদের মত "ব্যুলি" স্বভাবের মানুষদের ঠাণ্ডা করতে চাই ডাণ্ডা, একথাটা আর যাদের জানা না থাক্‌, কাঠ-খোট্টা চেক্‌রা তা ভালো ক'রেই জানতো। এবং তাদের একলা ছেড়ে দিলে যে তারা আর কিছু না পারুক, অন্ততঃ উপস্থিত

মহত্তর যুদ্ধটাকে দু'পাঁচ বছর পিছিয়ে দিত, এ আমার, নিতান্ত ব্যক্তিগত হ'লেও, নানা পর্য্যবেক্ষণ-সিদ্ধ বদ্ধমূল ধারণা। জার্মানদের কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করবার মত চেক্‌দের ছিল তিন হাজার আধুনিক টেক্‌নিকের পরাকাষ্ঠা-পরিকল্পিত, উৎকৃষ্ট বিমানপোত—আর গোলা-গুলি, বোমা-বুমী, বারুদ-মশলা ও বন্দুক-হাতিয়ারের গুদাম যা তাদের ছিল, তা দিয়ে তারা বহু বৎসর ধরে' চীন থেকে আরম্ভ করে' স্পেন পর্য্যন্ত, প্রায় আধা দুনিয়ার সামরিক খোরাক জুগিয়ে এসেছে, ঠিক যেমন বাচ্যা (Bata) কোম্পানীর জুতোর চলন পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু বিধি এখানে বাদ সাধলেন। "হে ভগবান, বন্ধুদের কবল থেকে আমায় রক্ষা করো"—এই স্বাস্থ্যকর নীতিবাক্য রাষ্ট্র-চালে অনভিজ্ঞ চেক্‌রা তখনো বুঝতে শেখে নি।

'৩৮ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই হিট্‌লার মহোদয় যথারীতি গলাবাজী সুরু করলেন। এর কারণ আর কিছু নয়। জনৈক ইংরেজ ফফরদালালের কথায় ভুলে চেক্‌রা সুদেতীদের স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত হয়েছিল। হিট্‌লার সাহেবের একবার মুখ খুলে গেলে তাঁকে ঠেকানো দায়। এটা বোধকরি তাঁর সেনাবিভাগে জমাদারী করবার সময়কার অভ্যাস। তেরি মেরি করে' যে সব গালি-গালাজ চেক্‌দের উপর বর্ষালেন, তাকে অন্ততঃ রাষ্ট্রনৈতিক তকল্লুফ্ বলে' ভুল করা যায় না। এবং চেক্ রাষ্ট্রপতি মহামান্যবর শ্রীযুক্ত বেনেশের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা উচ্চারিত হ'লো, সেরকম শব্দ এক রাষ্ট্রপতির দ্বারা অন্য-রাষ্ট্রপতির প্রতি কখনো প্রযুক্ত হয়েছে বলে' বিশ্বাস হয় না। বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে, আধা-সভ্য গোলামের জাত চেক্‌দের স্বাধীন থাকবার কোনো অধিকার নেই। উপরন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কৃত্রিম অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ফরাসী ও রুশদের দ্বারা জার্মানীর ওপর অবাধ আক্রমণ। সুতরাং হিট্‌লার কমুনিজ্‌মের বাসা, চেকো-স্লোভাকিয়ার উচ্ছেদ করে' তবে জলস্পর্শ করবেন

ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসঙ্গে জোর গলায় আরো ব'ললেন যে, তাঁর পবিত্র "উত্তরকুরু"তে ম্লেচ্ছ চেক্‌দের স্থান দিতে তিনি রাজী নন্। এবং সুদেতী মুলুক জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হ'লেই তাঁর জীবনের ব্রত-উদ্‌যাপন হয়। এরপর জমীজমা নিয়ে তিনি আর কখনো লাঠালাঠি করবেন না। অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে নাকি পোলদের সম্বন্ধে গোটাকয়েক শিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। সে কথা পরে তুলবো।

যাই হোক ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠলো। চেক্‌দের এক প্রবল পরাক্রান্ত বহিঃশত্রু, তার ওপর দুই জ্ঞাতিশত্রু, স্লোভাক্ ও রুশিন্ উক্রাইনীরা এবং মুষ্টিমেয় হাঙ্গারীয়রা, সবাই একসঙ্গে আপন আপন স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসনের দাবী করে' বসলো। সবচেয়ে আফ্‌শোষের বিষয়, তাদেরই জাতভাই স্লোভাক্‌রা জার্মানদের দেখাদেখি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়ে বসলো। সত্তর লক্ষ চেক্‌দের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো, এবং তারা অভ্যন্তরে শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং বহিঃশত্রুর সঙ্গে লড়বার জন্যে তৈরী হ'লো।

হাতের নাগালেই ছিল হাতিয়ার। এবং চেক্‌দের অ-লড়াকু জাত বলে' শত বদ্‌নাম থাক্‌লেও দেখা গেল হাতিয়ায় পাকড়াবার লোকের অভাব হ'লো না। হাজারে হাজারে চেক্ সৈন্য সীমান্তে গিয়ে হাজির হ'লো, সারি সারি ট্রেঞ্চ্ কাটা হ'লো, গণ্ডায় গণ্ডায় ট্যাঙ্ক্-প্রতিরোধক প্রাচীর গাঁথা হ'লো, এবং চেক্ উড়োজাহাজ সীমান্তের উপর যুদ্ধের মহড়া দিতে লাগল। এমনি সময়ে চেক্‌দের মনে পড়ে' গেল দু'খানা দলিলের কথা। ফরাসী ও রুশদের সঙ্গে পারস্পর সহায়তার চুক্তিপত্র। চেক্‌রা উক্ত দুই রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের পুরাণো সর্তের কথাটা মনে করিয়ে দিলে, এবং উক্ত দুই রাষ্ট্রপ্রতিনিধিও "হ্যাঁ" বা "না" কোনো উত্তরই না দিয়ে আপন আপন মুলুকে খবর পাঠালেন। যতটা বোঝা গেল তাতে সবারই ধারণা হ'লো, ফরাসী ও রুশরা জার্মানদের সঙ্গে মার-

পিট করতে পেছপাও নয়। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যাতে পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে লড়বার জন্যে সাহসের বিচ্যুতি না ঘটে, সেই জন্যে চেক্ সরকার দেশের সর্বত্র প্রাচীরে প্রাচীরে বড় বড় বিজ্ঞপ্তি এঁটে দিলে। তাতে ইউরোপের মানচিত্রে পারী থেকে একটি রেখা প্রাহা ভেদ করে' মস্কৌকে যুক্ত করেছে দেখানো হ'লো, এবং তারই তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা হ'লো, "ভয় ক'রো না, আমরা একলা নই!"

এমন সময়ে কী ঘটলো তা বলা শক্ত। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকরা তার রহস্য ভেদ করবেন। আমরা, মর মানুষরা, যা লক্ষ্য করলাম তা এই: হঠাৎ হিটলার এবং মুসোলিনী ঘন ঘন টেলিফোঁক্ ফুঁকতে লাগলেন। ৺ চেম্বারলেন ও মুসোলিনী দু'একটা পত্র বিনিময় করলেন। ইতালিয়া ও জার্মানীতে ব্রিতানীয়, ফরাসী ও রুশ রাষ্ট্রদূতরা গুজুগুজু ফুসুফুসু সুরু করলেন। এবং কী একখানা বিদেশী পত্রিকায় ছবি দেখলাম, অলিভের ডাল উঁচিয়ে চেম্বারলেন সাহেব ছাতা উড়িয়ে জার্মানী অভিমুখে ধাওয়া করছেন! এখানে স্মরণ রাখা উচিৎ, চেক্দের সঙ্গে ইঙ্গস্থানের কোনোরূপ পারস্পর সহায়তার চুক্তি-সর্ত্ত কিছুই ছিল না। সুতরাং চেক্-জার্মান মনোমালিন্যে ইঙ্গস্থানের মধ্যবর্ত্তিতা তার স্বভাবগত বিচারশীলতা ও শান্তি-প্রিয়তার পরিচয় জ্ঞান করে' চেক্রা বিশেষ চমৎকৃত হ'লো, এবং জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা ক্রমে শিকড় গাড়তে লাগ্লো যে, মস্কৌ, প্রাহা ও পারীর সংযোজক-রেখা বুঝি লন্দনে গিয়ে পৌছয়। চেম্বারলেন, মুসোলিনী ও হিট্লারের সাক্ষাৎকার স্থির হ'লো মিউনিকে।

ইতিমধ্যে স্লাভ গোষ্ঠীর মধ্যে হিট্লারের ভেদনীতি কেমন করে' জয়লাভ করলে, এবং কেমন করে তা বিপক্ষদলকে বাজিমাৎ করলে, তার পরিচয় পেলাম পোলদেশের ভারশৌ সহরে বসে'। ব্যাপারটা এখানে একটু বিশদভাবে বলতে চাই।

পাশাপাশি দু'টো রাষ্ট্র, চেকো-স্লোভাকিয়া আর পোলদেশ। এদের মধ্যে সম্পর্ক শুধু ভৌগোলিক নয়, রক্ত ও সংস্কৃতির। ভাষায় চেক্ ও পোলদের মধ্যে ততটুকুই পার্থক্য যতটুকু বাংলা আর উড়িয়ায় অথবা বাংলা আর অসমীয়ের মধ্যে। বোহেমিয়ার যখন বাড়বাড়ন্ত তখন এমন কি শিক্ষিত পোলরা চেক্‌দের অনুকরণ করে' চলতো রীতি-নীতি, সামাজিকতা ও বিশেষরূপে ভাষায়। মাত্র ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পোল কবি রেই পোলদের চেকীয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে' বললেন, "পোলরা হাঁস নয়, তাদেরও ভাষা আছে।" সেই থেকে সুরু হ'লো পোলদের নিজস্ব, স্বাধীন সাহিত্য। কিন্তু তাতে জ্ঞাতিসদ্ভাব কোনো অংশে ক্ষুণ্ণ হ'লো না।

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' পোল আর চেক্‌দের ইতিহাসে নানা দুর্য্যোগ গেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, পরাজয়, নির্য্যাতন। বিপদে, সম্পদে এই প্রতিবেশী দুই জাতি বরাবরই পরস্পরের কথা স্মরণ রেখেছে। মাত্র বিগত শতকে সুরু হ'লো পোল ও চেক্‌দের মধ্যে মৌলিক দৃষ্টি-দ্বৈধ। চেক্‌রা ছিল জার্মানী ও আউস্ত্রিয়ার অধীনে, এবং পোলদের ভাগাভাগি করে' নিয়েছিল, জার্মানী, আউস্ত্রিয়া আর রুশদেশ। সুতরাং স্লাভ-জাতি হিসেবে জার্মানী-বুটের তলায় বাস করে', বৃহত্তম স্লাভ-জাতি রুশদের সম্বন্ধে চেক্‌দের

মনে নানা প্রকার অলীক, রংচঙে ধারণার স্থান পাওয়া যেমন সহজ ছিল, ঠিক তেমনি সহজ ছিল রুশী কুতাঘাতে গা-সওয়া পোলদের মন থেকে বিজেতাদের সম্বন্ধে সমস্ত স্বপ্ন-বিলাসের অন্তর্ধান হওয়া। কাজেই নিপীড়িত, পদদলিত স্লাভদের তত্ত্বাবধায়করূপে যখন আবির্ভূত হ'লেন ঝল্‌মলে জোব্বা-আঁটা, মণিমাণিক্য-খচিত শাম্‌লা-পরা রুশী বাদশাহ, তখন তাঁকে দেখে' অন্যান্য স্লাভদের যে অনুপাতে তাক্‌ লেগে গেল, সেই অনুপাতে পোলরা উপলব্ধি করলে, ৎসারের আধিপত্য বিস্তারের এ এক নয়া চাল। যাই হোক অন্যান্য স্লাভদের মত চেক্‌রাও স্লাভ-গোষ্ঠীর ত্রাণকর্ত্তারূপে ৎসারকে মেনে নিলে। এবং ঘা-খাওয়া, ঠেকে-শেখা পোলরা রুশী স্লাভীয়তার বিরূপতা করে' চললো, কারণ তাদের যুক্তি বোঝা কষ্টসাধ্য নয়,—ৎসার যদি যথার্থই স্লাভদের ত্রাণকর্ত্তা হন্‌, তাহ'লে সেই ৎসারই পোলদের পদানত, জিঞ্জির-বদ্ধ করে' রেখেছেন কেন? পোল-চেক্‌ বিরোধের সূত্রপাত এইখানে। চেক্‌রা হ'লো ৎসারের অনুরক্ত, এবং পোলরা হ'লো সর্ববিষয়ে ৎসারত্বের প্রতি বিরক্ত, চেক্‌রা স্লাভত্বের ধ্বজা-ধারী, এবং পোলদের কাছে সে ঝাণ্ডা ষাঁড়ের নাকের ওপর রক্তবস্ত্রের মত।

চেক্‌-পোলদের এ বিরোধ ছিল নিতান্ত উপরিস্থ, কারণ এতে কারো স্বার্থের বিশেষ হানি হয় নি; এ ছিল সুধু মতামত নিয়ে মন কষাকষি। কারণ পোলরা যখন রুশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তখনই চেক্‌রা পোলদের স্বাধীনতা-প্রয়াসে সহানুভূতি দেখিয়েছে, এবং চেক্‌রা যখনই মাথা তুলতে চেষ্টা করেছে, পোলরাও তখন তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যের কামনা জানিয়েছে। আসল বিসম্বাদ সুরু হ'লো স্বাধীন পোলদেশ আর স্বাধীন চেকো-স্লোভাকিয়ায়, ১৯২০ সালে। বিবাদটা জমীজমা সংক্রান্ত, একান্ত ঘরোয়া, যা জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে, সরিকে সরিকে নিত্য হয়ে থাকে।

১৯১৮ সালে রাষ্ট্রদূতদের জল্‌সায় জার্মানী-অধিকৃত এবং স্লাভ-অধ্যুষিত

শ্লঁস্ক্ বা সাইলেশিয়ার এক অংশ নবজাত পোলদেশ-ভুক্ত করা হয়। খানিকটা জমী পড়েছিল একেবারে চেক্ সীমান্তের গায়ে গায়ে। জমীটা আসলে কাদের তা সম্যক্ নির্দ্ধারিত করা সহজ নয়। কারণ এখানকার বাসিন্দাদের, তারা কী জাতের জিজ্ঞেস করলে, তারা নিজেদের চেকো-স্লোভাক্ও বলে না, পোলও বলে না, বলে "শ্লঁজাক্।" এবং বাদবাকী অধিবাসীরা কতক পোল, কতক চেক্ এবং কতক স্লোভাক্। জমীটার যথার্থ আকর্ষণ তার অধিবাসীরা বা মাটি, পাথর কিম্বা গাছ-পালাও নয়, তা বলা বাহুল্য। তার প্রধান আকর্ষণ ছিল এখানকার নানা রকমের কল-কারখানা আর খনিজ ঐশ্বর্য্য। পোল এবং চেক্, দু'পক্ষেরই জমীটার ওপর লোভ কম ছিল না। তার পর ১৯২০ সালে যখন পোলরা বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে মরণ-বাঁচনের সংগ্রামে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে তাল বুঝে চেক্‌রা পুরাণো পোল-চেক্ ভেরাণ্ডার বেড়াটি উপড়ে ফেলে', "অলসা"-নদী পর্য্যন্ত দখল করে' নিয়ে একেবারে পাকাপাকি পিল্লে তুলে দিলে। বাঁধলো পোলে আর চেকে ঘরোয়া বিবাদ, এমন কি পরস্পরের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। এ বিবাদ সুধু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নয়, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত তা চুঁইয়ে চুঁইয়ে অনুষিক্ত করলে, চেক্‌দের অবশ্য ততটা নয় যতটা পোলদের।

এ বিবাদ এত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হ'লো যে, তা হিট্‌লার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। এবং পোলদের মাঝে মাঝে তোয়াজ করা তাঁর রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালো। পোল পররাষ্ট্র-সচিব শ্রীমান য়ুজেফ্ বেক্-এর প্রসাদে পোল-জর্মান মিতালি আগে থেকেই সুরু হয়েছিল। সে কথা পরে তুলবো। এখন এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, চেক্‌দের সঙ্গে মনোমালিন্য নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পোল আর জার্মানদের মধ্যে দহরম-মহরম অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পেল। জ্ঞাতি-শত্রুর বিপদের

সংবাদে যে সত্যনারায়ণের শিন্নী দেওয়া হয়, এ ত জানা কথা। চেকো-শ্লোভাকিয়ার উপজাতি-সমূহ যখন আপন আপন স্বায়ত্বশাসনের দাবী করছে, তখন "অলসা"-নদীর অপর তীরবর্তী পোলরাও অনুরূপ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করলে।

সুতরাং চেক্‌দের সম্বন্ধে যে সব খবর পোলীয় সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হতে লাগলো তার বেশীর ভাগই জার্মান মার্কা। চিন্তা-শক্তি-সম্পন্ন যে সব পোল দু'একখানা কাগজে আপন মতামত জ্ঞাপন করলেন, তাঁদের কথা বেশীদিন শোনা গেল না, কারণ সেই সেই কাগজগুলি অচিরেই ভবলীলা সাঙ্গ করে' গোরে গেল। তার ওপর বিদেশী খবর সরবরাহ, করবার জন্যে আছে PAT—সরকারী খবর-যোগানদার। শ্রীমান্ বেক্ বিলেতে কোথায় লাঞ্চ খেলেন, কোথায় ঘোড়দৌড় দেখলেন, জেনেভাতে কার কার সঙ্গে গুজুগুজু ফুসুফুসু করলেন, এবং বিদেশে দিনে দিনে পোলদের কী রকম খাতির জমে' উঠছে, "পাং" এই সব খবর দিয়ে বেচারা পোলদের চক্ষু ছানাবড়া করে' দিত। চেক্‌দের গালিগালাজ করে' হিট্‌লার যে গলাবাজী করলেন, তার সঙ্গে পোলদের সম্বন্ধে বাছা বাছা কয়েকটা মুখরোচক চাটুবাক্য, "পাং" বক্তার মুখে, প্রতিমা-বিদায়ের সময় তার মুখে ছেঁচা পান আর নারকেল লাড়ু গুঁজে দেওয়ার মত করে' বসিয়ে দিলে। কথাগুলোর সার মর্ম এই যে—গোলামের জাত চেক্ ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং তার সঙ্গে যোগ করা হ'লো, "হ্যাঁ, অবশ্য সুসভ্য, সুসংস্কৃত পোলদের কথা আলাদা। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুতা আজকের নয়, গত চার বছরের, এবং সাড়ে তিন কোটি মানুষের যে সমুদ্রের দিকে একটা দরদালান চাই, সে কথা স্বীকার না করে কে?" * এই "সমুদ্রের

* ফরাসী ও ইংরেজী কাগজে এই বক্তৃতার যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বহু অনুসন্ধান করেও আমি একথা দেখতে পাই নি।—লেখক।

দিকের দরদালানের" কথা পরে শোনা যাবে। আপাততঃ বেক্ সাহেব পোলদের মধ্যে এই ধারণার বিস্তার করলেন যে, চেক্দের ওপর শোধ তোলার এই প্রশস্ত সময়।

হিট্লার মহোদয় শ্রীমান্ বেক্কে একথা খুব স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিলেন। এবং প্রয়োজন হ'লে পোল-জর্মান আঁতাআঁতিটাকে (entente) দস্তুর-মত মাখামাখিতে পরিণত করা যেতে পারে, এমন আশ্বাস দিলেন। সুতরাং দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে বেক্ চাললেন তাঁর আড়াই পা'র চাল। ফরাসী-পোলীয় মৈত্রী ও আপৎকালে পারস্পর সহায়তার চুক্তিকে বজায় রেখে তিনি হিট্লারের সুরে সুর মিলিয়ে হেঁকে বসলেন, তাঁরও চাই "জা-অল্‌ঝিয়ে"—"অলসা"র অপর পারের হু'টি জেলা। চাই, চাই, এক্ষুণি চাই, না হ'লে তিনি একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবেন। হাত নেড়ে, পা ঠুকে তিনি মুসোলিনীর মত বারান্দার ওপর থেকে সমবেত জনতার কান ফাটিয়ে, প্রাণ নাচিয়ে কথাটা ব্যক্ত করলেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর ব্যাপারটা এতদূর গড়ালো যে ব্রিতানীয় কনসুলাৎ থেকে খবর এলো, পোল-চেক্ সংগ্রাম আসন্ন, সুতরাং যদি দেশে অর্থাৎ ইঙ্গস্থানে ফিরতে চাই ত গ্‌দীনিয়া বন্দরে জাহাজ অপেক্ষা করছে, ভারশৌ থেকে উড়ে' গ্‌দীনিয়ায় পৌছতে, এখনও সময় আছে। সঙ্গে নেওয়া চলবে মাত্র ছোট একটি স্যুটকেস। শোনা যায়, আমাদের দেশে অনেক বৃদ্ধা মৃত্যুর আগেও কুলের হাঁড়ির নিরাপত্তা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন; আমারও হলো কতকটা সেই অবস্থা। সমস্ত ফ্ল্যাট্‌টায় জমে' উঠেছে বইয়ের পর বই, এবং লোক-শিল্পের নানা খুচরো জিনিষ। তাছাড়া বাঙ্গালীরা যেখানেই বাস করে কিছুদিন, সেইখানটাকেই করে' তোলে বাঙ্গালীটোলা। দিদি, মাসী, দাদা, খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে বিদেশ-বিভুঁইকে ঘরবাড়ী করে' তোলা, বোধ হয় আমাদের জাতিগত স্বভাব। শুধু ভারশৌএ নয়, সমগ্র পোলদেশে ভারতীয় বাসিন্দা বলতে, এই অধম ব্যতীত আর কেউ ছিলেন বলে' আমার জানা নেই। কিন্তু এই একটি বাঙ্গালীরই সম্পর্ক-পাতানো মানুষের সংখ্যা বড় কম ছিল না। অধ্যাপকদের ভেতর, ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর এবং এমন কি রাজপুরুষদের ভেতর আমার যে নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছিল, তাকে এক তুড়ী মেরে

উড়িয়ে দেওয়া যে কত শক্ত, তা উপলব্ধি করলাম, যখন ওদেশ ছাড়বার সমন এলো। ছাড়তে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই, তবে ইচ্ছে করলে ছাড়তে পরি।

কথাটা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার জন্যে, ব্রিতানীয় কন্‌সুলাতে ধাওয়া করতে হ'লো। কন্‌সুলাতে ওদেশে প্রবাসী ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ উপস্থিত হয়েছেন। অনেকেরই আমার মত অবস্থা। যে দেশে কিছুদিন থাকা যায় তার মাটি, জল, হাওয়া ও মানুষের সঙ্গে অলক্ষ্যে কেমন একটা আত্মীয়তা গড়ে' ওঠে,—এবং তাকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দেওয়া সহজ নয়! ইংরেজ ভদ্রলোকদের তার ওপর আছে লটবহর, দামী গালিজা, সখের সামাভার, এবং হাজার রকমের এটা, ওটা, সেটা। কন্‌সুলাতে খবর পাওয়া গেল, ব্রিতানীয় প্রজাদের মধ্যে যাঁদের স্ত্রী-পুত্র আছে, এবং সেই সমস্ত স্ত্রী-পুত্র-হীন দুর্ভাগা পুরুষ যাঁরা ওদেশের স্থায়ী বাসিন্দা নন্, তাঁরাই পোলদেশ ছাড়ছেন; বাদ বাকী যাদের যেতে ইচ্ছে হয়, যেতে পারে। উপরন্তু যারা ওদেশে রুটি কামায়, তারা থাকতে পারে। বলা বাহুল্য আমি ছিলাম শেষ পর্য্যায়-ভুক্ত। সুতরাং থেকে গেলাম।

কন্‌সুলাতে, লক্ষ্য করলাম, দস্তুরমত উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। পোল-চেক্ হাঙ্গামা যে শেষ পর্য্যন্ত অনেকদূর গড়াতে পারে, এ আশঙ্কা তখন অনেকের মনেই জেগেছে। এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে তখন এই কথা নিয়ে কানা-ঘুষো চলেছে যে, পোল-জর্মান সম্প্রীতি প্রণয়ে পরিণত হ'লে তা ব্রিতানীয় কূটনীতির পক্ষে ডজনখানেক ঘোল খাওয়ার সামিল হবে। ব্রিতানীয়ার সঙ্গে জার্মানীর একটা গোলযোগ বাধাও যে আশ্চর্য্য নয়, এ কথাও শুনলাম। একটি উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাষ্ট্রনৈতিক কর্মচারী এদিক ওদিক তাকিয়ে, স্বর নামিয়ে বললেন—"বুঝচেন না, ব্যাপারটা

কতদূর গড়াবে? আমাদের প্রাচ্য ইউরোপ থেকে বিদায় নিতে হবে। তা ছাড়া জার্মানরা যে বাল্‌তিক্ সাগরটাকে 'জর্মান হ্রদে' পরিণত করে' ফেলতে চায়, এ কথা অনেকেরই জানা নেই।" এইচ, জি, ওয়েল্‌সের আত্মকথায় ব্রিতানীয় কূটনৈতিক সমাজকে তিনি "বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুদের খেলাঘর" আখ্যা দিয়েছেন, মনে পড়লো। জার্মানরা বাল্‌তিক্ সাগরকে যে নিজেদের একটা হ্রদ বানিয়ে ফেলতে চায়, সে কথা তারা কোনো দিন গোপন করে নি। এরই পাঁচ সাত বছর আগে একখানা জার্মানী অর্থনৈতিক মাসিকে এ সম্বন্ধে বিশদ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, মনে আছে। উক্ত কূটনৈতিক যখন কথাটা ব্যক্ত করলেন, তখন সমবেত ইংরেজমণ্ডলীর মধ্যে বেশ একটু "তাত্ত্বিক" বিস্ময়ের সৃষ্টি হ'লো। সুতরাং বোঝা গেল, কথাটা অনেকের পক্ষেই একেবারে আন্‌কোরা নতুন!

পোল-জর্মান সম্প্রীতি তখন প্রণয়ে পরিণত না হ'লেও তার পূর্বরাগ দেখা দিয়েছে। হিট্‌লার শ্রীমান্ বেক্ মার্ফৎ পোলদের বোঝাচ্ছেন যে, তারাও জগতে কেউকেটা নয়, এবং মাকারণী-ভোজী ইতালীয়রা যদি সাম্রাজ্যের দাবী করতে পারে ত পোলরাই বা পারবে না কেন? চেক্‌দের আগে ঠাণ্ডা করা যাক্, তারপর রুশদেরও একহাত নেওয়া যাবে, তারপর দু'জনে বেরুনো যাবে দিগ্বিজয়ে। চাঁটানোতে হাত পাকাবার জন্যে ইহুদীগুলো ত আছেই। ইংরেজ-ফরাসী গণতন্ত্রের আমল শেষ হয়ে এলো এবং বল্‌শেভিজ্‌মের টুঁটি টিপে ত তারাই মারবে দু'জনে, সঙ্গে অবশ্য ইতালিয়া থাকবে। সুতরাং ইংরেজ-ফরাসীর মায়াপাশ কাটিয়ে ভল্‌শেভিক্-বাদের ফাঁড়ি চেকো-স্লোভাকিয়ার ওপর চালাও ডাণ্ডা!

আগেই বলা হয়েছে, বেক্ সাহেবের প্রসাদে চিন্তা-শক্তি-সম্পন্ন পোল-দের পোল-চেক্ বিরোধ সম্বন্ধে যে সব মতামত কোনো কোনো অখ্‌বারে স্থান পাচ্ছিল, তা বহুদিন যাবৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং

সরকারী ও সরকারের পিঠ-চাপড়ানো কাগজের দল হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে চেক্‌দের ওপর চড়াও হ'লো। সমগ্র পোল সমাজ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বংশপরম্পরায় যারা শত্রুতা করে' এসেছে, আবহমানকাল, পোল ইতিহাসের গোড়া থেকে, সেই জার্মানদের সঙ্গে জোট বেঁধে স্বজাতি চেক্‌দের ওপর খাঁড়া-ধরা, এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে? তাছাড়া কী নিয়েই বা এত মারামারি, দু'টি মাত্র ত ছোট ছোট জেলা! তা দখল করে' পোলদের কীই বা এমন বাড়বাড়ন্ত হবে? এবং যদি চেক্‌দের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে হয় ত জার্মানীর সঙ্গে জোট বেঁধে নয়, স্বতন্ত্রভাবে, সম্মানের সঙ্গে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে নয়। যে চেকো-স্লোভাকিয়া জর্মানদের এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল, সেই দেশের ধ্বংসসাধন করে' জার্মানদের একেবারে দোর গোড়ায় নিয়ে আসা যে কতবড় নির্বুদ্ধিতা, তা কি কেউ বুঝ্‌তে পারছে না? এই রকম সব কথা শুনি সর্বত্র, তবে কথাটা জোর গলায় বলবার কারো সাহসও নেই, উপায়ও নেই।

এদিকে বেক্ সাহেব স্বীয় বীরত্বে মাতোয়ারা হয়ে, হাত নেড়ে (ইহুদী বেনেদের মত তাঁর হাত নাড়া অভ্যাস), পা ঠুকে, গলা ফাটিয়ে পোল জনমতকে চেক্‌দের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হবার জন্যে উত্তেজনা দিচ্ছেন। রাদিও খুল্‌লেই শুন্‌তে পাই গোরা-বাজনা আর চেক্‌দের লক্ষ্য করে' মার মার শব্দ। নিজের রাদিও বন্ধ করে' স্থির হয়ে বসতে যাই, ত প্রতিবেশীর রাদিও "ধর শালাকে, মার শালাকে" বলে' চেঁচিয়ে ওঠে, অবশ্য আমাকে নয়, চেক্‌দের। বাজনার মাদকতায় মেতে যেমন গোঁড়া হিন্দুদেরও কেউ কেউ মহরমের লাঠিখেলায় যোগ দেয় (এখন দেয় কি না, জানি না, আগে দিত), তেমনি সামরিক বাজনার সঙ্গে শিষ্ দিতে দিতে অনেকেই এসে জড়ো হয় বেক্ সাহেবের বারান্দার নীচে। সেখানে

এসে দেখে বড় বড় বিজ্ঞপ্তি, রক্ত-নাচানো ভাষায়, পোলদেশের মানচিত্র, তাতে "অলসা" নদীর অপরতীরস্থ জেলা-দুটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, চীৎকার ওঠে আকাশ ফাটিয়ে (অনেকগুলি গলাই ভাড়া করা)—"পোল-মাঙ্গ কী জয়," "বেক্ সাহেব কী জয়"! ভিড় বাড়ায় ইস্কুলের ছেলের দল। "রেনীডে"র ছুটি পেলে, কলকাতার সহরটা একবার টহল দিয়ে আসতে অতিবড় শান্ত ছেলেরও লোভ হয়। এক্ষেত্রে সুধু তাই নয়, ছুটি দেওয়া হ'লো হল্লা করবার জন্যে বিশেষ করে'। সুতরাং বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ের দল, বয়স সাত থেকে সতেরো পর্য্যন্ত, পথে ঘাটে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে, দেশের জয়-ঘোষণা করে', চেক্‌দের জাহান্নামে পাঠাবার দাবী করে', হাজির হ'লো বেক্ সাহেবের বারান্দার নীচে। এবং সেখানে অনেক চীল্লাচীল্লি করে' চললো সেনানায়কের বাড়ীতে। সেনানায়ক তাঁর স্বভাবগত ব্রীড়ার সঙ্গে জনতার সম্বর্দ্ধনা-ধ্বনি গ্রহণ করে', সংক্ষেপে ধন্যবাদ জানিয়ে, অন্তর্ধান হ'লেন। এতে কেউ কেউ কাণা-ঘুষো করলে বেক্ সাহেবের সঙ্গে শ্মীগ্‌লি্য সাহেবের বনিবনাও হ'চ্ছে না। সে কথা পরে হবে। আপাততঃ বেক্‌সাহেব এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন, যা দেখে জনসাধারণের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জনসাধারণ নিজেই চেক্‌দের বিরুদ্ধে লড়তে চায়। বলা বাহুল্য, বেক্ সাহেবের এ চালটি হিট্‌লার আর মুসোলিনীর কাছে শেখা।

ফল কথা, জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পোলরা চেকো-স্লোভাকিয়ার উপর হাম্‌লা করতে প্রস্তুত হ'লো। এবং পোল-চেক্ সীমান্তে জমা হ'লো কাতারে কাতারে সৈনিক, যুদ্ধের মালমসল্লাহ্ ও সারি সারি উড়ো জাহাজ। ইংরেজ, ফরাসী ও রূশদের মনে কী ছিল, তা বলা শক্ত। তবে একটু ভেবে দেখলে এইটুকু বোঝা যেতে পারতো যে, তারা সবাই মিলে পোলদের চোখ টিপছে, ক্ষান্ত হবার জন্যে, কিন্তু রগ-চটা পোলরা তার

বিন্দুবিসর্গও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। ব্যাপারটা ভালো করে' বুঝিয়ে দেবার জন্যে চেক্‌রা নিজেই এলো। বেকের মাথা ডিঙ্গিয়ে এলো চেক্‌ উড়োজাহাজ, রাষ্ট্রপতি বেনেশের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি মশ্চীৎস্কির সমীপে, কী এক বিশেষ বার্তা বহন করে। অধ্যাপক মশ্চীৎস্কি ভালো মানুষ, তার ওপর তাঁর যে বয়স তাতে এসব কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করবার মত তাঁর সাহস নেই। তাছাড়া তাঁর তস্‌বীর ডাকটিকিটে যেমন সুশোভন দেখাতো, রাজকার্য্যে ছিল তাঁর সেই অনুপাতে আপন ব্যক্তিত্বের তাৎপর্য্য-হীনতা। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার প্রচেষ্টায় বেক্‌ সাহেব শ্রীযুত বেনেশের প্রতি দস্তুরমত চটে' গেলেন, এবং হিট্‌লারের টেপা অবশ্য ছিলই। সুতরাং অধ্যাপক মশ্চীৎস্কি ডাক্তার বেনেশের প্রস্তাব গ্রহণে অসামর্থ্য জানিয়ে বলে' পাঠালেন, এসব কাজ তাঁর পররাষ্ট্রসচিবের অধিকার-ভুক্ত। হতবুদ্ধি পোলরা হাঁ করে' চেয়ে দেখলো, একখানা চেক্‌ উড়োজাহাজ এলো আর চলে' গেল। চেক্‌ বার্তাবহ কী উদ্দেশ্যে এসে-ছিলেন, এবং প্রস্তাবটা কী, তা আজপর্য্যন্ত জানা যায় নি! তবে মন্দ-লোকে কানা-ঘুষো করলে, চেক্‌রা নাকি বলে' পাঠিয়েছিল, তারা জাতভাই পোলদের জেলাদু'টো ফিরিয়ে দিতে রাজী আছে, তবে দু'দিন পরে, ঠিক এই সময়ে নয়, কারণ জার্মানরা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এতে জগৎ-সুদ্ধ লোকের সহানুভূতি পাবে। এইসূত্রে নাকি জার্মানীর কাছ থেকে পোলদের ভবিষ্যৎ বিপদের কথাটাও তোলা হয়েছিল। যাই হোক, সস্তায় কিস্তিমাৎ করা শ্রীমান্‌ বেকের রীতিগত চাল। কাজেই অন্ততঃ দেশের মানুষের কাছে অত সহজে বীরপুরুষ বলে' অভিহিত হবার এবং দেশের সর্বত্র দোকানের জান্‌লায় জান্‌লায় দ্বিবর্ণ পতাকা-অলঙ্কৃত আপন তস্‌বীর দেখবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে, বেক্‌ সাহেব হাঁক্‌লেন, "লাগাও ডাণ্ডা!"

ফরাসীরা অবশ্য চটলো, ফ্রাঁস-প্রবাসী পোলদের তারা বয়কট্ করলে। কিন্তু তাতে কাগজওয়ালারা জোর গলায় শুনিয়ে দিলে, এমন ফ্রেণ্ড্‌কে তারা ফ্রেণ্ড্ বলেই স্বীকার করে না। এতদিন ধরে' জার্মানীর দাবীদাওয়া ফরাসীরা মেনে নিচ্ছিল, আর তাদের বেলাতেই যত দোষ! ইত্যাদি ইত্যাদি। রুশীয়া আসন্ন সংগ্রামের জন্যে একটু আধটু তৈরী হচ্ছিল বলে' বোধ হ'লো। রোমানীয়ার ভেতর দিয়ে চেক্‌সীমান্তে সৈন্য ও বিমানপোত সরবরাহ করবার জন্যে রুশীয়া রোমানীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল! কিন্তু পোলরা যখন বেঁকে বসলো, তখন তারাও পিছিয়ে গেল।

তারপর কি হলো, তা সবার জানা আছে। ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিকে হিট্‌লার, মুসোলিনী, ৮চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির করলেন জার্মানীর দাবী মঞ্জুর হ'লো। ফরাসী ও রুশীরা দু'দিক দিয়ে সরে' পড়লো। হতভম্ব চেক্‌রা, যারা এতদিন রণসাজে সজ্জিত হয়ে ব্রিতানীয় মধ্যবর্তিতায় শান্তির অপেক্ষা করছিল, তারা মিউনিকের বিচারকে বিশ্বাস করতে পারলে না। এই চার মহাপুরুষ যে কী অধিকারে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে অবাধে হস্তক্ষেপ করলেন, তার বিচার হয়তো একদিন ঐতিহাসিকেরা ও আইনজ্ঞরা করবেন। কিন্তু চেক্‌দের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে, তাদের অপরের হাতে অর্পণ করা যে খোলা হাটে মানুষ বেচারই সামিল, তা অনেক স্বাধীনতা-বিলাসী ইংরেজেরই চোখে পড়লো না। চেম্বারলেন সাহেব অলিভ্-ডাঁটাটি উঁচিয়ে তুলে, ছাতা উড়িয়ে ইঙ্গস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। এবং সেখানে পৃথিবীর শান্তিত্রাতারূপে যথারীতি সম্বর্দ্ধিত হলেন।

চেকো-স্লোভাকিয়ার অবস্থা তখন শোচনীয়। মারপিট করতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা করে' মারপিট করা যায় না। মাথা ঠাণ্ডা করে' সুদের হিসাব করা যায় বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথাটা ঘুসো-ঘুসির যে সব চেয়ে বড় অন্তরায়,

সে বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। চেক্‌রা যখন মার লাগাতে এবং মার খেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তখন কূটনৈতিক ফন্দীতে জার্মানদের কুপোকাৎ করে' ফেলা হবে, এমনতর আশা চেক্‌দের মনে জাগা তাজ্জব নয়। কারণ ব্রিতানীয় ও তদুপরি ফরাসী কূটনীতির অসাধ্য জগতে কি থাকতে পারে? সুতরাং চেক্‌রা সামরিক উর্দি চড়িয়ে, কামান-বন্দুক নিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছিল। তাদের নেতা ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ সেনাধ্যক্ষ সীরভী (যাঁর নামের ভাবার্থ হচ্ছে "দোর্দ্দণ্ড")। গত যুদ্ধে একটি চোখ তাঁর নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পাকা যোদ্ধা ও সমর-কারসাজিতে সুদক্ষ বলে' তাঁর নামডাক ছিল। মিউনিক-কেলেঙ্কারীর অব্যবহিত পূর্ব্বে ইনি চেকো-স্লোভাকিয়ার রাজকার্য্যে সর্বাধিকারীরূপে নিযুক্ত হন। ২৯শে সেপ্টেম্বর যখন মিউনিকের হাটে চেক্‌দের বেচা হ'লো, তখন সীরভী দেখলেন তাঁর সেনা তখনও যুদ্ধে প্রস্তুত থাকলেও, তার অনেকাংশে নৈতিক অবনতি ঘটেছে। অর্থাৎ লড়াকুদের যে জিনিষটিকে বলা হয় "মরাল", সেইটি ভেঙ্গে গেছে। চাকার অক্ষদণ্ড ভেঙ্গে গেলে তাকে মেরামৎ করে' বেশীদূর যাওয়া যায় না, একথা সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর জানা ছিল। অনেকদিন রাত জাগতে জাগতে সেবাকারীদের অবসন্ন দেহ-মনে রোগীর ওপর যেমন কেমন একটা বিরক্তি জন্মায়, এবং তা প্রকাশ না করলেও তাদের কাজে মন্দা পড়ে, স্বদেশের প্রতি চেক্‌দেরও সেই ভাব দেখা দিল। সীরভী যুদ্ধে বিরত হলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় রাদিওর সুমুখে বসি। প্রাহায় নানা সম্ভ্রান্ত চেক্ জনসাধারণকে শান্ত হবার জন্যে অনুরোধ করছেন। মনে পড়ে বিখ্যাত চেক্-লেখক কারেল চাপেক্ কথা বলতে বলতে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। সে কী বুক-চাপা কান্না! পোলদের মধ্যে অনেকেরই অশ্রু বাধা মানছে না। বার্লিনের ষ্টেশন থেকে আসছে অকথ্য-ভাষার সংমিশ্রণ আর বিকট

আনন্দ-কোলাহল। কথা বেশীর ভাগই বোঝা যায় না, শুধু মাঝে মাঝে শুনতে পাই, "বেনেশ্", "বেনেশ্" আর অট্টহাস্য। ভারশৌএর পথেঘাটে যে আনন্দের স্রোত বইছে তা নয়, তবুও সরকারী প্রোপাগান্দা ও বিজয়-ঘোষণা চলেছে সমানে, রাদিও-যোগে। মুদী, নাপিত, কসাই এবং ঐজাতীয় পরিবারে রাদিওর সুমুখে বসে' পাড়াপড়সীরা সস্তা আমোদ উপভোগ করছে।

১লা অক্টোবর থেকে সুরু হ'লো চেকো-স্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ, আন্তর্জাতিক পুলিসের তত্ত্বাবধানে। জার্মানদের তর সয় না। সুদেতী মুলুক বলে' তারা যে জমীর নক্সা দাখিল করেছিল, আসলে দখল করবার সময় হুটোপাটি করে' হাতালে তার অনেক বেশী। যা পারলে লাঠির জোরে নিজেদের বেড়ার ভেতর টেনে নিলে। চেক্‌রা নালিশ করলে; ইংরেজ ও অন্য অন্য আর কারা যেন মনে নেই, যারা আন্তর্জাতিক পুলিসের কাজ করছিল, তারা দেখতে পাচ্ছে না, এমন ভাব দেখিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। ঠিক এই সময়ে Manchester Guardianএ একটি মজার বিবৃতি বেরিয়েছিল, মনে আছে। এক ইংরেজ সাংবাদিক চেকো-স্লোভাকিয়ার পুলিসীর কাজে রত একদল ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা তোলেন। তাতে সৈন্যরা একবাক্যে বলে, "যাও যাও হে চেংড়া ছোক্‌রা, যুদ্ধ দেখনি কখনো, তাই বড় বড় কথা বলছো। আমরা একবার লড়াই করেছি, জীবনে ছু'বার লড়বার আমাদের সখ নেই!" ঠিক এই ধরণের কথা শুনি ভারশৌএ এক বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকের সংবাদদাতার কাছ থেকে। যাক্ সে অন্য কথা।

পোলরাও হৈ চৈ করে', গোরাবাস্থি বাজিয়ে তাদের ভাগের "জা-অল্‌ঝিয়ে" বা "অলসা" নদীর অপর তীরবর্তী জেলাদুটি দখল করতে সুরু

করলে। কাগজে ছবি বেরোয় রংচঙে, চমকদার, চটকদার, পোলদের বীরত্বের কাহিনী। দু'একটা লাঠালাঠির বিবরণ। কীভাবে নিপীড়িত, নির্য্যাতিত পোলরা মুক্তিদারী পোলসেনাকে অভ্যর্থনা করে, তার কথা, দখলকারী জাঁদরেলকে কীভাবে একটি বুড়ী চাষী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে' তাঁর উপর চুম্বন বর্ষণ করে তার সংবাদ, এই সব। বেক্ সাহেবের ফটো দোকানের জাল্নায় জাল্নায় যথারীতি শোভা পেতে লাগলো। রাদিও-যোগে চললো রাষ্ট্রীয় পাণ্ডাদের গলাবাজী আর গোরা-বাজনা। ইতরজনে সুযোগ পেয়ে মদের বান ডাকালে, ভদ্রলোকে কানে আঙ্গুল দিয়ে ঘরে বসে' প্রতিবেশীর রাদিওর হাঁকডাঁক থেকে আত্মরক্ষা করবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলো। তবে নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে একথা স্বীকার করতে হবে, যে সাধারণ পথ-চলা পোলের মনের ভাবটা এই যে, '২০ সালের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে চেক্‌দের ওপর ভারী চমৎকার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। এরকম অভিমত প্রায়ই শুনি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সামান্য-শিক্ষিত দরোয়ান হাসতে হাসতে বললে,—"এবার বাবু আমাদের পালা!" কথাটার তাৎপর্য্য এক বছরের মধ্যেই বোঝা গেল।

ইতিমধ্যে পোল আর জার্মানদের ভেতর একটা কাণ্ড ঘটলো তার উল্লেখ এখানে করে' রাখতে চাই। গুজব শোনা গেল, পোলরা যখন তাদের জেলা দুটি দখল করছে, ঠিক সেই সময় জার্মানরা এসে বহুমিন্ (চেক্), বগুমিন্ (পোল), বলে' একটা জায়গা হাতাতে চেষ্টা করে। পোলে জার্মানে তখন যদিও খুব মাখামাখি, তত্রাচ বহুমিনের সত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ একটু মন কসাকসি হয়। জার্মানরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে হাজির হয় একেবারে বহুমিন্ স্টেশনে। এবং পোলরা অল্পক্ষণের মেয়াদ দিয়ে গোটা আরমার্ড্ ট্রেনখানিকে আরোহী সমেত কামানের গোলায় সশরীরে স্বর্গে পাঠায়। এ কথা কোনো অখ্‌বারের পৃষ্ঠায় ছাপা হয় নি।

তবে কথাটা যে একেবারে নিছক মিথ্যে, তা বলা যায় না। কারণ গুজবটা সরকারকে এমন বিহ্বল করে' ফেললে যে, তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চুপিচুপি বলাও শাস্তি-বিধের বলে' ঘোষণা করা হ'লো। স্পষ্ট বোঝা গেল, পোল-জর্মান সম্পর্ককে বেক্ সাহেব যেন তেন প্রকারেণ, এমন কি লেজ কেটে মুড়োটাকেও জিইয়ে রাখতে চান।

যাক্, এখন চেক্‌দের কথা শেষ করি। ৫ই, মান্যবর ডাঃ বেনেশ্ বিমানপথে লন্দনে পৌছলেন, এবং সেখানে ৺চেম্বারলেন যেমন জগতের শান্তি-ত্রাতা বলে' ইংরেজ জনতা কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন, সেই ইংরেজ জনসাধারণ দ্বারাই তিনি গণতন্ত্রের প্রতীকরূপে অভ্যর্থিত হ'লেন। রাজকার্য্য চালাতে লাগলেন সেনাধ্যক্ষ সীরভী। তবে সে রাজকার্য্য নামে মাত্র। ঘরে বা দেশে একবার ভাঙ্গন ধরলে তাকে ঠেকানো শক্ত। চেকোস্লোভাকিয়ার ভিতে যখন হু হু করে' জল ঢুকছে তখন তার কাঠামটাকে যে বেশীদিন খাড়া রাখা যাবে না, এ কথা অনেকেই উপলব্ধি করলে। স্লোভাকদের পাণ্ডা পাদ্‌রী হ্লীন্‌কা যদিও এর মধ্যে পাদ্রী-লীলা সাঙ্গ করে' স্বর্গারোহণ করলেন, তবুও জার্মানদের প্ররোচনায় তারা চেক্‌দের বিরুদ্ধে সমানে বিরোধ চালিয়ে চললো। এবং হ্‌লীন্‌কার অবর্তমানে স্লোভাক্‌দের নূতন উপসর্গ জুটলো, পাদ্‌রী তিস্‌সো। তারা স্বায়ত্বশাসন লাভ করলে। এইবার হাঙ্গারীয়রা মার মার শব্দে খানিকটা স্লোভাকিয়া দখল করতে উদ্যত হ'লো, এবং রুশিন্-উক্রাইনীরা নিজেদের মধ্যে মারপিট সুরু করলে।

এমনি করে' চললো কিছুদিন। তারপর তথাকথিত চেক্ রাষ্ট্রের অধিপতি হ'লেন হিট্‌লারের এক তাঁবেদার যাঁর জামাই একজন জার্মান। চেক্‌দের আমলে তিনি ছিলেন নামজাদা বিচারক এবং গুপ্তভাবে ছিলেন ঘোর হৈট্‌লার। এঁর সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল—এর নাম—হাহা।

চেক্‌দের বেইজ্জৎ করবার জন্যেই বোধ হয় বেছে বেছে এমন লোককে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করা হ'লো, যার নাম শুনে জগৎসুদ্ধ লোক হেসে লুটিয়ে পড়বে—হাহা, হাহা! হ'লোও তাই। ১০ই মার্চ ১৯৩৯ স্লোভাক্‌রা আজাদীর গামছা ওড়ালে। চেকো-স্লোভাকিয়ার গোলমালে জার্মানীর বিপদের সম্ভাবনার অজুহাতে হিট্‌লার হাহাকে তলব করলেন। সে কথা জগতে কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পেলে না। হিট্‌লারের আস্তানা বের্খ্‌তেস্‌গাদেনে যখন হাহা স-কন্যা হাজির হ'লেন, তখন তাঁদের ফুলের তোড়া দিয়ে আপ্যায়িত করা হ'লো। এমন কি যে হোটেলে তাঁরা গিয়ে উঠলেন, তার ছাদের ওপর চেক্‌ পতাকা সশব্দে পাখা ঝাপটা দিতে লাগলো। তার পর হিট্‌লার-হাহা মোলাকাতে চেক্‌দের জন্মের মত কুপোকাৎ করা হ'লো। কারণ ১৫ই মার্চ হাহা চেক্‌দের প্রতিনিধিরূপে হিট্‌লারচরণে সমগ্র চেক্‌জাতির দাসখৎ লিখে দিয়ে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ক্ষেতখামার থেঁৎলে, বেড়া ভেঙ্গে পিল্‌পিল্‌ করে' ঢুকলো এসে জার্মান-বাহিনী। ভোর হ'তে না হ'তেই প্রাহার অধিবাসীরা হতভম্ব হয়ে দেখলে রাস্তাঘাটে জার্মানী সৈন্যে ছেয়ে গেছে। জার্মানরা যে বোকার মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশান উড়িয়ে হিট্‌লারের জয়-ঘোষণা বা পথে-চলা পাঁচ-পাঁচী গোছের চলনসই ঝি-চাক্‌রাণীদের সঙ্গে ফষ্টি-নাষ্টি করতে লাগালে, তা নয়। তারা হৈ হৈ করে' ঢুকলো খাবারের দোকানে, রেস্তোরাঁয়, হোটেলে, স্ন্যাক্‌-বারে, অটোমেটিক্‌ বারে, যে যেখানে পারলে ঢুকে পড়লো। এবং ঢুকে পড়ে' তারা আগুনতাতে হাত পা সেঁকতে বসলো না। হোটেল-ওলাদেরযত রকমের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আছে তা তৎক্ষণাৎ তাদের সাম্‌নে ধরে' দিতে হুকুম করলে। সারাদিন ধরে' চললো ভোজ, অবশ্য বিনা পয়সায়। জার্মানরা যে বহুদিন

যাবৎ হিট্‌লারের প্রসাদে, ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত পানাহারের মুখ দেখেনি, তার পরিচয় পাওয়া গেল।

বিকেলবেলার দিকে এলেন স্বয়ং হিট্‌লার। পৃথিবীর বড় বড় লোকদের এক একটা বাই থাকে, শোনা যায়। কেউ জমান ডাক-টিকিট, কেউ নানা রঙের প্রজাপতি, কেউ বা বই হাতে করে' নানা জাতের, নানা বর্ণের পাতাল-ফোঁড়ের সন্ধানে বনেবাদাড়ে ঘুরে' বেড়ান। হিট্‌লার সাহেবের সখ দেশ-বিদেশের রাজপ্রাসাদে রাত কাটানো। ছেলেবেলায় শোনা উপকথার জের কারো কারো বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত টিকে যায়। তাছাড়া কটা মানুষের ভাগ্যেই বা শূন্যে তৈরী দুর্গ বাস্তব হয়ে ওঠে? প্রাহার প্রাচীন হ্রাদ্‌চিন্‌দুর্গে, যে ঘরটিতে চেকো-স্লোভাকিয়ার পূর্বতন রাষ্ট্রপতিদের আবাস ছিল, বিশেষ করে' ডাঃ বেনেশের, সেখানে হিট্‌লারের বিছানা করা হ'লো, অবশ্য তাঁর সঙ্গে নিজস্ব চাদর ও বালিশ ছিল। হ্রাদ্‌চিনে উড়লো হিট্‌লারের জয়পতাকা। চেক্‌দের, দু'টো প্রদেশ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ায় বিভক্ত করে', ইংরেজরা যেমন ভারতে বা আফ্রিকায় তাঁবেদার বা "রক্ষিত" রাজ্যের সৃষ্টি করেছে, সেই কায়দায় "প্রোতেক্‌তরাত"এর আওতায় রাখবার ব্যবস্থা হ'লো। এ ক্ষেত্রে অবশ্য চেক্‌দের একেবারে জার্মানীভুক্ত করে' নেওয়া হ'লো। সুধু নামে তারা রইল "রক্ষিত", কিন্তু আসলে হ'লো ভুক্ত ও ভোজ্য।

স্লোভাকিয়া তার বহু সাধনার, বহু আরাধনার, ঈপ্সিত আজাদী পেলে। অর্থাৎ পাদ্‌রী তিস্‌সো যদিচ গদিতে চড়লেন, সিংহাসনে উঠে দেখেন, তিনি শালগ্রাম ছাড়া আর কিছু নন্‌। এই ঠাকুরটিকে সিংহাসনে মোতায়েন করে' হিট্‌লার স্লোভাকিয়ার ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হ'লেন।

চেকো-স্লোভাকিয়া রাষ্ট্র জগতের মানচিত্র থেকে আপাততঃ বিলুপ্ত হ'লো।

ভের্সাঈ-চুক্তিতে যে ইংরেজ ও ফরাসীরা জার্মানদের চিরকালের মত টীট্ করে' আপন কড়ে আঙুলের তলায় রাখবার জন্যে বানিয়েছিল চেকো-স্লোভাকী ফাঁড়ি, তারা নিজেই শাবল-কোদাল দিয়ে সেই ফাঁড়ির উচ্ছেদ করলে। একেই বলে, ডালে বসে' সেই ডালটিরই গোড়াঘেঁসে কোপ মারা।

চেকো-স্লোভাকিয়া দখল করার পর হিট্‌লারের ছুলালরা পথে পথে গলা ফাটিয়ে কী একটা ছড়া-বাঁধানো গান গেয়ে বেড়াতে লাগলো, যার সার মর্ম এই যে, কাল তারা পেলে আউস্ত্রিয়া, আজ চেকো-স্লোভাকিয়া, আর আগামী কাল পাবে সারা ছুনিয়াখানা। শেষ কথাগুলো—Und morgen die ganze Welt—অনেকের কাছেই ছোকরাদের ডেঁপোমি বলে' মনে হ'লো। তাছাড়া সংগ্রাম-বিমুখ ইউরোপ তখন হিট্‌লারের এর ঠিক পরের চাল কী হবে, তাই নিয়ে জুয়া খেলতে বসলো। অনেকেই এবার গভীর মনোযোগ সহকারে "আমার গুণ্ডামি" কেতাবের তর্জমা পড়তে লাগলেন। ফ্রাঁসে এতদিন পরে পুঁথিখানির নির্ভেজাল অনুবাদ প্রকাশিত হ'লো, যা পড়ে' ফরাসী জনসাধারণ উপলব্ধি করলে, ফ্রাঁস সম্বন্ধেও হিট্‌লারের মৎলব খুব আশাপ্রদ নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইউরোপে পূরোদমে চললো স্পেকুলেশন্—হিট্‌লার এবার কোন্‌মুখো যাত্রা করবেন, পূবে না পশ্চিমে? অর্থাৎ জার্মানীর আপন প্রতিবাসীদের ওপর সদাচার সম্বন্ধে যে ছ'টি প্রবাদবাক্যের প্রচলন ছিল—Drang nach Osten এবং Drang nach Westen (তাৎপর্য্য: "পূর্ব দিকে অভিযান" এবং "পশ্চিম দিকে অভিযান")—তা নিয়ে ফরাসী, ইংরেজী, পোলীয় এবং

রুশীয় সংবাদপত্রসমূহে বড় বড় গবেষণাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হ'তে লাগলো। এই চার ভাষার যতগুলি অথ্‌বার হাতের কাছে পাওয়া গেল, তা পড়ে' কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ এই অধমের যা ধারণা হ'লো তা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় এই, পূর্বে ও পশ্চিমে, দুই দিকেই হিট্‌লারের যাত্রা নাস্তি। পশ্চিমে "মাঝিনো" প্রাচীর এবং টাকার বস্তা দিয়ে তৈরী আত্মরক্ষার দেওয়াল। পূর্বে পোলীয় ডাণ্ডা, রুশীয় ঝাণ্ডা এবং আ-বল্‌কান্‌ বিস্তৃত জার্মান-বিদ্বেষ। সুতরাং চতুর্দিক থেকেই বৃকোদর হিট্‌লার একেবারে "বাঘ বন্দী"! এই গেল এক পক্ষের মত। অপর পক্ষে, বিশেষতঃ ফরাসী ও পোলদেশে, সাংবাদিক ও কূটনীতিকেরা মত প্রকাশ করলেন যে, হিট্‌লার হয় পূব দিকে নয় পশ্চিমে তাঁর দিগ্বিজয়ী অভিযান চালাবেন। ফরাসীরা বললে, পূব দিকে, কারণ রুশিয়ার প্রতি হিট্‌লারের যা আক্রোশ তাতে তার উচ্ছেদসাধন আগে না করে' তিনি অন্য কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। পোলরা বললে, পশ্চিম দিকে, কারণ ফরাসী ও ইংরেজরা তৈরী হবার আগেই তাদের ওপর চড়াও হ'তে পারলেই, ইউরোপের আধিপত্য হিট্‌লারের করতলগত। অর্থাৎ দু'পক্ষেরই মনের ইচ্ছেটা "যা শত্রু পরে পরে।"

ইউরোপের কূটনৈতিক শেয়ার-মার্কেটের দালালরা যখন নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পেকুলেশনে ব্যস্ত, সেই অবসরে হিট্‌লার তাঁর বিশ্বব্যাপী Drangএর তোড়জোড় করছেন। পূবে কি পশ্চিমে তা ভাববার তাঁর সময় নেই।

কাগজের ওপর কালীর আঁচড়-টানা চুক্তিপত্র বা যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত মৌখিক বাক্যকে সম্মান করা হিট্‌লার সাহেবের নীতি বা রীতিসঙ্গত নয়, কারণ কাগজ ও কালী এই দুই বস্তুই অশাশ্বত, এবং মৌখিক বাক্য বায়ুর ফুৎকার মাত্র। কাজেই চেকো-স্লোভাকিয়া দখল

করার পরই মুহূর্তের উত্তেজনায় তিনি পৃথিবীকে লক্ষ্য করে' স্বস্তিকের তলায় দাঁড়িয়ে যেসব স্বস্তিবাক্য ঝাড়লেন তা শুনে চোখের জলে বুক ভাসাবার মত মানুষ জগতে খুব বেশী দেখা গেল না। পরন্তু, ম্লেচ্ছ চেক্‌দের তাঁর পবিত্র "উত্তর-কুরুর" অন্তর্ভুক্ত করায় সাধারণ লোকের এই ধারণা জন্মালো যে, হিট্‌লার এবার জাতি-বিচার না করেই যার তার কাঁধে উত্তর কৌরবের যজ্ঞ-স্বস্তিক আঁটতে সুরু করলেন। তত্রাচ পোলদের এ বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'লো, যে রোম-বার্লিন্ অক্ষদণ্ডটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, টেনে-হেঁচড়ে ভারশৌ পর্য্যন্ত হাজির করা বিশেষ ক্লেশ-সাধ্য নয়। এ ধারণার জনক হ'চ্ছেন শ্রীমান্ য়ুজেফ বেক্। পোল-জার্মান আঁতাআঁতির গোড়ার দুটো একটা কথা এখানেই বলে' রাখা ভালো।

আধুনিক পোলদেশের জন্মদাতা সেনানায়ক পিল্‌সুদ্‌স্কি মৃত্যুর দু'এক বছর আগে হঠাৎ উপলব্ধি করলেন, পোলদেশের সম্যক উৎকর্ষের জন্যে তার গতানুগতিক ফরাসী-ঘেঁসা রাষ্ট্রনীতি বর্জন করে' সর্ববিষয়ে স্বাধীন চিত্তবৃত্তির চর্চা করা নিতান্ত প্রয়োজন। ফরাসীদের ওপর এমন মক্ষম চটে' যাবার কারণ যে কী তা কারো সঠিক জানা নেই। এর একটা কারণ এই হ'তে পারে যে কয়েক বছর আগে থেকে রুশদের সঙ্গে ফরাসীদের দহরম-মহরম আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছিল। এবং পিল্‌সুদ্‌স্কি ছিলেন মনে-প্রাণে রুশদের শত্রু। তাঁর মুখের বুলি ছিল, রুশদের সঙ্গে কোনো প্রকার বন্ধুতার চুক্তি করার আগে তিনি স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে সে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। সুতরাং ফরাসীরা যখন এ হেন রুশদের সঙ্গে মাথামাথি সুরু করলে তখন তিনি তাদের সঙ্গে আবহমান কালের সখ্য-সম্পর্ক একেবারে তুলে দিলেন।

ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে, পোলদের সঙ্গে জার্মানদের

আত্মীয়তার সূত্রপাত হ'লো। এই আত্মীয়তার কারণও বেশ একটু অদ্ভুত। হিট্‌লার শক্তিলাভ করার পর পোলদের সম্বন্ধে দু'একটা কড়া কথা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই সেনানায়ক পিল্‌সুদ্‌স্কি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, পোল-জর্মান জমীজমার মামলা চিরতরে নিরূপিত হয়ে গেছে; তত্রাচ যদি হিট্‌লার আবার পুরাণো কথা তোলেন, ত তিনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছেন। বৃদ্ধ সেনানায়কের যে ঠাট্টা করা অভ্যাস ছিল না, তা হিট্‌লার ভালো রকমেই জানতেন। এবং তখন যুদ্ধে নামা নাৎসী জার্মানীর পক্ষে যে আত্মঘাতী হ'তো একথা হিট্‌লার মহোদয়ের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং কথাটা চাপা দিয়ে, বিশেষ করে' ফরাসীদের কাছ থেকে পোলদের ভাঙ্গিয়ে আনবার জন্যে হিট্‌লার এক পোল-জর্মান সৌহার্দ্যের চুক্তির প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ১৯৩৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী উক্ত সর্ত উভয়পক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। সর্তের মোট কথা এই :—

> জর্মান ও পোলীয়, এই দুই রাষ্ট্রেরই অভিমত এই যে, পোল-জর্মান রাজনৈতিক সম্পর্কে এক নূতন যুগের প্রবর্তনের সময় এসেছে, যাতে এক রাষ্ট্র অপরের সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে বোঝাপড়া ও ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে।...
>
> উভয় রাষ্ট্রই এ বিষয়ে একমত যে, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপিত হওয়া ইউরোপের শান্তিরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য।
>
> তদনুসারে তারা, ব্রিয়াঁ-কেলগ্‌ সর্তের যে মূলনীতি, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কলহে যুদ্ধের পরিহার, তারই ওপর পরস্পরের সম্বন্ধ ও সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত করতে মনস্থ করেছে।...
>
> যদি তাদের মধ্যে কোনো কলহের সূত্রপাত হয়, এবং তার সমাধান প্রত্যক্ষ বিচার-তর্ক দ্বারা সম্ভব না হয়, ত তারা কোনো শান্তিকর

উপায়ে তার মীমাংসা করতে চেষ্টা করবে।…কোনো কারণেই তারা মতদ্বৈধের সমাধানের জন্যে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করবে না।

উক্ত সর্তের আয়ু নির্দিষ্ট হ'লো দশ বছর। পিল্‌সুদ্‌স্কি ভাবলেন, এই দশ বছর শান্তির অবকাশে তিনি গোটা পোলদেশটাকে সব দিক দিয়ে গড়ে' তুলতে সমর্থ হবেন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল। এর বছর খানেকের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। রাষ্ট্রশাসনের কার্য্যভার, যা তিনি একরকম একাই বহন করছিলেন তা ন্যস্ত হ'লো তাঁরই কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের ওপর, যাঁরা "পিল্‌সুদ্‌চ্যিক্" নামে খ্যাত হ'লেন। তাঁদের মধ্যে সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন, রীদ্‌জ্-স্মীগলি্য, এবং পররাষ্ট্র-সচিবের গদি পূর্ববৎ অলঙ্কৃত করে' রইলেন স্বয়ং য়ুজেফ্ বেক্ যিনি পিল্‌সুদ্‌স্কির জীবদ্দশায় কার্য্যতঃ তাঁরই খাস মুহুরী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বেকের কুলজি আমার জানা নেই। মন্দ লোকে কেউ কেউ তাঁকে ইহুদী বলে' সন্দেহ করতো। তিনি যে জর্মান-বংশজাত এ কুৎসাও শুনেছি। এবং শুনেছি, তাঁর পিতৃব্যজ ভাই কে এক হ্যার্ বেক্ হিট্‌লারের তাঁবের লোক, এবং জর্মান সরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আর এক শ্রেণীর নিন্দুকদের মত এই যে, তাঁর ধমনীতে ইহুদী-প্রবর শেম্-এর রক্ত প্রবাহিত, তা তাঁর নাসিকা, ওষ্ঠাধর ও হস্ত-সঞ্চালনের কায়দায় স্পষ্ট প্রতীয়মান। এবং তা চাপা দেবার জন্যে তাঁকে একটু বেশী করে'ই জার্মানী হাব-ভাব ও মনোবৃত্তি প্রকাশ করতে হ'তো। তাঁকে যে সামান্য একটু দেখবার সুযোগ ঘটেছে, তাতে তাঁকে ঠিক আর্য্য বা উত্তর-কৌরব বলে' মনে হয় নি। শ্রীযুক্ত বেক্ সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল,—এই ব্যক্তির জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেদী ছিল তাঁর জাতির অনিশ্চয়তা। তিনি না ছিলেন পোল,

তা তাঁর নাম থেকেই অতি সহজে অনুমেয় ; না ছিলেন জার্মান এবং না ছিলেন ইহুদী। তিনি ছিলেন এই সবকটিরই এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, যা তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতিতে গভীর অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছিল। যে ইহুদীয়ানার ছাপ ছিল তাঁর চেহারায় তাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে অবজ্ঞা করতেন। গোঁড়া পোলীয়ানা ছিল তাঁর আচার-ব্যবহারের বাইরের ঠাট, কারণ তাতে দেশপ্রেমী, স্বজাতিবৎসল পোলদের কাছে তিনি প্রীতি ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁর জার্মানীয়ানা নিজেকে স্বদেশে বিদেশী জ্ঞান করতে প্রচুর সাহায্য করতো, এবং তা করে' তিনি এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এই তিন মনোভাবের কোনো সঙ্গতি তাঁর চরিত্রে ঘটতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। পোলদেশের রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধার হিসেবে বছরের পর বছর নানা হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্যের বর্ণচ্ছটায় সমগ্র পোলজাতিকে চমৎকৃত করে' তাদের সর্বনাশের পথে এগিয়ে দিলেন যে ব্যক্তি, তাঁর সম্বন্ধে উপরি উক্ত গোটা কয়েক শ্রুতিকটু কথা প্রয়োগ করায়, আশা করি, সাধারণ শিষ্টাচারের ব্যাতিক্রম করা হ'লো না।

ফল কথা, শ্রীমান য়ুজেফ্ বেক্ পিল্‌সুদ্‌স্কির মৃত্যুর পর নিজেই পোলদেশের পররাষ্ট্রনীতির হাল ধরলেন। পিল্‌সুদ্‌স্কি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বেক্ শুধু নামে ছিলেন পররাষ্ট্রসচিব। এখন তাঁর সখ হ'লো, তিনি নিজে দেশটার হাল ধরে' অকূল পাথারে পাড়ি দেবেন। এর আগে ছিলেন সামরিক রাজপুরুষ। পদে ছিলেন কর্ণেল, এখন হ'লেন কূটনীতির কর্ণধার। এই কাজে তিনি যে উন্নতি করলেন, তা দেখে দেশের লোক চমৎকৃত হ'লো, এবং তাদের কাছে তাঁর খাতির হু হু করে' বেড়ে গেল। তাঁর উন্নতির সহায় হ'লো দুটি জিনিষ। এক : যে সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে, তখন পৃথিবীর অবস্থা এমন সহজ ও সরল ছিল যে, পররাষ্ট্রসচিবদের জেনেভায় লাঞ্চ্ ও ডিনার খাওয়া এবং

দামী মদের পেয়ালায় চুমুক দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো দায়িত্ব ছিল না। দুই ঃ বেক্ সাহেব দেশের লোককে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন, পিল্‌সুদ্‌স্কি মৃত্যুর আগে তাঁকে পোলদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে নিগূঢ় গুরুমন্ত্র দিয়ে গেছেন, এবং সেই মন্ত্র পালন করবেন তিনি অক্ষরে অক্ষরে। বিশিষ্ট পিল্‌সুদ্‌চ্যিকের মুখে শেষোক্ত কথা শুনে দেশের লোক আশ্বস্ত হ'লো। কারণ বৃদ্ধ সেনানায়ক সম্বন্ধে পোলদের মনে যেসব ধারণা ছিল, এবং তাঁর বুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় যে আস্থা ছিল, তা আমাদের দেশে বাপুজী সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ।

দেশের লোক বেক্ সাহেবের অতি-মানুষিক বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় পেলে লিতুয়ানিয়ার সঙ্গে পোলদেশের কলহের মীমাংসায়। পঁচিশ লাখ মানুষের একটা নগণ্য, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে ডাণ্ডার ভয় দেখিয়ে টীট্ করবার জন্যে তিনি জেনেভার বিলাস-ভবন ত্যাগ করে' ভারশৌএ ছুটে এলেন। সাড়ে তিন কোটি পোলদের সঙ্গে পঁচিশ লাখ লিতুয়ানীদের পক্ষে ঝোঝা যে সম্ভব নয়, এ একেবারে সরল পাটীগণিতের মত সহজ কথা। সুতরাং ডাণ্ডার ভয়ে লিতুয়ানীরা ঠাণ্ডা হ'লো। এর সঙ্গে সঙ্গে যে লড়াকু, কাঠ-খোট্টা জার্মান-বিদ্বেষী লিতুয়ানীদের নৈতিক শিরদাঁড়া বা "মরাল" একেবারে জন্মের মত ভেঙ্গে গেল, এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রাচ্য ইউরোপী রাষ্ট্রসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রথম ঘাঁটিকে ধ্বংস করা হ'লো, সে কথা ভাববার তখন বেক্ সাহেবের সময় নেই। রাদিও মার্ফৎ চলেছে বেক্-এর জয়জয়কার আর হৈ হৈ-কার। দোকানের জান্‌লায় জান্‌লায় তাঁর ফটোপট শোভা পাচ্ছে।

ঘটনাটা '৩৮ সালের ১৯শে মার্চ্চ তারিখের। চলতি ইতিহাসের পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, এর মাত্র এক সপ্তাহ আগে, অর্থাৎ ১২ই, হিট্‌লার মহোদয় বিপুল পরাক্রমে আউস্ত্রিয়া অধিকার করেন।

সুতরাং মন্দ লোকদের এ অনুমান হয়তো অযথা হবে না যে, হিট্‌লারের কৃতিত্বে বেক্ সাহেবের মনে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অনুরূপ সাফল্যের বাসনা দুর্দ্দমনীয় হয়ে' উঠেছিল।

পোলদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সামনে বেক্-এর দ্বিতীয় চাল কৃতকার্য্য হ'লো চেকো-স্লোভাকিয়ার ধ্বংসসাধনে। সে কথার অল্পবিস্তর আলোচনা এর আগেই করেছি। এখন এই দুই "আড়াইপা"র চালে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লো, সেইটেই আলোচ্য বিষয়।

লিতুয়ানিয়ার বশীকরণ ও চেকো-স্লোভাকিয়ার ধ্বংসীকরণের পর বেক্ সাহেব প্রতি বৎসরের মত পোলীয় "সেইম্" বা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর সংবৎসরের কীর্তির বিবৃতি দিলেন। তাতে পোলদের জয়জয়কার থাকলেও অন্যান্য বছরের মত এবার তা পোলদের চোখে ধূলো দিতে পারলে না। এতদিন বছর বছর ধরে' বেক্ মহোদয় একই কথা দেশের লোককে শুনিয়ে তাদের আশ্বস্ত করে' রেখেছিলেন: পোলদেশের পূর্বে ও পশ্চিমে দুই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু। এবং সুখের বিষয়, তাঁর প্রসাদে এই দুই দুর্দ্ধর্ষ শক্তির সঙ্গেই সখ্যসম্বন্ধ পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে।

এই দু'টি কথারই হেরফের বেক্ সাহেব দেশের লোকের কানে ঢেলে আসছিলেন। এবং তাঁর বিবৃতিতে কোনো নতুন কথা না থাকাতে পোলদের ও বিদেশী সখের রাষ্ট্রনৈতিকদের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বেক্-এর মত ধড়ীবাজ কূটনীতিক আজকাল নেই বললেই হয়, কারণ তাঁর আসল মৎলবটা যে কী তা আজ পর্য্যন্ত দেবা ন জানন্তি। এবার কিন্তু দেশের লোকের তাঁর বাক্যাড়ম্বরের ওপর ততটা আস্থা দেখা গেল না। অনেকেই কানাঘুষো করতে লাগলো জগতের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বেক্ সাহেবের মৎলবটা দেবা ন জানন্তি হ'তে পারে, কিন্তু তিনি নিজেই কি তা জানেন ?! বেকের নিজেরই যে কোনো

চাল আগে থেকে ঠিক করা নেই, এবং তিনি যে আনাড়ির মত এলো-পাতাড়িভাবে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে' খেলে চলেছেন, এ কথাটা পোলরা আস্তে আস্তে আবিষ্কার করতে লাগলো।

আবিষ্কার করবার কারণও অনেকগুলি ঘটলো। প্রথম কথা, পোল-জর্মান আঁতাআঁতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠলো। সেনানায়ক গ্যেরিং অন্যান্য বছরের মত সেবারও শীতকালে পোলদেশে মৃগয়ায় গেলেন। এবং সেখানে পোল রাষ্ট্রপতির অতিথিরূপে তাঁকে যে রকম তোয়াজ করা হ'লো তা দেখে অনেকেই বললে, কাজটা বড় বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে। এরই অব্যবহিত পরে, '৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে আলেমানী পররাষ্ট্র-সচিব ফন্ রিব্বেনত্রপ্ কী একটা গুপ্ত মিশন নিয়ে ভারশৌএ আবির্ভূত হ'লেন। কয়েকদিন ধরে' চললো বেক্ ও ফন্ রিব্বেনত্রপে গুজুগুজু ফুসুফুসু, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে চললো চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়; পোলদেশের স্বনামধন্য পেয়, উম্‌দ উম্‌দ ভূদ্‌কা, লিক্যোর প্রভৃতির ফোয়ারা ছুটলো। দেশের লোকের কারো কারো, বেক্-পরিচালিত দৈনিক, গাজেতা পোল্‌স্কা'য় বড় বড় শ্রুতিমধুর, দৃষ্টি-মনোহর রচনা পড়ে' এবং ছবি দেখে ধারণা হ'লো, এবার রোম-বার্লিন ধুরা ভারশৌএ এসে পৌছল বুঝি। ফাসিস্ত্ মনোভাবাপন্ন পোলরা বলতে আরম্ভ করলে, ইউরোপের পঞ্চম মহা-রাষ্ট্র হ'চ্ছে পোলদেশ, এবং জার্মানী, ইতালিয়া ও পোলদেশ মিলে সারা ইউরোপটাকে এবার শাসন করতে সুরু করবে। ফন্ রিব্বেনত্রপ্ চলে' যাওয়ার পরই বেক্ সাহেব কাউকে না জানিয়েই কী এক গুপ্ত অভিসারে রওনা হ'লেন। পরে গাজেতা পোল্‌স্কার দৌলতে জানা গেল, তিনি হিট্‌লারের সঙ্গে মোলাকাৎ করবার জন্যে তাঁর স্থায়ী আড্ডা বের্থ্‌তেস্‌গা-দেনে গিয়েছিলেন, এবং বেক্‌কে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্বয়ং ফ্যুরার্ সিঁড়ির তিন ধাপ নীচে নেমে এসেছিলেন। সেখানে কী আহার্য্য ও পেয়

দেওয়া হয়েছিল, তারও বোধ হয় একটা ছোটখাটো ফর্দ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আসলে দু'জনের মধ্যে যে কী আলোচনা হ'লো তা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারলে না।

ক্রমে বেক্-এর নিগূঢ় "তান্ত্রিকতা" দেশের লোকের অসহ্য হয়ে উঠলো। সহিষ্ণুতা হারালে প্রথমে ছাত্রেরা। ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে পথে পথে সুর করে' চেঁচাতে লাগলো—"নিকালো ফন্ বেক্কো"! আলেমানী রাষ্ট্রদূতের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে তারা মুক্তকণ্ঠে আপন আপন অভিমত প্রকাশ করতে লাগলো, চড়টা চাপড়টাও ইশারায় দেখাতে ভুললে না। বেক্-এর জার্মান-পীরিতি ক্ষাপ্পা হয়ে' উঠলো, তিনি ছাত্রছাত্রীদের ঠেঙাবার জন্যে পুলিস লাগালেন। জার্মান-বিরোধী কোনোপ্রকার উক্তি শাস্তি-বিধেয় হ'লো, এবং পথে-ঘাটে চললো পুলিস মার্ফৎ ছাত্রছাত্রী ঠেঙানি। অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের ওপর অত্যাচারের দৃশ্য বরদাস্ত করা দস্তরমত ক্লেশসাধ্য। তবুও দাঁড়িয়ে দেখি, ভোজপুরী-প্যাটার্নের হোঁৎকা পাহারাওয়ালা ছাত্রের দু'টো হাত পেছন দিকে মুচড়ে ধরে' নীরেট রবারের ডাণ্ডা দিয়ে চোর-ঠেঙানো করছে। এরকম দৃশ্যে অনেকের বোধগম্য হ'লো, ছাত্ররা নিশ্চয়ই কোনোপ্রকারে বেক্-এর মনের কথাটা জানতে পেরেছে, এবং সেইজন্যেই তিনি বেচারীদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছেন। চোরের ঠেঙানি খেয়েও ছাত্ররা থামলো না। আলেমানী রাষ্ট্রদূতের কুঠির জান্‌লার শার্শী বাঁচাবার জন্যে সে পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হ'লো, এবং সে রাস্তা দিয়ে লোকচলাচল প্রায় বন্ধ করে' দেওয়া হ'লো।

এর অল্পদিন পরেই রোম-বার্লিন ধুরা কাঁধে নিয়ে ভারশৌএ এলেন আমীর চ্যানো। তাঁর অভ্যর্থনার জন্যেও বড় বড় ভোজ দেওয়া হ'লো, ভূদ্‌কা ও লিক্যেরের বান ছুটলো। কিন্তু তাঁর আসার উদ্দেশ্যটা যে কী,

তা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না। এই সময়ে একটি হাস্যকর ঘটনার কথা মনে আছে। চ্যানোর আগমনবার্তায় পোল ছাত্ররা বেক্-এর বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ সুরু করলে। পোলভাষায় অজ্ঞ চ্যানোকে বেক্-সাহেব বুঝিয়ে দিলেন, ছাত্রদের চীৎকারটা মহামান্য-বর অথিতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাড়া আর কিছু নয়! শুনে হরষিত চ্যানো মুসোলিনীর কায়দায় বারন্দায় এসে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে ছাত্রছাত্রীদের কটু-উক্তি গলাধঃকরণ করলেন। এবং তাঁর সম্মানে ভাগ নেবার জন্যে ব্রীড়া-জড়িত, অধোমুখ বেক্‌কে টেনে এনে হাজির করলেন বারান্দায়। উভয় ব্যক্তির দর্শনে ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের লক্ষ্য করে', আকাশ ফাটিয়ে যেসব শিষ্ট বাক্য ব্যবহার করলে, তার বিবরণ দেওয়া জনসাধারণের নৈতিকতার বিরোধী হবে।

যাই হোক, বেক্-এর জার্মান-প্রীতিতে দেশ জুড়ে অশান্তি ঘনিয়ে এলো। পোলরা খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞেস করতে সুরু করলে, জার্মানদের সঙ্গে এরূপ মাথামাথি করবার আগে তাদের দিক থেকে দেশের নিরপত্তা সম্বন্ধে কোনো বোঝাপড়া হয়েছে কী? উত্তরে (যদিচ কথার উত্তর দেওয়া তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ) বেক্ সাহেব পোলদেশ ও জার্মানীদ্বারা স্বাক্ষরিত দশবছরব্যাপী স্যাঙাতির চুক্তির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। পোলরা একটু আশ্বস্ত হ'লো। কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তিরা ধাপ্পায় ভুললে না। ব্যবস্থা-পক সভায় ভরসা করে' দু'এক জন প্রকাশ্যভাবে প্রশ্ন তুললেন, পোলদের সম্বন্ধে জার্মানীর সঠিক মৎলবটা কী, তা জানবার কোনো ব্যবস্থা হয়েছে কি না। এঁদের অগ্রগণ্য ছিলেন জেনারেল ঝেলিগভ্‌স্কি, যাঁর মত যোদ্ধা ও রণকৌশলে পারদর্শী সেনাধ্যক্ষ পোলদেশে অল্পই ছিল। ইনিই রুশদের সঙ্গে লড়াই করে' ভীল্‌নো-প্রদেশ পোলদেশের সঙ্গে যুক্ত করেন। এর মত দেশপ্রাণ ও কার্য্যক্ষম সেনাধ্যক্ষের পক্ষে পিল্‌সুদ্‌স্কির তিরোভাবের পর

সেনানায়ক বা মারেশালের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে নিতান্ত শোভন হ'তো, একথা নিয়ে অনেকেই কানাঘুষো করতো। এ হেন জেনারেল ঝেলিগভ্স্কি যখন "সেইম্"-এ পোল-জর্মান সম্পর্কের কথাটা প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করলেন, তখন বেক্-এর দল তাঁকে শুধু বাপান্ত করতে বাকী রাখলে। তাঁকে খোলাখুলিভাবে তাক্ত্-বিহীন, স্বল্পবুদ্ধি, দেশদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যার অলঙ্কৃত করা হ'লো। পোলদেশ সম্বন্ধে জার্মানীর অভিসন্ধি বিষয়ক মতামত প্রকাশ করার জন্যে ভীল্নোর বিখ্যাত সাংবাদিক, "স্লোভো"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাংস্কোভিচ্ কারারুদ্ধ হ'লেন।

ইতিমধ্যে দেশের লোকের চোখ খুলতে সুরু করলে। তার মুখ্য কারণ জার্মানী-প্রবাসী পোলদের উপর জর্মান সরকারের বিরুদ্ধাচরণ। জার্মানী-প্রবাসী পোলদের সংখ্যা বিশেষ উপেক্ষণীয় ছিল না, কম-সে-কম পনেরো লাখ। তাদের বেশীর ভাগই বসবাস করতো পোলসীমান্তের কাছে শ্লঁস্ক্ বা সাইলেশিয়ায়। ভবিষ্যতে যাতে কোনো রেফেরেন্দুম্ দ্বারা প্রমাণিত না হ'তে পারে যে, শ্লঁস্ক্, ভাষায় ও জাতিতে পোলদেশের অন্তর্ভুক্ত, সেইজন্যে জার্মানরা কয়েক বছর ধরে' দলে দলে পোলদের পূর্বসীমান্ত থেকে উপড়ে টেনে তুলে পশ্চিম অঞ্চলে বসাতে সুরু করেছিল। এখন, বেক্-সাহেবের মার্ফৎ পোলদের চোখে ধূলো দিয়ে জার্মানরা পোলদের অযথা স্থানান্তরিত করবার কাজ পূরোদমে চালালে। শুধু স্থানান্তরিত নয়, সঙ্গে সঙ্গে চললো তাদের জার্মানীকরণ। পোলদের নিজেদের চালানো ইস্কুল বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো একটি একটি করে', পোলদের গির্জায় উপাসনা-অর্চনার ভাষা পোলভাষার পরিবর্তে জার্মান নির্দ্ধারিত হ'লো, এবং মধ্য-যুগের কায়দায় (যার জন্যে সমগ্র পূর্ব প্রুশিয়ার অধিবাসী পোলদের নাম বদ্‌লে জর্মান করা হয়েছিল) পোলদের পোলী নামকে জর্মান ঢঙে পরিবর্তিত করা হ'তে লাগলো। এক কথায় কোন দেশকে দখলে

আনবার আগে হিট্‌লারের কার্য্যকলাপে যে সব পূর্বলক্ষণ দেখা যায়, সাধারণতঃ সেইগুলি পোলদের সম্বন্ধে ক্রমেই স্পষ্টতঃ লক্ষিত হ'তে লাগলো। বেক্ যতই প্রাণপণে জার্মানদের প্রীতি-উৎপাদনে যত্নবান হ'তে লাগলেন, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় জার্মানী-প্রবাসী পোলদের ওপর অত্যাচারের কথা ততই অধিকতর প্রকাশ পেতে লাগলো।

তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই, মার্চ মাসের মাঝামাঝি, যে হিট্‌লার কিছুদিন আগে জোর গলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, চেক্‌রা তাঁর শেষ শিকার, এবং এর পরেই তিনি হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হবেন, সেই হিট্‌লারই দুর্বল লিতুয়ানিয়ার কাছ থেকে ক্লাইপেদা বা মেমেল দাবী করলেন, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তা দখল করলেন। সুতরাং পোলদের মধ্যে যাঁরা জার্মানীর মৎলব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছিলেন, তাঁদের সে সন্দেহ দৃঢ়তর হ'লো। জার্মানীর সঙ্গে একটা খোলাখুলি বোঝাপড়া করবার জন্যে দেশের লোক বেক্-এর ওপর চাপ দিতে সুরু করলে। দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হ'লো তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, পোলদেশের শাসকদলের মধ্যে বেশ একটা গোলমাল চলেছে। ঠিক এই সময়ে গুজব রটলো, নাকি সেনানায়ক শ্মীগ্‌লিয়্যি-রীদ্‌জ্ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চান, এবং বেক্-এর তাতে সম্পূর্ণ অমত। এইসূত্রে নাকি একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, এবং রীদ্‌জ্-শ্মীগ্‌লিয়্যি বেক্‌কে পেটীর পিস্তল খুলে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। গুজবটা নিছক গুজব হওয়া তাজ্জব নয়। তবে ব্যাপারটা বোঝা গেল এই যে, জার্মানীকে নিয়ে শাসকদলের ভেতর দস্তুরমত মনকষা-কষি সুরু হয়েছে। গুজবটা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক্, তা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা শাস্তি-বিধেয় বলে' ধার্য্য হ'লো।

এমনি ক'রে কাটলো কিছুদিন। ইতিমধ্যে জার্মানী ও দান্‌ৎসিকে পোলদের উপর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চললো। দান্‌ৎসিক্

প্রত্যাগত একটি পোল বন্ধুর কাছে শুনলাম, সেখানে নাকি জার্মানরা পোলদের নজরবন্দী ক'রে রেখেছে, এবং যুদ্ধ করবার জন্যে তারা একেবারে প্রস্তুত। বেক্ কথাটা চাপা দিতে হাজার চেষ্টা করলেও, এমনি করে' মুখে মুখে লোকে জানতে পারলে, পোলদের সম্বন্ধে জার্মানীর মৎলব সুবিধার নয়।

বেক্ সাহেবের উপর যখন চারিদিক থেকে চাপ পড়লো, তখন তিনি নিরুপায় হয়ে' একরকম চুপি চুপি ইঙ্গস্থানের সঙ্গে মৈত্রী ও পরস্পর সহায়তার চুক্তি সই করে' এলেন! এবার জানা গেল কী কথাটা তিনি এতদিন ধরে' লুকোবার চেষ্টা করছিলেন। কারণ ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রীর চুক্তিতে হিট্‌লার মেজাজ হারালেন, এবং পোল-জর্মান মৈত্রীর সর্তটাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' ফেললেন। অবশ্য ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্বের সর্তে যে পোল-জর্মান সর্ত নাকচ হবে, এরকম কোনো কথা কোথাও লেখা ছিল না। তবুও হিট্‌লার বললেন, পোল-ইংরেজ সর্ত হ'চ্ছে প্রত্যক্ষরূপে জার্মানীর বিপক্ষবাদী, এবং ওটা বেচারী জার্মানীকে ঘেরাও করবার ইংরেজদের একটা চাল মাত্র। চক্ষুর্লজ্জার তোয়াক্কা না রেখেই তিনি পোলদের কাছ থেকে দান্‌ৎসিক্ আর তথাকথিত "বারান্দা"টিকে দাবী করলেন। পোল-জর্মান বন্ধুতাকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে ফন্ রিব্বেন্‌ত্রপ্ যে কী কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, তা বেক্‌সাহেবের কাছ থেকে আজও শোনা গেল না। শেষকালে পোলদের লক্ষ্য করে হিট্‌লার যখন মুখ ছোটালেন, তখন জানা গেল, তিনি রিব্বেন্‌ত্রপ্ মার্ফৎ বলে' পাঠিয়েছিলেন দু'টি কথা—দান্‌ৎসিকের প্রত্যর্পণ ও "করিডর" বা বারান্দার ভেতর দিয়ে জার্মানী থেকে দান্‌ৎসিক্ পর্য্যন্ত হিট্‌লারের রথযাত্রার উপযোগী একটি সুপরিসর পথ তৈরী করতে অনুমতি দেওয়া। বেক্ এতদিন লজ্জায় যে-কথা দেশের লোকের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন, হিট্‌লার



গ্‌দান্‌স্ক্‌-এর প্রাচীন সমবায়-ভবন। নগরের পোলীয় স্থাপত্যের পরিচায়ক, একাধিক পোলীয় সৌধের অন্যতম।

তা ফাঁস করে' দিলেন। এখন আর পথ নির্মাণে অনুমতিতে শানালো না, বাল্‌তিক সাগরের উপকূলস্থ পোলদেশভুক্ত সব জমিটুকুও হিট্‌লার দাবী করলেন। তা ছাড়া পোলদের বিরুদ্ধে জার্মানদের ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে এক নতুন ছল, যা তিনি অন্যান্য বিজীত দেশসম্বন্ধে প্রয়োগ করেছিলেন, পেলেন একেবারে হাতের কাছে। অর্থাৎ পোল সরকার কর্তৃক পোলদেশ-প্রবাসী জার্মানদের ওপর নৃশংস অত্যাচার!

সার কথা, পোলদের ওপর হিট্‌লারের আক্রোশের কারণ, শোনা গেল, চারটি।

দান্‌ৎসিক্‌।

বাল্‌তিক্‌ সাগরের উপকূলস্থ ভূখণ্ড, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় পমেরানিয়া।

পোলদেশ-প্রবাসী জার্মানদের উপর অত্যাচার।

জার্মানীকে ঘেরাও করার চালে ইংরেজদের সঙ্গে পোলদের যোগদান।

এই চারটি প্রশ্নেরই একটু বিশদ আলোচনা এইখানে করতে চাই।

প্রথম কথা, দান্‌ৎসিক্‌ ।

জগৎসুদ্ধ লোক যাকে বলে দান্‌ৎসিক্‌, ইংরেজী কায়দায় যাকে আমরা বলি ড্যান্‌জিক্‌, তার আসল নাম যে গ্‌দান্‌স্ক্‌, তা শুনলে হয়তো অনেকেই আশ্চর্য্য হবেন। দানৎসিক্‌ (Danzig), গ্‌দান্‌স্ক্‌ (Gdansk)-এর জার্মানীকৃত রূপ। সহরটা পোলদের না জার্মানদের, এ প্রশ্নের সমাধান করা এযুগে একরকম অসম্ভব বলা যেতে পারে। কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে গ্‌দান্‌স্ক্‌ সহরের কোনো বিশেষ রূপ বা আকৃতি গড়ে' ওঠবার সুযোগ ঘটে নি, যাতে তার প্রতি খাঁটি পোল বা জর্মান বলে' অঙ্গুলি-নির্দেশ করা চলতে পারে, যদিচ একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে অধুনা দান্‌ৎসিক্‌ সহরের জার্মান অধিবাসীরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। গ্‌দান্‌স্ক্‌-এর স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে কোনো সম্যক্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে গেলে দুটি জিনিষ স্মরণ রাখতে হবে—গ্‌দান্‌স্ক্‌-এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং উক্ত নগর সম্পর্কে ইতিহাসের অভিমত।

গ্‌দান্‌স্ক্‌ সহর পোলদেশের পুণ্যসলিলা ভীস্‌লার মোহনায় অবস্থিত। ভীস্‌লাকে পোলদেশের "গঙ্গা" বললে অত্যুক্তি হয় না। পোলদেশের কার্পাতী পাহাড়ে তার উৎপত্তি, এবং সমগ্র দেশকে শস্য ও

উদ্ভিদে, দেবতার আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করে' যেখানে এসে সে সাগরের বুকে মাথা রাখলে, সে পুণ্যভূমি পুরুষানুক্রমে পোলদের। উৎপত্তি থেকে সঙ্গম পর্য্যন্ত সে একদিনের তরেও পথভ্রষ্টা হয়ে পোল-ভূমির বাইরে পা দেয় নি। সুতরাং সতী ভীস্‌লা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' সমগ্র পোল-জাতির ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করে' এসেছে। পোল চাষাদের ভেতর ভীস্‌লাকে পবিত্র জ্ঞান করে, এমন লোকের সংখ্যা আজও অল্প নয়। এবং আজও চাষার মেয়েরা প্রতি বৎসর ২৩শে জুন * ছোট ছোট ভেলায় বাতী জ্বালিয়ে ভীস্‌লার জলে ভাসিয়ে দিয়ে ভীস্‌লা-পূজা করে' থাকে। সেই ভীস্‌লার মোহনায়, পোলীয় সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত গ্‌দান্‌স্ক্‌ সহরের শাসনকার্য্যে যে সামান্য অধিকার পোলরা পেয়েছিল, তা সহজে ছাড়া যে কোনো আত্মসম্মান-বোধী পোলের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, একথা বাক্যাড়ম্বরে সপ্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন।

গ্‌দান্‌স্ক্‌ সম্বন্ধে ইতিহাস বলে এই কথা : দশম শতাব্দীতে এই নগর স্থাপনা করে পোল-পরিবারভুক্ত বাল্‌তিক্‌সাগরের উপকূলস্থ স্লাভ রাজারা। স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ১৩০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্‌দান্‌স্ক্‌ ছিল পোলদের অধিকারে। তার পর পূর্ব প্রুশিয়ার জার্মানরা যখন অল্প অল্প করে' পোলদের জমীজমা দখল করতে আরম্ভ করে, তখন তারা গ্‌দান্‌স্ক্‌ সহর অধিকার করে' তার নাম বদ্‌লে রাখে দান্‌ৎসিক্‌। পূরবী প্রুশী জার্মানরা গ্‌দান্‌স্ক্‌-এ রাজত্ব করে ১৪৬৬ সাল পর্য্যন্ত। তারপর আবার গ্‌দান্‌স্ক্‌ পোলদের হাতে এলো, এবং সেখানে পোল রাজত্ব চললো ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিনশ বছর। এই সময়ে পোলরা তাদের রাষ্ট্রিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে হারালে। গ্‌দানস্ক্‌ পুনরায় দান্‌ৎসিক হয়ে' রইল জর্মানদের কব্জায় গত মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত। প্রুশ রাজত্বকালেও সাত বছর,

* পোলভাষায় এই উৎসবের নাম "সবুৎকা"।

অর্থাৎ ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্‌দানস্ক ফ্রাঁসের তত্ত্বাবধানে "স্বাধীন নগর" বলে পরিগণিত হয়। গত মহাযুদ্ধের পর গ্‌দান্স্ক, জাতিসঙ্ঘ দ্বারা পুনরায় "স্বাধীন নগর" রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লো এবং তার শাসনকার্য্য জার্মান ও পোলদের ওপর যৌথভাবে ন্যস্ত হ'লো। শাসনকার্য্যে পোলদের যৌথ অধিকার ছিল মুখ্যত পররাষ্ট্র ও শুল্ক বিষয়ে।

আইনতঃ এ অধিকার পোলদের হ'লেও হিট্‌লারী আমল, অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল থেকে গ্‌দানস্ক্-এ পোলরা অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে' আসছিল। পোলরা সংখ্যায় শতকরা ২০ জন হওয়া সত্বেও, এবং পোলীয় বাণিজ্যের প্রসাদেই আধুনিক গ্‌দানস্ক্-এর বাড়বাড়ন্ত হওয়া সত্বেও, জার্মানদের সঙ্গে লাঠালাঠি এড়াবার জন্যে তারা শত অত্যাচার মুখ বুজে বরদাস্ত করে আসছিল। শুধু তাই নয়। গ্‌দানস্ক্-এর পোলীয়তা যা আজও তার স্থাপত্যে বিশদরূপে উৎকীর্ণ, যথা প্রাচীন নগর-সমবায়-ভবনে, বিশিষ্ট গির্জায় ইত্যাদি, জার্মানরা শাবল-কোদাল দিয়ে পোলীয়তার এই শেষচিহ্নগুলি একেবারে নির্মূল করে' ফেলতে সুরু করলে। পোলরা তখনও চুপ করে' রইল! কিন্তু এতেও ক্ষান্ত না হয়ে হিট্‌লার গ্‌দানস্ক্ সহরের শাসনকার্য্যে পোলদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে' তাকে জার্মানীর অঙ্গীভূত করবার দাবী করলেন।

দ্বিতীয় কথা, পমেরানিয়া।

গত মহাযুদ্ধের পর খবরের-কাগজ-পড়া লোকের কাছে "করিডর" বলে' এক ভূখণ্ডের নাম পরিচিত হ'লো। প্রাচ্য ইউরোপে সাড়ে তিন কোটি মানুষের নিঃশ্বাস ফেলবার জন্যে, জাতিসঙ্ঘ বাল্‌তিক্ উপসাগরের কোলে একটুকরো জমী পোলদেশকে কতকটা অনুগ্রহ করেই দান করে। জার্মানীর এতে ঘোর আপত্তি ছিল এইজন্যে যে, উক্ত "বারান্দা বা "দর-দালানের" অস্তিত্ব জার্মানীকে পূর্ব প্রুশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দেয়।

জার্মানী প্রোপাগান্দার জোরে জগতের লোকের এই ধারণা জন্মালো যে, কাজটায় পোলদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু সুবিধা করে' দেওয়া হ'লো বটে, কিন্তু তাতে বেচারা জার্মানীর ওপর সমূহ অবিচার করা হ'লো। বিশেষরূপে, ইউরোপের মানচিত্রে জার্মানী ও প্রাচ্য প্রুশিয়ার মাঝখানে বাল্‌তিকসাগরে নিমজ্জিত পোলদেশের এই তৃষিত জিভখানিকে দেখে সাধারণ লোকের মনে এরকম ধারণা বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ্ ও ভাষাবিদদের কাছে কথাটার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার।

পোলদেশের উত্তরে, বাল্‌তিক্ সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল, যার লাতিন নাম পমেরানিয়া, তা যে সম্পূর্ণরূপে পোলদের দেওয়া না হওয়ায় জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক তাদের ওপর নিতান্ত অবিচার করা হয়েছিল, একথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন পোলদেশের মানচিত্রেই স্পষ্ট দেখতে পাই, আধুনিক "বারান্দার" আরো পশ্চিম থেকে সুরু করে' গ্‌দান্স্ক ছাড়িয়ে অনেকদূর, এবং প্রাচ্য প্রুশিয়ার বেশ অনেক-খানি পোলদেশের পরিধিভুক্ত ছিল। সমগ্র প্রাচ্য প্রুশিয়া যে জাতিতে পোল-স্লাভ, সে কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, এবং প্রাচ্য প্রুশিয়ায় আজও যে লাখে লাখে খাঁটি পোল (ভাষায় ও জাতিতে), যাদের জার্মানরা "মাজু-রেন" বলে, আপন সত্তা বজায় রেখেও জগতের কাছে জার্মানরূপে পরিচিত হ'চ্ছে, সেকথা না হয় ধর্তব্যের মধ্যেই না হ'লো, কিন্তু তথাকথিত "বারান্দার" আশপাশের মানুষ যে পোল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। জার্মানরা অবশ্য জোর করে' এদের বলে "কাশুবেন্"। কিন্তু তারা "কাশুব্" হ'লেও তারা যে স্লাভ হিসেবে পোলদের জাতভাই, সে কথা তুললে জার্মানরা চুপ করে' থাকে। পোলদেশ থেকে "কাশুব্"দের পৃথক্ করাও যা, আর বাংলা থেকে চট্টগ্রামবাসীদের বিচ্ছিন্ন করাও তাই।

যাই হোক, ফল কথা এই যে, পমেরানিয়া (পোলভাষায় "পমঝে") পোল-অধ্যুষিত এবং যুগ যুগ ধরে' তা পোলদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার সাক্ষী ইতিহাস। তা ছাড়া জলপথে প্রাচ্য প্রুশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে জার্মানীর যদি একটু আধটু অসুবিধা হয়েই থাকে, ত অন্যের ঘাড়ে চড়াও হয়ে সুবিধা করে' নেওয়াটাকে ঠিক ভদ্রতা বলা চলে না।

এছাড়া পমেরানিয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল পোলদের তৈরী নূতন বন্দর গ্‌ড্ডীনিয়া, যা গোলে হরিবোলে হাতিয়ে নেবার লোভ হিট্‌লার সাহেব ছাড়তে পারলেন না। পোলরা যখন স্বাধীনতা পেলে তখন গ্‌ড্ডীনিয়া ছিল একটি মৎস্যজীবীদের গণ্ডগ্রাম, লোকসংখ্যা হাজার তিনেকের বেশী নয়। দশ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৩১ সালে, গ্‌ড্ডীনিয়া গ্‌দান্‌স্ক্‌কে ছাড়িয়ে উঠলো, হয়ে দাঁড়ালো বাল্‌তিক্‌ সাগরের বৃহত্তম বন্দর। লোক-সংখ্যা হ'লো কম-সে-কম এক লাখ। পোলদের সমুদ্রপারের বাণিজ্যের পথ ক্রমে গ্‌দান্‌স্ক্‌ ছেড়ে গ্‌ড্ডীনিয়ার দিকে সরে' আসতে লাগলো। জার্মানরা যা চাইছিল, গ্‌দান্‌স্ক্‌কে হাতে এনে পোলীয় বাণিজ্যের পথ তারা আপন কব্জার ভেতর আনবে, তা গ্‌ড্ডীনিয়ার প্রসাদে অসম্ভব হয়ে উঠলো। কাজেই হিট্‌লার হেঁকে বসলেন, তাঁর চাই পমেরানিয়া।

তৃতীয় কথা, পোলদেশবাসী জার্মানদের নির্য্যাতন।

হিট্‌লারের মুখে একথা নূতন নয়। তিনি শাসনকার্য্যের ভার নেওয়া অবধি ঐ একই কাঁদুনি গেয়ে আসছেন; আজ ফরাসী সীমান্তের জার্মানরা, কাল সুদেতীরা, পরশু মেমেলের জার্মানরা, তার পরের দিন পোলদেশ-বাসী জার্মানরা। জগতের যেখানে যেখানে একটিও জার্মান আছে, সে মুলুকটাকে জার্মানী উপনিবেশ বলা এবং বেচারী প্রবাসী জার্মানের নাক কান কেটে নিচ্ছে, এই অপবাদ রটানো, স্বদেশবাসী জার্মানদের মন ভোলাবার একটি পাকা চাল, তা হিট্‌লার মহোদয়ের ভবিষ্যৎ জীবনী-

লেখকদের জানা থাকা উচিৎ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কয়েকমাস আগে চেক্‌দের সম্বন্ধে যেসব অপবাদ শোনা যাচ্ছিল, পোলদের সম্বন্ধেও হুবহু সেইসব অপবাদ শোনা গেল। সেই একই গরু-জরু কেড়ে নেওয়ার কথা, আর পাকাধানে মই দেবার কথা। পোলদের সম্বন্ধে অবশ্য আরো গোটা কয়েক ঊন-স্বাভাবিক নৃশংসতার কথা জুড়ে দেওয়া হ'লো, যথা জনৈক জার্মানের অঙ্গচ্ছেদ এবং আরো কী কী সব।

হাস্যকর অভিযোগ। পোলদেশ-বাসী কোনো উপজাতির পীড়ন আমি ত কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নি। উপরন্তু, সমস্ত উপজাতি যাতে আপন আপন বিশিষ্টতা বজায় রাখতে পারে, বরাবরই পোলরা সে বিষয়ে প্রচুর অর্থ এবং উদ্যম ব্যয় করে এসেছে! এমন কি স্বজাতীয়, স্লাভ-গোষ্ঠী-ভুক্ত উক্রাইনীদের পোল করে' ফেলা যে অত সহজ কাজ, তা করবার পরিবর্তে (যা করলে পোলদেশের একটা গুরুতর আভ্যন্তরীণ প্রশ্নের সমাধান হ'তে পারতো), তারা তাদের জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ-কার্য্যে ভূরিভূরি অর্থ ব্যয় করেছে। এ আমার চোখে দেখা জিনিষ। জার্মানদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। বরং বেক্ সাহেবের প্রসাদে জার্মানী নাৎসীরা জো পেয়ে দু'এক জায়গায় পোলদের ঠেঙিয়েছে, বা মদের ভাঁটিতে হিট্‌লারের ভজন গেয়েছে, এরকম খবর শোনা গেছে। এমন কি সর্বত্র নিপীড়িত ইহুদীদের পর্য্যন্ত পোলরা তুমি ছেড়ে তুই বলতে পারে নি। অতিথি-সৎকার যাদের ঐতিহ্য, জাতি ও স্বভাবগত রীতি, তারা যে কোনো উপজাতিকে নির্য্যাতন করেছে, একথা বিশ্বাস করা দুরূহ।

অপর পক্ষে, জার্মানী-প্রবাসী পোলদের ওপর অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী সংবাদপত্রাদিতে নিত্য চোখে পড়ে। একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করি। গ্‌দান্‌স্ক্‌ সহরের একজন শুল্ক-কর্মচারীকে হত্যা করে' জার্মানরা তার মৃতদেহের যে ভীষণ অবমাননা করেছিল, তার সম্যক্

বিবরণ দেবার পথে বাধা দেয় ভদ্রসমাজের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যবোধ। সুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, মৃতের উদর চিরে তার ভেতর হাসপাতাল থেকে আনা অন্য স্ত্রী-দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ পূরে, তা আবার সেলাই করে' পোল সীমান্তে ফেলে রেখে যায়। পোলদের উপর এজাতীয় অত্যাচার যুদ্ধের কয়েকমাস আগেই খুব বিরল ছিল না।

পোলদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গ্যেব্বেল্স্ ডাক্তারের অনুচররা যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গির্জায় নিয়ে গিয়ে তাদের কচি গলায় পোলদের ধ্বংস করবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করাচ্ছিল, তখন পোল পক্ষ থেকে তার জবাব এলো কবি শ্রীমতী ইল্লাক্যোভিচূভ্নার একটি কবিতায়—"জার্মানদের উপর তোমার করুণাধারা বর্ষিত হোক্, হে দেবতা!"

চতুর্থ কথা, জার্মানদের ঘেরাও করা।

আপন বাহুবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিবেশী দেশকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করা জার্মানীরই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ অপবাদ ইংরেজ বা পোলদের ঘাড়ে চাপানোর তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, হিট্‌লার সাহেব আগে থেকেই আটঘাট বেঁধে রাখলেন, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে পরে অনুরূপ অভিযোগ না টিকতে পারে। তাছাড়া চেম্বারলেনী ইঙ্গস্থান তখন হিট্‌লারী জার্মানীর সঙ্গে একটা চলনসই বোঝাপড়া করবার জন্যে দস্তুরমত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জার্মানীতে ব্রিতানীয় রাষ্ট্রদূত স্যর নেভিল্ হেণ্ডারসন্-এর সত্যিকার "মিশন"টি যে কী ছিল, তা তাঁর পুঁথি পড়েও বোঝা শক্ত, তবে তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের "মিশন" যে হিট্‌লারের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসা, এ রকম সন্দেহ করা বোধ করি খুব অসমীচীন হবে না। সে যাই হোক্, ইংরেজ আর পোলদের পক্ষে জার্মানীকে ঘেরাও করবার পথে প্রধান বাধা এই দুই রাষ্ট্রের দূরত্ব, যাকে অতিক্রম করা এমন কি পোলদেশের ঘোর

বিপদের সময়েও ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আর দ্বিতীয়তঃ, যদিই বা তারা জোট বেঁধে জার্মানীর বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্যত হয়ে থাকতো, ত অন্ততঃ পোলরা যে কেন হঠাৎ জার্মানীর আলিঙ্গনপাশ কাটিয়ে ইংরেজদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তার যুক্তিযুক্ত উত্তর পাওয়া যায় না। কূটনীতির স্বয়ম্বরসভায়, জার্মানী রাষ্ট্রদূত হ্যার্ মল্‌ৎকে, আর ইংরেজী রাষ্ট্রদূত স্যর হাউয়ার্ড্ কেনার্ড্, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে লাগলেন, এবং অবশেষে স্যর হাউয়ার্ড্-এর গলায় মালা পড়লো, এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই এমন কোন নিগূঢ় কারণ ছিল যার জন্যে এমন কি জার্মান-প্রেমী বেক্ পর্য্যন্ত হিট্‌লারের প্রতি হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ফন্ রিব্বেন্‌ত্রপের "মিশন" আশানুরূপ কৃতকার্য্য না হওয়ায়, হিট্‌লার বেক্‌কে স্পষ্টতঃ বুঝিয়ে দিলেন যে, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে তিনি বাঁকা আঙুল ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন।

বেক্ সাহেব যখন বিস্ফারিত নেত্রে আবিষ্কার করলেন, যে, কূটনীতির ছকে আড়াইপা'র চাল দেবার মত একটি ঘুঁটিও তাঁর হাতে নেই, তখন শুধু বড়ে'র চাল দিয়ে খেলা বাঁচাতে হ'লে যেটুকু কৌশল ও ধৈর্য্যের দরকার ছিল তা তাঁর ঘটে ছিল না বলেই মনে হয়। ছিল না এইজন্যে বলছি যে, থাকলে তিনি দেশের লোককে যুদ্ধে প্রস্তুত না করেই প্রকাশ্যভাবে ইংরেজদের সঙ্গে অতিমাত্রায় মাখামাখি করে' পোলদেশের উপর জার্মানীর আক্রমণটাকে অন্ততঃ বছরখানেক এগিয়ে আনতেন না।

তা ছাড়া ইংরেজ-পোলে যে সখ্য ও পারস্পর সহায়তার সর্ত হ'লো, তা সম্যক্ উপলব্ধি করতে দু'পক্ষেরই বেশ একটু দেরী লাগলো। কারণ এ মিলন প্রেম-ঘটিত নয়, শুভদৃষ্টির আগে পর্য্যন্ত এক অপরকে চিনলে না, জানলে না। এবং এমন কি এই দুই জাতের মধ্যে খুব বেশী সদ্ভাব ছিল বলে'ও মনে হয় না। ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই পোলদেশের অস্তিত্বের কথাও জানতো না, যারা জানতো তারা পোলদের প্রাচ্য ইউরোপী বলে' অবজ্ঞার চোখেই দেখতো। পোলরাও মহাযুদ্ধের পর তাদের দু'একটা মারাত্মক অসুবিধার জন্যে, যথা শ্রীযুক্ত লয়েড্ জর্জ্ কর্তৃক জার্মানীকে সাইলেশিয়ার কিয়দংশ দানের প্রস্তাব ইত্যাদির জন্যে ইংরেজদের

একেবারে ফ্রেণ্ড্ নং ওয়ান্ জ্ঞান করতো না। এমন কি পোলভাষায়, "ইংরেজ কেন পোলদের শত্রু" শীর্ষক কেতাবও ছাপা হয়েছিল। সুতরাং এই অভিনব চুক্তিতে ভারশৌএর ইংরেজ রাষ্ট্রদূত স্যর হাউয়ার্ড্ কেনার্ড্ হয়তো মনে ভাবলেন, এইবার জার্মানীকে ডজন খানেক গোল খাওয়ান হ'লো, কিন্তু আসলে সাধারণ পোলের মনের ভাবটা হ'লো এই যে, জার্মানীকে টীট্ করতে হ'লে ইংরেজের সাহায্য অপরিহার্য্য।

এই সর্তের আর একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণ ছিল। ইংরেজরা পোলদের আশা দিক্ আর নাই দিক্, পোলরা এই আশায় বুক বেঁধে রইলো যে যুদ্ধে প্রস্তুত হবার জন্যে ইংরেজদের কাছ থেকে একটা মোটা টাকার কর্জ পাওয়া যাবে। সংখ্যাটা যতদূর মনে পড়ে ২০০০০০০০ জ্লতী বা ১০০০০০০০ টাকা। সংখ্যার হার দেখে অনেকেরই মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, ভাবলে, কিছু না হোক্ ঐ টাকায় হাতিয়ার কেনা যাবে। এ আশা করা পোলদের খুব অন্যায় হয় নি, কারণ বন্ধুতার সর্ত না করেই যদি রোমানিয়া এবং তুর্কদেশ অনুরূপ কর্জ পেয়ে থাকে, ত পোলরাই বা পাবে না কেন? এই রকম যুক্তি প্রায়ই শুনতে পাই।

কিন্তু অতগুলো টাকা না জেনে শুনে জলে দেওয়া ইংরেজী বাণিজ্যের ইতিহাসে লেখে না। কাজেই টাকা ধার দেবার আগে দেনদারের টাকা শোধ দেবার সামর্থ্য কী রকম, তা সঠিক জানবার জন্যে পোলদেশে পাঠানো হ'লো জেনারেল আয়রন্সাইড্‌কে। উক্ত জেনারেল অবশ্য এলেন এই অজুহাতে যে, যদি জার্মানদের সঙ্গে লড়তেই হয় ত পোলদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে তিনি একটা মোটামুটি ধারণা পেতে চান। এইসূত্রে তিনি পোলদের যাবতীয় বিখ্যাত সামরিক কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন, এবং যথারীতি সম্বর্দ্ধিত হয়ে দেশে ফিরলেন। এর অব্যবহিত পরেই ইংরেজ ব্যবস্থা পরিষদ মহা আড়ম্বরে পোল সরকারকে ৮০০০০০০ জ্লতী বা

৪০০০০০০ টাকা (সংখ্যাটা যতদূর স্মরণ হয় নির্ভুল) কর্জ দেওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। সাম্রাজ্যহীন, দরিদ্র পোলদেশের পক্ষে এই সামান্য অর্থে যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, এই মর্মে কেউ কেউ ভারশৌএর কাগজে রচনা লিখলেন। সংখ্যার আশাতীত ন্যূনতার কারণ, গুপ্তভাবে শোনা গেল এই যে, পোলদেশ পর্য্যটন করে' জেনারেল আয়রন্সাইড্ নাকি পোলদের সামরিক অবস্থা সম্বন্ধে খুব প্রশংসাপূর্ণ বিবৃতি দেন নি। ফলে টাকাগুলো মারা যাবার ভয়ে কর্জের হার কমিয়ে দেওয়া হ'লো। এসব গুজবের কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা জানি না, তবে ভারশৌএর পথে-ঘাটে এমন কথা প্রায়ই শুনতে পাই। এই কর্জ যে মুষ্টিভিক্ষারই সামিল, এমন ধারণা অনেকেরই জন্মালো। জার্মানরাও ছেড়ে কথা কইলে না। "ফ্যেল্কিশের্ বেওবাখ্তের্"এ কে এক সাংবাদিক চোখ ঠেরে ইঙ্গিত করলেন, কার্য্যকালে সমুৎপন্নে, ইংরেজদের কাছে পোলরা সাহায্যও পাবে ঐ ধরণের!

ইতিমধ্যে গ্দান্স্ক্-এর পরিস্থিতি ক্রমেই রীতিমত সঙ্গীন হয়ে উঠলো। এখানেও শ্রীমান্ হেনলাইনের মত হিট্লার মহোদয়ের আর এক চেলার আবির্ভাব হ'লো, গাউলাইতার অর্থাৎ নবাব ফর্ষ্টার্। হিট্লারী আমলে গত কয়েক বছর ধরে' ইনি গ্দান্স্ক্-এর নবাবী করে' আসছিলেন। প্রথম প্রথম এঁর বুলি শুনে অনেকেরই ধারণা জন্মেছিল, ইনি পোল-বন্ধু। এখন হিট্লারের মন্ত্র পেয়ে ইনি হেন্লাইন্কেও ছাড়িয়ে উঠলেন। এঁর বাহ্য আকৃতি যেমন চোয়াড়ে ছিল, এঁর প্রকৃতিতেও তেমনি দয়ামায়ার লেশমাত্র ছিল না। সুতরাং এঁর হুকুমৎ-এ পোলদের উপর যে সব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হ'লো তার বিবরণ দেওয়া এখানে ভদ্রোচিত হবে না। ফর্ষ্টার্ একদিকে চালালেন পোলদের নির্য্যাতন, এবং অপর দিকে জার্মানীর সঙ্গে গদান্স্ক্কে যুক্ত করবার জন্যে

চীৎকারে আকাশ ফাটাতে লাগলেন। গ্দান্স্ক্-এর এই কণ্ঠস্বরের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে' হিট্লার জগৎকে জানালেন, তিনি করবেন কী? দান্ৎসিক্ নিজেই তাঁর তাঁবের আসতে চায়!

ক্রমে বেক্-এর কাছে ফন্ রিব্বেনত্রপ্ মার্ফৎ হিট্লারের প্রস্তাবের কথা যখন বেশ একটু জানাজানি হয়ে গেল, এবং তাঁর মুখে সমানে পূর্বোক্ত চারটি কথার পুনরাবৃত্তি শুনে শুনে পোলরা অস্থির হয়ে উঠলো, তখন তারা শাসকমণ্ডলীর ওপর চাপ দিতে সুরু করলে এই বলে' যে, পোল-পক্ষ থেকে একটা উত্তর দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অবশেষে '৩৯ সালের এপ্রিলের শেষেই হোক্ আর মে'র গোড়াতেই হোক্, পোলদেশের সেনানায়ক রীদ্জ্-স্মীগ্লি পোল-জর্মান মনোমালিন্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। বেশী কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়। যা দু'চারটে কথা বললেন তার তাৎপর্য্য এই যে, যদি হিট্লার মনে করেন, তিনি তাঁর স্বদেশকে ভালবাসবার অধিকারী, তা হ'লে তাঁর একথাটাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, অন্যান্য দেশে অন্য লোকের তাদের স্ব স্ব দেশকে ভালবাসবার অন্ততঃ ঠিক সেই অনুপাতে অধিকার আছে। কথাটা বাঙলায় যেমন সোজা শোনালো না, তাঁর মুখনিঃসৃত পোলভাষাতেও তেমনি তা তার চেয়েও জটিল শোনালো। যাই হোক, টীকাকাররা তার অর্থ করলেন এই যে, এবার হিট্লারের বুকের পাটা কত দেখা যাক! ঢিলটি মারলে পাট্কেলটি খেতে হয়!—সেনানায়ক একথা হিট্লারকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন। এইখানে একটা অবান্তর প্রসঙ্গ তোলা যাক।

স্মীগ্লি-রীদ্জের অভিপ্রায় যাই হোক তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাঁর সেনানায়কত্বের পথে প্রধান বাধা ছিল। একথা তিনি নিজেও জানতেন না। যৌবনে তিনি আর্ট্স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরে গত মহাযুদ্ধের

সময় পিল্‌সুদ্‌স্কির বিদ্রোহ-সঙ্ঘে যোগদান করে' তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। যুদ্ধের সময় নক্সা পড়া ও নক্সা আঁকা এবং রণকৌশলে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায়, এবং তাঁর মিষ্ট স্বভাবের গুণে স্নেহশীল পিল্‌সুদ্‌স্কির ধারণা হয় যে, শ্মীগ্‌লি্য-রীদ্‌জের মত যোদ্ধা সচরাচর দেখা যায় না। বস্তুতঃ ১৯২০ সালে পোল-বল্‌শেভিক যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি হাতাহাতিতেও কম কৃতিত্ব দেখান নি। বিশেষতঃ তাঁর গুণাবলীর মধ্যে ক্ষিপ্রতা সর্বাগ্রে লক্ষণীয় ছিল, যার দৌলতে তাঁর ছদ্মনাম "শ্মীগ্‌লি্য" অর্থাৎ "তৎপর" বা "ক্ষিপ্র", তাঁর সম্বন্ধে সর্বতোরূপে প্রযোজ্য, একথা সবাই বিশ্বাস করতো।

যে ধরণের বুদ্ধিবৃত্তি ও দক্ষতা তাঁর ছিল, তাতে তাঁর পক্ষে বড় জেনারেল হওয়া ন্যায়সঙ্গত হ'তো, সন্দেহ নেই। কিন্তু পিল্‌সুদ্‌স্কি মৃত্যুর ঠিক আগেই তাঁর নেটিপেটি প্রিয়পাত্রটিকে একেবারে তাঁর নিজের গদিতে বসাবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন, একথা তথাকথিত "পিল্‌সুদ্‌চি্যক্‌রা" ব্যতীত আর কারো কর্ণগোচর হয় নি। শ্মীগ্‌লি্য-রীদ্‌জের মনোনয়নে সন্দেহ হবার কারণও ছিল। তাঁর চেয়ে ঢের বেশী সুদক্ষ এবং কড়াপাকের জেনারেলরা তখন বর্তমান ছিলেন এবং এখনও তাঁরা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধক্ষম। উদাহরণ হিসেবে নাম করা যেতে পারে—জেনারেল লুৎসিয়ান ঝেলিগভ্‌স্কি এবং জেনারেল কাঝিমিয়েঝ্ সস্ন্‌কভ্‌স্কি (ইনি ইঙ্গস্থানে সম্প্রতি আহত হয়েছেন)। দেশের লোকে যখন এই দু'জনের মধ্যে একজনকে সেনা-নায়কের পদে উন্নীত দেখবার আশা করছিল, সেই সময় ব্রীড়া-জড়িত অল্পবয়স্ক জেনারেল শ্মীগ্‌লি্য-রীদ্‌জ্‌ সেনানায়কের আশাদণ্ড বাগিয়ে ধরলেন। এই ব্যক্তি জাতীয় উৎসব উপলক্ষে যখন তাঁর সেনানীর বাৎসরিক সেলাম গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর হাতের আশাদণ্ডটিকে দূর থেকে লেডীজ্‌ আম্ব্রেলার মত দেখাতো। শুধু আমি নয়, অনেকেই তা

লক্ষ্য করেছে। সুতরাং এই শিষ্টাচারী, মিষ্টস্বভাব সেনানায়কের মুখ থেকে দেশপ্রেমের আদর্শবাদ ছাড়া আর কী আশা করা যেতে পারতো? হিট্‌লারের গালিগালাজের তোড়ে তাঁর মধুর মত মিষ্টি এবং মাখনের মত মোলায়েম কথাক'টি যে কোথায় ভেসে গেল, তার পাত্তাই পাওয়া গেল না।

এইবার এলো বেক্ সাহেবের পালা। এতদিন পরে একরকম স্বেচ্ছার বিরুদ্ধেই বেচারী বেক্ জার্মানদের গোটাকয়েক স্পষ্ট কথা শোনাতে বাধ্য হ'লেন। যদিচ মন্দ লোকে বলে, তাঁর বক্তৃতা ও জার্মানীকে পাঠানো পত্র তাঁর নিজের রচনা নয়, পররাষ্ট্র দপ্তরের পাকা-পোক্ত মুন্সীরা নাকি অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ওদু'টি প্রস্তুত করে। ফরেন আফিস থেকে বেরিয়ে যখন তিনি "সেইমে" তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা পাঠ করতে চলেছেন, ঠিক সেই সময়ে কী কারণে তাঁর পরিচিত মোটার-যানের গতি রুদ্ধ হ'লো, এবং মাষ্টারী চালে পথ চলতে চলতে তাঁর সে সময়কার চেহারাটা দেখে নেবার এই অধমের সুযোগ ঘটলো। মনে আছে, গা-শীত-শীত-করা প্রভাতে ড্রেস্-সুট্ আর ড্রেস্-শার্টের তলায় বেক্ সাহেব একেবারে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছেন। ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছছেন এবং সমস্ত মুখখানা তাঁর উদ্বেগ ও উত্তেজনায় গল্‌দাচীংড়ির মত লাল হয়ে উঠেছে। এর কিছু পরেই রাদিও-যোগে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পেলাম। কম্পিত কণ্ঠে আরম্ভ করলেন—"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, ব্যবস্থা পরিষদের আজিকার এই অধিবেশনে, আমার গত কয়েকমাসের কার্য্যাবলীতে যে কতকগুলি অসঙ্গতি রহিয়া গেছে, তাহাই সংশোধন করিব।" এইটুকুই বেক্ সাহেবের সুদীর্ঘ, অস্পষ্ট বক্তৃতার সার মর্ম। এতদিন ধরে' দেশের লোককে প্রতারণা করার প্রায়শ্চিত্ত ঐ ক'টি কথার মধ্যে। দিনটা ৫ই মে, ১৯৩৯ সাল। ঐ দিনে হিট্‌লারের সঙ্গে বেক্-এর চিরতরে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

সেইদিনই পোলরাষ্ট্র কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয় ভারশৌএ পৌছলেন। সমগ্র পোলদেশের ওপর তখন কঠোর দুর্দিনের ছায়া পড়েছে। তবুও এই ভারতীয় জ্ঞান-ঋত্বিকের সম্বর্দ্ধনায় হাজার হাজার মানুষ গিয়ে হাজির হ'লো, তাঁর মুখ থেকে ইউরোপীয় সভ্যতার নিদারুণ সঙ্কটের দিনে যদি কোনো আশার বাণী শুনতে পায়, এই মনে করে'। প্রাচীন পোল জ্যোতির্বিৎ কোপের্নিক্-এর প্রতিমূর্তির সম্মুখস্থ বিশাল অট্টালিকা জনতা-পরিপূর্ণ। সমগ্র পোলদেশ থেকে পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সমাগম হয়েছে ভারশৌএ। বিপুল জনমণ্ডলীর সুমুখে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে যখন দার্শনিক তাঁর প্রকৃতিগত আত্মসমাধির সহিত ভারতীয় চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করলেন, তার আগেই তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্ব সমগ্র জনতাকে একই অনুপ্রাণনায় আবদ্ধ করেছে। বক্তৃতা চললো প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে'। সমাহিত, সম্মোহিত নরনারীর এই বিরাট সমাবেশের দিকে মাঝে মাঝে যখন তাকাই, তখন ভাবি আদর্শ-পাগল এই জাত জার্মানীর সঙ্গে বিরোধে তার মত দয়ামায়াশূন্য, বিবেকশূন্য হ'তে পারবে কী? সেদিন দার্শনিকের মুখনিঃসৃত ভারতের শান্তি-বাণী পোল-জাতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করলেও তার সঙ্গে সে সর্বান্তঃকরণে একমত হতে পারলে না। ওদেশে তখন সাজ সাজ রব পড়ে' গেছে।

মে মাসের মাঝামাঝি, পোল-জার্মানে যে একটা লাঠালাঠি বাঁধবে, তাতে আর কারো সন্দেহ রইল না। জার্মানী যদি আক্রমণ করে ত তাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবার জন্যে সবাই প্রস্তুত হ'লো। কিন্তু অভাব হ'লো এই ডাণ্ডার। প্রতি বৎসর ওরা যে যে সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ দেখেছি, তাতে পোল সেনার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও রণকৌশলের সঙ্গে তুলনা দেবার মত সেনা ইউরোপের অনেক মহা মহা শক্তিশালী দেশেও দেখতে পাই নি, বলে' মনে হয়েছিল। বিশেষরূপে, পোল অশ্বারোহী সেনা একেবারে অতুলনীয়। নৌবহর পোলদের সামান্যই ছিল, কিন্তু তাদের নৌসৈনিক সম্বন্ধে অন্যান্য দেশে যে প্রশংসা শুনেছি, এবং তার বাহ্যিক যে চেহারা চোখে পড়েছে, তাতে মনে হয়েছিল সৈনিক হিসেবে তারা সাগরপারের বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী যে কোনো জাতির নৌ-সৈনিকের তুলনায় কোনো অংশে হেয় নয়। পোলী বিমান-সৈনিক যে জগতের শ্রেষ্ঠ বিমান-সৈনিকের মধ্যে একজন, তার পরিচয় গ্রীষ্মকালে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন পেতাম, কারণ বছর খানেকের জন্যে ভারশৌএর হাওয়া-বন্দরের খুব কাছেই আমার আস্তানা ছিল। মোট কথা, লড়াই করতে পারে, তা সে জলেই হোক, স্থলেই হোক, আর

আকাশেই হোক, এমন লোকের অভাব ত ছিলই না, পরন্তু সাধারণ পোল সৈনিকের রণদক্ষতার সঙ্গে তুলনা দিতে পারা যায়, এমন সৈনিক অন্য দেশেও আখছার দেখা যেত না। এর প্রধান কারণ ছিল, পোলদেশে আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা, যার প্রসাদে প্রত্যেক পোলকে, আমীর-ওমরাহ থেকে সুরু করে' চাষা-ভূষো পর্য্যন্ত, সকলকেই একবছর বা দু'বছর সামরিক শিক্ষা অর্জন করতে হ'তো। সুতরাং লড়াকু লোকের অভাব ছিল না, অভাব ছিল হাতিয়ার আর যুদ্ধের মালমসলার।

এই অভাব পূরণ করবার জন্যে পোলরা কয়েক বছর আগে থেকে চেক্‌দের "স্কডা" কারখানার মত হাতিয়ার আর গোলা-গুলী, বোমা-বুমী তৈরী করবার এক প্রকাণ্ড কারখানা বানাচ্ছিল। তার নাম ছিল C. O. P. অর্থাৎ "কেন্দ্রীয় উদ্যোগ-শিল্প বিভাগ", চলতি কথায় বলা হ'তো "ৎসপ্"। ভীস্‌লার তীরে, সীমান্ত থেকে বেশ একটু দূরে সান্দোম্যেঝ্ সহরে ৎসপ্-এর কাঠাম খাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে, এবং কতকটা পয়সার অভাবেও তাকে দু'মেটে করা দূরে থাকুক একমেটে করাও হয়ে ওঠে নি। যতদূর স্মরণ হয়, ইংরেজদের কাছ থেকে যে একটা মোটা কর্জ পোলরা আশা করছিল, তার প্রায় সবটাই ৎসপ্-এর নির্মাণ-কল্পে ব্যয়িত হবে, এইরকম একটা হিসেব তারা মনে মনে ছকে' রেখেছিল। সুতরাং ঋণের হারটা আশানুরূপ না হওয়াতে পোলরা সত্যই একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। তবে ফরাসী ও ইংরেজ মহল থেকে পুনঃ পুনঃ সহায়তার আশ্বাস পেয়ে পোলরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হ'লো।

সুরু হ'লো যাকে বলে "প্রচ্ছন্ন রণসজ্জা"। অর্থাৎ দু'পক্ষেই এমন-ভাবে চুপি চুপি নিজের নিজের গায়ে উর্দি চড়াতে লাগলো, যাতে এক পক্ষ সন্দেহ না করে যে, অপর পক্ষ লড়াই করবার জন্যে তৈরী হ'চ্ছে। এজাতীয় সূক্ষ্ম ভদ্রতা বা তকল্লুফ্ আমাদের দেশের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে

চলতে সুরু করেছে, সুতরাং কথাটা এর চেয়ে খোলসা করে' বলবার প্রয়োজন নেই। এক কথায় প্রকাশ্যভাবে শিষ্টতা বজায় রেখে পোলরা আর জার্মানরা পরস্পরের মাথা ভাঙ্গবার জন্যে লাঠি-সোঁটা, ঢিল-পাট্‌কেল এবং লাঠিয়াল, যে যত পারলে জোগাড় করতে প্রবৃত্ত হ'লো। জার্মানদের আগে থেকেই এসব জমানো ছিল, সুতরাং তারা পোলদের তৈরী হবার খবর পেয়ে একেবারে ক্ষাপ্পা হয়ে উঠলো। এইবার আরম্ভ হ'লো যাকে বলে স্নায়ুর যুদ্ধ, অর্থাৎ কে কতক্ষণ অপর পক্ষকে চটিয়ে, ক্ষেপিয়ে, নিজে চুপ করে' থাকতে পারে।

এদিকে চলতে লাগলো চুপি চুপি পোলদের তৈরী করার কাজ। এই "প্রচ্ছন্ন রণসজ্জা" যে কীভাবে হয়ে থাকে তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেলাম। পোলদেশে আবশ্যিক সামরিক শিক্ষার প্রচলন থাকার দরুণ প্রত্যেকটি পোল, কে কী রকম হাতিয়ার ধরতে পারে, কার স্বাস্থ্য কী রকম এবং কার দ্বারা কী কাজ হ'তে পারে, এ সম্বন্ধে পোল সরকারের ভৃগু-সংহিতায় সঠিক এবং বিশদ খবর লেখা ছিল। সুতরাং সাদা ও লাল রঙের কার্ড অনুযায়ী পোলদের লড়বার জন্যে ডেকে পাঠানো হ'লো। নীল কার্ড-ওয়ালাদের এখনও ডাকা হ'লো না, কারণ তারা লড়িয়ে হিসেবে দেশের একেবারে ওপরকার মালাই-জাতীয়। ভবিষ্যতে যুদ্ধটা একটু পেকে এলে, এই পাকা ঘুঁটিগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার জন্যে তাদের জিইয়ে রাখা হ'লো। যাদের আপাততঃ ডাকা হ'লো তারা খঞ্জ, অন্ধ, আতুর না হ'লেও মারপিট করতে খুব ওস্তাদ নয়, শুনলাম।

এইসূত্রে বক্তব্য এই যে, মিতাদ্বয় অর্থাৎ ফ্রাঁস্ ও ইঙ্গস্থানের সুপরামর্শে পোলরা "সার্বজনীন রণসজ্জা"য় বিরত হ'লো। কারণ কূটনৈতিক ধড়ীবাজবৃন্দ ভাবলেন, এতে জার্মানদের বিনা কারণে চটিয়ে দেওয়া হবে। এই জন্যেই বিশেষ করে' নীল কার্ড-ওয়ালাদের

এখনও উর্দি পরানো হ'লো না। "সার্বজনীন রণসজ্জা" যখন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হ'লো, তখন পোলদের উর্দিতে পা গলাবার সময় নেই। সেটা হ'লো ২৯শে আগষ্ট। সে কথা পরে তুলবো। আপাততঃ চললো যুদ্ধের তোড়জোড়।

যুদ্ধে যাবার সমন নিয়ে আসে পুলিস, গোপনে আহূত ব্যক্তির হাতে দিয়ে চলে' যায়। যাকে ডাকা হ'লো তাকে সেইদিনই কোনো বিশেষ ঘাঁটিতে হাজ্‌রে দিতে হবে। আমারই অনেক ছাত্রের কাছে সমন এলো। ক্লাস আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে আসে। এ সমনের অর্থ কী তা কারো অজ্ঞাত ছিল না, তবু দেখি যৌবনোদ্দীপ্ত ছাত্রের মুখে কী গভীর আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান! এদের মুখের দিকে তাকাতে ভরসা হয় না, ভাবি এই যে এরা হাসতে হাসতে যুদ্ধে চলেছে, এদের কি আর দেখা পাওয়া যাবে? গভীর রাতে রাস্তার ওদিকে শুনি যুদ্ধে আহূত পোল যুবক মা, বোন, আত্মীয়-স্বজন বা বাগদত্তার কাছে বিদায় নিচ্ছে। শুনি হাল্‌কা হাসি আর কৌতুকভরা কথোপকথন। আপন নিকটতমকে ও দেশের মেয়েরা হাসিমুখে বিদায় জানায়, যখন নিজের কানে শুনি তখন বেশ একটু বিসদৃশ লাগে বৈকি। ভাবি, আমাদের দেশের রাজপুত মেয়েরা কি এমনিভাবে প্রিয়জনকে যুদ্ধে পাঠাতো? সে কতদিন আগেকার কথা? বিদায় নিয়ে ছেলের দল চলে' যায়। কে একটি ছোট মেয়ে পিছু ডেকে শুধায়, "আমার ব্যাঙ্‌-পুতুলটা সঙ্গে আছে ত?" উত্তর আসে, "হ্যাঁ ভাই, গিয়েই প্লেনের একেবারে সামনে বসিয়ে নেবো। তোর ব্যাঙ্‌ বেঁচে থাকলে আমি মরবো না রে মরবো না।" চাপা গলায় কুচ্‌কাওয়াজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কী একটা গান গাইতে গাইতে ছেলেরা রাত্রির অতলস্পর্শ গহ্বরে কোথায় যে হারিয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে তার হদিশ পাই না।

ইতিমধ্যে যা ঘটলো, তাকে বাস্তব বলে' বিশ্বাস করা সমগ্র বিশ্ব-জগতের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলো। রুশ-জর্মান স্যাঙাতির চুক্তি! ২৩শে আগষ্ট ১৯৩৯ সাল, জগতের এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ফরাসী ও ইংরেজ কূটনীতির নাকের ডগায় তুড়ী মেরে ফন্ রিব্বেন্‌ত্রপ্ মস্কোএ তাবারিশ্চ্ স্তালিনের সঙ্গে রুশিয়া ও জার্মানীর পারস্পর অনাক্রমণের সর্ত দস্তখৎ করে' এলেন। এর আগের ঘটনাসমূহ খবরের-কাগজ-পড়া প্রত্যেকেরই স্মরণ আছে, সুতরাং তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমি এখানে স্বধু যোগ করতে চাই এই যে, স্লাভদের ঘর-ভাঙানোর খেলায় হিট্‌লার সাহেবের এটি সবচেয়ে পাকা চাল। পোলদের বিরুদ্ধে রুশদের খাড়া করবার জন্যে তিনি তাঁর আত্মসম্মান বলি দিতেও সামান্যমাত্র কুণ্ঠা বোধ করলেন না। যে রুশ-বিদ্বেষ ও রুশাতঙ্কের ওপর তাঁর নাৎসীবাদের ভিত্তি, তিনি কার্য্যকালে সেই রুশদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে' স্বধু এই প্রমাণ করলেন যে, আধুনিক কূটনীতির তুলনায় কুটিল কৌটিল্যের নীতিসমূহও ছেলেখেলা মাত্র।

এই খেলায় ইংরেজ ও ফরাসীদের হার হওয়াতে যে পোলদের অনেকখানি দোষ ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ যদিচ জার্মান ও রুশ, উভয়েই পোলদের আজন্ম শত্রু, তত্রাচ তারা এর কিছুদিন আগেই জার্মানীর সঙ্গে পাঁচ বছর মিতালি করে' এসেছিল, অথচ যখন জার্মানীকে আত্মসংযম শেখাবার জন্যে ইংরেজ, ফরাসী, পোল ও রুশদের মৈত্রী নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ালো, তখন পোলরা বেঁকে বসলো। রুশদের সঙ্গে কোনপ্রকার সংশ্রব সৃষ্ট হ'লে তা যে পোল-ইংরেজ বন্ধুতার বাধক হবে, তাও তারা ঠারে-ঠোরে জানিয়ে দিলে। বিশেষরূপে বিপৎকালে যে তারা রুশদের জার্মানীর সঙ্গে মারপিট করবার জন্যে তাদের জমীর ভেতর দিয়ে বা ওপর দিয়ে সৈন্যচালনা করতে একেবারেই অনুমতি দেবে না, একথা

তারা গোপন করলে না। যতদূর মনে হয়, রুশ-ইংরেজ মৈত্রীর সর্ত যে অকৃতকার্য্য হ'লো তার একটি মুখ্য কারণ এই যে, রুশিয়া চেকো-স্লোভাকিয়ার মৃত্যুর পর কোনো আদর্শবদ্ধ, ভূয়ো চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজী হ'লো না। কারণ মিত্রের সাহায্যকল্পে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে' যদি যুদ্ধই না করা যায় ত তেমন মৈত্রীর তাৎপর্য্য কী? তাছাড়া অপর পক্ষ থেকে একটা মোটা মুনাফার প্রস্তাব এলো। জার্মানী ও রুশিয়া কর্তৃক পোল-দেশের অংশীকরণ। মর্ণিং পোষ্টের সংবাদদাতা যখন এ খবর পাঠালেন, তখন তা বিশ্বসুদ্ধ লোক হেসে উড়িয়ে দিলে। সে যাই হোক্, নাৎসী-সাভিয়েৎ-এর মোলাকাৎ-এ সম্ভ্রান্ত ইস্কুলে-পড়া ফরাসী-ইংরেজ কূটনীতিকে যে কুপোকাৎ করলে, তার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। সেকেলে রাজনীতির ঐতিহ্য বজায় রাখতে গিয়ে ইংরেজরা এখানেও ডজন খানেক গোল খেলেন, সে কথা তুললাম না।

যুদ্ধ ঘনিয়ে এলো।

পোলরা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, এতদিন পরে স্নায়ুর লড়াই সাঙ্গ হ'লো। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে' যে লুকিয়ে চুরিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করা হ'চ্ছিল, এখন আর তাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা করবার প্রয়োজন হ'লো না। হেমন্তের বৃষ্টি সুরু হবার আগেই যে হিট্‌লার তাঁর "দ্রাং নাখ্ অস্তেন্" আরম্ভ করবেন, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। তবে কথা উঠলো, এ অভিযান তিনি সুরু করবেন আজকালের মধ্যেই, না আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার পর? জার্মানরা নিজেদের সম্বন্ধে যে সমস্ত দুর্বলতার ভাঁওতা (যথা, তারা দরিদ্র, তাদের হাতিয়ার, গোলা-বারুদ কিছুই নেই, তাদের দেশে দুর্ভিক্ষ চলেছে, তাদের মুলুকে একটুকরো ডিম বা একছিটে মাখন পাওয়া যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি) বিদেশে চালান করছিল, তা ফরাসী ও ইংরেজদের দেখাদেখি পোলরাও এতদিন গলাধঃকরণ করছিল। যুদ্ধ যখন সত্যিই অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠলো, তখন তারা সর্ববিষয়ে সংহত, পরিতৃপ্ত ও সদণ্ড জার্মান বাহিনীর সঙ্গে যোঝবার জন্যে কোন্‌দিক সামলাবে তা ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

প্রথম কথা, যুদ্ধে আত্মরক্ষা। এ আত্মরক্ষা ততটা সৈনিকের নয় যতটা

নাগরিকের। পোলরা খবর পেলে, হিট্‌লারেন্দ্র একরকম যুদ্ধের কথা প্রায়ই উচ্চারণ করছেন, যার নাম "ব্লিৎস্ ক্রীক্"—বজ্র-অভিযান! এ ধরণের ব্রহ্মাস্ত্র নাকি দু'চার দিন, বড়জোর হপ্তা খানেকের মধ্যেই শত্রু-পক্ষকে ঘায়েল করে' ফেলে। এবং এই ব্লিৎস্ ক্রীগের জুজু দেখিয়েই তিনি আউস্ট্রিয়া ও চেকো-স্লোভাকিয়াকে ধরাশায়ী করেন। এর নাম থেকেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ লড়াই হয়ে থাকে আকাশ থেকে। শেষ কথাটা মনে হ'তেই পোলরা উপলব্ধি করলে, হিট্‌লার-পরিচালিত বজ্র-অভিযান আর কিছুই নয়, স্রেফ বোমারু থেকে যথেচ্ছ বোমাবর্ষণ! চেকো-স্লোভাকিয়ার তিন হাজার উৎকৃষ্ট স্কডা-মার্কা বোমারু হাতাবার পর জার্মান পক্ষে উড়োজাহাজের সংখ্যা পাঁচহাজারেরও বেশী। অপর পক্ষে পোলদের হাতে মাত্র শ পাঁচেক। তা ছাড়া, শোনা গেল, চেক্‌দের নাকি একজাতীয় বোমারু-শিকারী কামান ছিল যা শত্রুপক্ষের বোমারুর গর্জন শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই নিজে থেকে গোলা দাগতে সুরু করতো (সত্য মিথ্যা, শস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী হয়তো বলতে পারবেন)। এই শব্দ-ভেদী কামান নাকি জার্মানরা হাতিয়ে এনে যুদ্ধে লাগাবার জন্যে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসিয়েছিল। এক কথায়, পাঁচশ উড়োজাহাজ দিয়ে পাঁচহাজার বোমারুকে ঠেকানো সম্ভব নয়, একথা পোলরা উপলব্ধি করলে। তাদের একমাত্র আশা হ'লো এই যে, হিট্‌লার তাঁর বজ্র-অভিযান সুরু করলে, পশ্চিমে পোলদের দোস্ত্‌দ্বয় দ্বারা তাঁর উপরও অনুরূপ অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং আপাততঃ চললো বিমান-আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তোড় জোড়।

সুরু হ'লো আত্মরক্ষার "আশ্রয়"-নির্মাণের কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোদাল-খোন্তা নিয়ে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ মাটি কুপিয়ে বানালে আঁকা-বাঁকা সুড়ঙ্গ। সহরের পার্ক্, পথের ধার, বাড়ীর সামনের

বাগান, কোথাও এতটুকু জমী খালি পড়ে' রইল না। সর্বত্র আঁকা-বাঁকা সুড়ঙ্গ, মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাত দুই তার গভীরতা। অনেক ক্ষেত্রে, সুধু ঢোকবার আর বেরোবার পথ খোলা রেখে, বাদবাকী সবটুকু সুড়ঙ্গের উপর মাটি চাপা দেওয়া হ'লো। দু'একদিনের মধ্যেই ভারশৌএর চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেল। আত্মরক্ষার জন্যে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা সম্বন্ধে কী কী কর্তব্য তার বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি গুহামুখে টাঙিয়ে দেওয়া হ'লো। তার যে মর্মগ্রহণ করলাম তা এই যে, পরিখাগুলি রাস্তায়-পড়া বোমার হাত থেকে পরিত্রাণলাভের পক্ষে অব্যর্থ, তবে বোমা যদি ঠিক পরিখা লক্ষ্য করে' পড়ে ত অন্য কথা। তাছাড়া গ্যাসের কবল থেকে আত্মরক্ষা করার পক্ষে যে এই সুড়ঙ্গগুলি সম্পূর্ণ তাৎপর্য্যহীন, তা বলাই বাহুল্য। পরিখা-খননের সময় কৌতুকপ্রিয় কেউ কেউ বললে, "ভালোই হ'লো, যুদ্ধের সময় গোর খোঁড়বার দরকার হবে না।" কথাগুলো যে বত্রিসটা দাঁতওয়ালা মুখ থেকে বেরিয়েছিল, তা তখন কে জানতো? পরিখা-খননের যে একটা বিশেষ দোষ হয়েছিল, তা পরে বোঝা গেল। সেগুলো বেশীর ভাগই জার্মানদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে বড় বড় গাছের তলায় খোঁড়া হয়েছিল, এবং শত্রুপক্ষ সেই সেই গাছের ওপর একেবারে টিপ করে' বোমা ফেলে যায়। সেকথা পরে হবে।

এই "আশ্রয়ের" আরো এক প্রকার-ভেদ দেখা গেল। তা হ'চ্ছে বড় বড় ইমারৎ-এর ভিতের নীচেকার ঘর, যেখানে সাধারণতঃ রাখা হ'তো আলু, কয়লা, মদের পিপে, জরানো বাঁধাকোপি এইসব। ভারশৌএর অধিকাংশ বাড়ীই চার, পাঁচ, ছ', সাত এমন কি আটতলা। কাজেই প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর তলাতেই এজাতীয় ভিত-কামরা পাওয়া গেল। পাকা গাঁথুনির পুরাণো বাড়ী, কেল্লার মত পুরু তাদের দেওয়াল, সুতরাং

এখানে অনধিকারপ্রবেশ যে বোমার বাবারও অসাধ্য, এই ধারণা অনেকেরই জন্মালো।

দ্বিতীয় কথা, যুদ্ধের সময় আহার্য্যের ব্যবস্থা। পোলদের টেঁকে যে আকবরী মোহর বা ফারসী আশ্‌রফী অথবা রুশী সোণার রুব্‌ল্‌-এর বগলী আছে, এ দুর্নাম তাদের অতিবড় শত্রুরাও কোনোদিন রটায় নি। কিন্তু সোণা-রূপোর পরিবর্ত্তে তাদের ছিল আহারের সচ্ছলতা, যা সাধারণতঃ কৃষি-প্রধান দেশে হয়ে থাকে। দুধ, মাখন, সব্জী, ফল, মাংস, আটা, "কাশা" বা বার্লিজাতীয় শস্য এবং যাবতীয় আহার্য্য পোলদেশে যথেচ্ছ পরিমাণে পাওয়া ত যেতই, তাছাড়া তাদের দামও সুধু মূল্য-ধরে'-দেওয়া গোছের ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে চাষাদের কাজ যে বন্ধ হয়ে যাবে, একথা সকলেই অনুমান করলে। তত্রাচ শোনা গেল, পোলদের শস্যাগারের যা অবস্থা তাতে দু'চার বছর হাত পা ছড়িয়ে বসে' খাওয়া বেশ চলতে পারে। তবুও সরকার থেকে পরামর্শ পাওয়া গেল, কিছু খাবারের সংস্থান আগে থেকে করে' রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সুধু খাবার নয়, শীতের দেশে কয়লাও কিছু।

"দুধ আর মধুর বন্যা-প্লাবিত পোলদেশে" (পোলীয় প্রবাদ-বাক্য) যে খাদ্যের অনটন হবে একথা অনেকেই বিশ্বাস করলে না, এবং আহার্য্য-সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট রইল। সিনিক্ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ বৃদ্ধা ঠাকুরমা, দিদিমা-জাতীয়ারা যাঁদের গত মহাযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁরা ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়েও আটা, চিনি, তেল, ঘি, নূন প্রভৃতি কিনতে আরম্ভ করলেন। আস্তে আস্তে দোকান-পসারে ভিড় জমে উঠলো। সুবিধা বুঝে ইহুদী বেনের দল দর চড়াতে সুরু করলে, এবং যত পারলে বস্তা-বস্তা, আটা, চিনি প্রভৃতি লুকিয়ে লুকিয়ে জমা করতে লাগলো,

যাতে যুদ্ধের সময় তা দশগুণ দরে ছাড়তে পারা যায়! তার ওপর যা কিছু রদ্দি মাল গুদাম বোঝাই করা ছিল, এবং যা বিক্রী করা কখনো সম্ভব হ'ত না, ইহুদীরা সেইসব মাল দুনো দরে বেচতে লাগলো। খরিদ্দারের বিশেষ অভাব হ'লো না, কারণ বাজারে ভালো মাল গায়েব হয়ে যাওয়াতে, আতঙ্কিত জনতা খারাপ মাল পেয়েই দোকানদারদের অশেষ ধন্যবাদ জানালে। সরকার থেকে এ ধরণের স্পেকুলেশনের প্রতিকার কিছু হ'লো বটে, কিন্তু তা ঠিক যুদ্ধের আগে দেশের অব্যবস্থিত অবস্থার জন্যে বিশেষ কার্য্যকর হ'লো না। ইহুদীরা পোলদের ঠকিয়ে গুদাম ভরে' মাল পুঁজী করে' রাখলে। খাদ্য-সংগ্রহ বিষয়ে হয়তো বলা অবান্তর হবে না যে, এই অধমও কিছু খাবার সঞ্চয় করে' রাখলে। বেশী কিছু নয়, আধমণ আটা, আধমণটাক চাল, কাশা ইত্যাদি। তাছাড়া টন্‌খানেক কয়লাও কিনে রাখা গেল। তখন উপলব্ধি করতে পারি নি যে, এ ক'টি জিনিষ না থাকলে পরে জীবনধারণ করা সম্ভব হ'তো না।

জনসাধারণের আহার্য্য-সংস্থান সম্বন্ধে আরো একটা গুরুতর কথা উঠলো। তা এই। শোনা গেল, আসন্ন যুদ্ধে নাকি শত্রুপক্ষীয়েরা বিষাক্ত গ্যাস্ ছাড়বে। সুতরাং গৃহস্থের প্রাণ যদি কোনো রকমেও বাঁচে ত তাকে অনাহারে পটল তুলতে হবে। কারণ অতি পরিষ্কার। বিষাক্ত গ্যাস আহার্য্যকে অনুষিক্ত করবে, এবং তা মুখে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভোক্তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। নিজের ও পরিবারের এ ধরণের মৃত্যুর কল্পনা যেকোনো কেটো-চরিত্রের মানুষকেও বিচলিত করে' ফেলে। সুতরাং দলে দলে লোক ছুটলো বড় বড় সিন্দুক কিনতে। গ্যাসের আক্রমণ থেকে আহার্য্যের নিরাপত্তার জন্যে এক রকম বাক্স তৈরী হয়ে বাজারে দেখা দিলে। এজাতীয় বাক্সের নির্মাণ-পদ্ধতি জটিল নয়, সুধু খোল আর ডালা যেখানে এসে ঠেকে সেই জায়গার চারিদিকে

খাঁজ, এবং সেই খাঁজে জল ভরে রাখতে হবে। তাহ'লে গ্যাস্ জল ভেদ করে' ভেতরে ঢুকতে পারবে না। এ ধরণের সিন্দুক কেনবার যা'র সঙ্গতি নেই, তাদের সাধারণ বাক্সের খাঁজে খাঁজে বার্ণিসে ভেজানো তুলো এঁটে দিতে পরামর্শ দেওয়া হ'লো।

সহরের জল-সরবরাহও যদি বন্ধ হয়ে যায়, বা গ্যাস্ অথবা বীজাণুতে বিষাক্ত হয়ে ওঠে, সেই জন্যে বড় বড় লোহার ট্যাঙ্ক্ও কিনে রাখলে কেউ কেউ, বিশেষ করে' যাদের পরিবার ক্ষুদ্র নয়। এ ছাড়া ক্যানেস্তারা ভরে' কেরোসিন, ল্যাম্প্ এবং বাতীও কিনে রাখলে অনেকে। কারণ যুদ্ধের সময় সহরের আলো-সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

এইসঙ্গে আর এক ধূয়া উঠলো—গ্যাস্!

গত মহাযুদ্ধে জার্মানরা প্রথমে গ্যাস্ ব্যবহার করে। সুতরাং আসন্ন মহত্তর যুদ্ধে তাড়াতাড়ি, "ব্লিৎসী" কায়দায় কাজ হাসিল করতে হ'লে জার্মানদের পক্ষে গ্যাস্ ব্যবহার করা যে আশ্চর্য্য নয়, এ ধারণা অনেকের হ'লো। অখ্বারাদিতেও এসম্বন্ধে বড় বড় রচনা প্রকাশিত হ'তে লাগলো। দু'একখানা ছোট ছোট বইও ছাপা হ'লো। এই গ্যাসের কার্য্যকলাপের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া গেল, তা কল্পনা করতেই মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তার সঙ্গে চোখা-চোখি হওয়া ত দূরের কথা! এই গ্যাস্ যে কী উপায়ে আসবে তাও ঠিক জানা গেল না। মোটামুটি জানা গেল, যদি ধারে কাছে বোমা পড়বার পর, কোনা অস্বাভাবিক ধরণের গন্ধ পাওয়া যায়, ত তখনি বুঝতে হবে গ্যাস্! সুধু অস্বাভাবিক গন্ধ নয়, খুব পরিচিত গন্ধও, যথা আতর ইত্যাদির, গ্যাসের অগ্রদূতের কাজ করতে পারে। এছাড়া ধোঁয়ার আকারের কড়া গ্যাস্ ত আছেই, যা গত যুদ্ধে সেনেগালী নীগ্রো সৈনিকদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয়প্রকার গ্যাসেরই প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর, শোনা গেল।

নাকে-মুখে প্রবেশ করা মাত্রই মানুষের গা বমি বমি করতে সুরু করে, ক্রমে তার চোখের সুমুখে ঝাপসা হয়ে আসে, এবং শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় গ্যাসিত ব্যক্তি অচিরে মহাপ্রয়াণ করে।

সবচেয়ে ভীতিকর এক গ্যাসের বিবরণ পাওয়া গেল। তার নাম ইপেরিং। বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে এই তরল পদার্থটি ধারে কাছের মানুষদের গায়ে শান্তিজল ছেটানোর মত ছিটিয়ে পড়ে। কোথায় যে ছোট্ট একটি ফোঁটা গায়ে লাগলো, তা অনেক সময়ে বুঝতেও পারা যায় না। যেখানে এই ছোট ফোঁটাটি এসে পড়লো, সেখানকার এমন কি জামা ভেদ করে' সে গায়ের ওপর এসে হাজির হ'লো এবং শরীরের সেই অংশে ধরলো কদাকার পচানী। ক্রমে সর্বাঙ্গে পচে' কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ মারা যায়। ইপেরিং-এ পচা একখানি পায়ের ডাক্তারী মডেলও দেখলাম। তার বর্ণনা দিয়ে পাঠকের সৌন্দর্য্যবোধের ওপর কষাঘাত করতে চাই না। এ ধরণের গ্যাস্ নাকি যুদ্ধের সময় ছেলেপুলেদের খেলনা বা চকোলেট কিংবা লজেঞ্চুসে মাখিয়ে উড়োজাহাজ থেকে ফেলে দেশময় ছড়ানো আশ্চর্য্য নয়, একথাও শুনলাম।

যাই হোক্, গ্যাসের হাত থেকে টুঁটি বাঁচানোর একমাত্র উপায় যে গ্যাস্-মুখোস ব্যবহার করা, সে বিষয়ে সবাই একমত হ'লো। কিন্তু পোলরা যখন হন্যে হয়ে গ্যাস্-মুখোস কিনতে গেল, তখন খবর পেলে, সাধারণ নাগরিকের জন্যে (অর্থাৎ অসামরিক) মুখোস তখনো তৈরী হয় নি, এবং পরে তা কিনতে হ'লে এখন থেকেই ফরমাইস দিয়ে রাখতে হবে। ফরমাইস দেবার জন্যে বিমান আক্রমণে আত্মরক্ষার কেন্দ্র-ভবনের সামনে থেকে সুরু করে' মাইল খানেক রাস্তা জুড়ে লোক দাঁড়িয়ে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাল-বৃদ্ধ-বনিতা, যুবক-যুবতী, যুদ্ধের সময় যাদের

সহরে থাকতে হবে, তারা দিনের পর দিন গ্যাস্-মুখোস কেনবার জন্যে ধন্না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে অল্পদিনের ভেতর গ্যাস্-মুখোস তৈরী করা যখন অসম্ভব হয়ে উঠলো, তখন সরকার থেকে আর এক ধরণের কাজ-চালানো গোছের গ্যাস্-প্রতিরোধক মুখোস তৈরী করবার জন্যে পরামর্শ পাওয়া গেল। নাক আর মুখ ঢাকবার জন্যে শাঁস-শূন্য তালের আঁটির আধখানার আকারে এক রকম থলী, তার চারিপাশে কয়লার গুঁড়ো দু'পর্দা কাপড়ের মধ্যে সেলাই করা। ফিতে দিয়ে মাথার পেছন দিকে বেঁধে দিলে তার আর নাক ফস্কে পড়বার উপায় নেই। দু'তিন সাইজের এ ধরণের মুখোস বাজারে চললো। তবে এতে চোখ ঢাকবার উপায় নেই ; সুতরাং গ্যাস্ আক্রমণ করলে চোখ বুজে থাকতে হবে, না হ'লে জন্মের মত চোখ দু'টি ঘুচে যাবে। তা ছাড়া শিশুদের পক্ষে এ মোটেই কার্য্যকর নয়, কারণ তাতে শিশুদের দম আটকে যাওয়া স্বাভাবিক, এবং তাদের চোখ বুজে থাকতে বলা নিরর্থক। গ্যাস্ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে রুমালে মাখিয়ে নাকে চাপা দেবার জন্যে এক রকম দাওয়াইও পাওয়া গেল।

এ ত গেল গ্যাসের কব্জা থেকে আপন আপন টুঁটি বাঁচাবার কায়দাকানুন। গ্যাস্ যাতে কোনো ক্রমে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়েও গৃহস্থকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হ'লো। শীতের দেশের ঘর-বাড়ী, যাতে আলো আসতে পারে অথচ ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকতে না পারে, সেই জন্যে ওদেশে দেওয়ালের অনেকখানি জুড়ে শার্শী-দেওয়া দুনো জান্‌লা। শীতের সময় যাতে একটুও হাওয়া ভেতরে ঢুকতে না পারে সেই জন্যে জান্‌লার চারিপাশে পশম, তুলো বা রবারের ফিতে আঁটা থাকে। জান্‌লা বন্ধ করে' দিলে কপাট দুটো কাঠামের সঙ্গে এমন জম্পেশ হয়ে এঁটে যায় যে, তার ভেতর দিয়ে অতিবড় ভূতও ঢুকতে পারে না ত হাওয়া

কোন ছার! কিন্তু গ্যাসের নাকি ভূতের চেয়েও সূক্ষ্ম শরীর। কল্পনা-শক্তির মত তার সর্বত্র গতিবিধি। তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সরকার থেকে বিধান পাওয়া গেল এই ঃ বাড়ী বা ফ্ল্যাটের বাইরের দিকে যত কিছু ফুটোফাটা আছে তা পুটিং দিয়ে বোজাও। তার পর মোটা পশমের ফিতে দিয়ে সদর দরজা, বাইরের জান্‌লা ইত্যাদি পূর্বোক্ত উপায়ে জম্পেশ করে' আঁটো। সুধু ফিতেয় হবে না, তা আঁট্‌বার আগে টস্‌টসে করে' বার্নিসে ভিজিয়ে নাও। তা সত্বেও যদি কোনোখানে ছিদ্র আছে বলে' সন্দেহ হয়, ত সেখানে বার্নিস-ভেজান তুলো গুঁজে দাও। এতেও গ্যাসের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তার হাত থেকে সম্যকরূপে আত্মরক্ষা করতে হ'লে, বাড়ীর ভেতরদিককার একটা বেশ বড় গোছের ঘর উপরি-উক্ত উপায়ে আটেকাঠে বন্ধ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি "গ্যাস" শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, ত তৎক্ষণাৎ ঐ ঘরে গ্যাস-মুখোস সমেত ঢুকতে হবে।

এ ধরণের সাধারণী বিজ্ঞপ্তি পাওয়া মাত্র নগরবাসীদের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে' গেল। সমস্ত বাড়ী বা ফ্ল্যাট এই ভাবে আটেকাঠে বন্ধ করতে হ'লে যে অর্থের প্রয়োজন তা সকলের ছিল না। সুতরাং গরীব লোকেরা আতঙ্কিত মুখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, পয়সাওয়ালা মানুষের ঘর-বাড়ীতে গ্যাসের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যথারীতি দোর-জান্‌লা বন্ধ করবার ধুম পড়ে' গেছে। তারা যাবে কোথায়? কেউ কেউ এসে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হ'লো। অধোমুখে মিনতি জানালে, গ্যাস্‌-আক্রমণের সময় তার বাচ্চা ক'টাকে বাবুদের বাড়ীতে রেখে যেতে পারবে কিনা। অনেক ক্ষেত্রেই এরকম প্রার্থনা নামঞ্জুর হ'লো, কারণ যাদের ছোট একখানি ঘর গ্যাসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষাকল্পে "আশ্রয়ে" পরিণত হয়েছে, সেখানে চার পাঁচ ঘন্টা বন্ধ থাকবার মত হাওয়া আপন

আপন পরিবারের পক্ষেই যথেষ্ট নয়। ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কুৎসিত সামাজিক অসঙ্গতিতে চোখ ও মন অভ্যস্ত থাকলেও, এই সময়ে কেন জানি না জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলাম, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও গরীবে বড়মানুষে এই যে ফারাক্, হয়তো তাই নিয়েই বিধাতার অভিশাপে এক বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার সূচনা হ'চ্ছে। সে যাই হোক্, দু'এক দিনের মধ্যেই ঘরদোর বন্ধ করবার যাবতীয় উপকরণ, পশম, তুলো বা রবারের ফিতে, মায় বার্নিস পর্য্যন্ত বাজার থেকে অন্তর্হিত হ'লো। সহর সুদ্ধ লোকের জন্যে একদিনেই ঐসব মাল যোগাবার মত কোনো অফুরন্ত গুদাম ভারশৌএ ছিল না। তাছাড়া এক্ষেত্রেও ইহুদী বেনের দল পরে লাভবান হবার জন্যে ঐসব মাল জমা করে' রাখলে। দেশে গ্যাস্-মুখোস আর ঘরদোর বন্ধ করবার মালমসলার এমন অনটন পড়ে গেল যে, লোকে মারীয়া-দেবীর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করতে লাগলো, যেন যুদ্ধটা আরো দিন কয়েক পেছিয়ে যায়।

গ্যাস্ বাড়ীতে ঢুকুক বা না ঢুকুক, বোমার আওয়াজে যে বাড়ীর সব ক'খানি শার্শীই এক নিমেষে ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙ্গে যাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাচের টুক্‌রো ছুটে এসে, এক অন্ধ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে, যাকে তাকে জন্মের মত জখম করে' দেবে, সে সম্বন্ধেও সরকারী বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেল। তা ছাড়া শার্শী ক'খানি না বাঁচালে গ্যাস্ আটকাবার উপায় কী ? সুতরাং শার্শী বাঁচাবার জন্যে নগরবাসীদের নানা সাবধানতা অবলম্বন করতে হ'লো। প্রধান উপায় এই ঃ শার্শীর এক পাশ থেকে আর এক পাশ পর্য্যন্ত কাগজের ফালি আঠা দিয়ে লেপে দিতে হবে। এবং গ্যাসের আশঙ্কা-ধ্বনি না পাওয়া পর্য্যন্ত জানলাগুলো একেবারে বন্ধ না করে' সুধু আলগাভাবে ভেজিয়ে রাখতে হবে। কাগজের ফালির তাৎপর্য্য এই যে, বোমার আওয়াজে যদি শার্শী ভেঙ্গে যায়, ত কাচের টুকরো সজোরে

ছিটকে এসে মানুষকে আহত করবে না। এই কাগজের ফালি লেপা নিয়েই মেয়েদের স্বভাবগত আলপনা দেবার প্রবৃত্তি সর্বত্র প্রকাশ পেতে লাগলো। শার্শীর ওপর শোভা পেতে লাগলো যত রকমের কাগজের ছবি, গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফুল, তা ছাড়া হাজার রকমের রেখার হেরফের।

আত্মরক্ষার এক প্রধান সহায় এবং যুদ্ধকালে অপরিহার্য্য সামগ্রী বাজারে বিক্রী হ'তে লাগলো, অথচ দেশের লোকের সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। অলীক গ্যাসের কবল থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যে অর্থ তারা ব্যয় করলে, তার দশমাংশও যদি এই জিনিষটির জন্যে ব্যয়িত হ'তো, ত অনেকের বৃথা ক্ষতজনিত রোগভোগ বা গ্যাঙ্‌গ্রীনে প্রাণত্যাগ করতে হ'তো না। জিনিষটি আর কিছুই নয়, ছোট ছোট পকেট দাওয়াইখানা। পথ চলতে চলতে মানুষ যদি আহত হয় (যা যুদ্ধের সময়ে নিতান্ত স্বাভাবিক) ত ক্ষতকে নির্দোষ করবার জন্যে আয়োডিন্ প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ ও একটু ব্যাণ্ডেজ এই হ'চ্ছে পকেট-দাওয়াইখানার উপকরণ। যুদ্ধের সময় রাস্তা-ঘাটে এত অস্বাস্থ্যকর নোংরা জমে, অথবা বোমার টুক্‌রোয় কী এক মারাত্মক বিষ থাকে, যে জন্যে শরীরের সামান্য ক্ষতকেও অবহেলা করা বিপজ্জনক। যুদ্ধের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই সমগ্র পোলদেশে এক ফোঁটা আয়োডিন্ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না, সুতরাং সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শুনে সুখী হ'লাম, সম্প্রতি কে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক যুদ্ধকালে ব্যবহারের জন্যে ফাউণ্টেনপেনের আকারে এক অভিনব পকেট-দাওয়াইখানা আবিষ্কার করেছেন।

যুদ্ধের সময় আহত হ'লে কী রকম সাহায্য সরকার থেকে পাওয়া যেতে পারে, সে সম্বন্ধে একটু খোঁজ করতে হ'লো। সে বছর আমার ফ্ল্যাট ছিল

ভারশৌএর প্রাচীন পল্লীতে। বনিয়াদী ব্যবসাদার, লিখিয়ে, আঁকিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে মানুষ এবং মাষ্টার আর মজুরদের এখানে বাস। এক কথায় ভারশৌএর বোহেমীয় পল্লী বলতে এই পাড়াটি। পোলদেশে খাঁটি পোলীয়তা যদি কোথাও আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে থাকে ত সে এই প্রাচীন পল্লীতে। বাড়ীর গায়ে কতরকমের বিচিত্র ছবি আঁকা, হঠাৎ ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন নগরী বলে' ভুল হয়। বাড়ীর সারির মাঝখান দিয়ে সরু সরু গলি এক বিস্ময়লোককে অপর এক বিস্ময়-লোকের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ছবি আঁকবার বা গল্প লেখবার মালমসলার এখানে এত প্রাচুর্য্য যে, এ পাড়ায় এলে আঁকিয়ে বা লিখিয়েদের বাঁশবনে ডোম কানার অবস্থা হয়। সাধারণ জীবন যাপনের জন্যেও এই "পুরাণা সহরে" সব দিক দিয়েই সুবিধা। সুধু অভাব দেখা গেল যুদ্ধকালে আহত ব্যক্তির জন্যে সাহায্যকেন্দ্রগুলির। খুঁজতে গিয়ে খবর পেলাম, এ পাড়ায় আহত হ'লে কী করা উচিৎ সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা আছে বটে, তবে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া বা ক্ষতের ওপর একটু আয়োডিন্ লেপে দেবারও ব্যবস্থা নেই। সুধু এপাড়া বলে' নয়, অন্যান্য পল্লীতেও যে বিশেষ কার্য্যকর সাহায্যকেন্দ্র আছে, তা বিশ্বাস হ'লো না। একেবারেই যে নেই তা নয়, তবে নগরবাসীদের "পহলী মদদ্" বা প্রথম সাহায্য দেবার মত খুব সুব্যবস্থা আছে বলে' বোধ হ'লো না। বোঝা গেল, আকস্মিক যুদ্ধের সম্ভাবনায় বেচারা পোলরা যে কোন্ দিক সামলাবে, তা ভেবে উঠতে পারছে না।

ঠিক এই সময়ে ব্রিতানীয় কন্সুলাৎ থেকে খৎ পাওয়া গেল এই মর্ম্মে যে, পোল-জর্মান মনোমালিন্যে বোধ হ'চ্ছে, যুদ্ধ বাধা আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং দেশে ফেরবার এই প্রশস্ত সময়। এইসঙ্গে আমায় আরো জানানো হ'লো যে, ব্রিতানীয় প্রজাদের জন্যে গ্যাস্-মুখোস পাওয়া যেতে পারে। তার

দাম কন্‌সুলাতে জমা দিলে, দু'এক দিনের মধ্যেই মুখোস পাওয়া যাবে। প্রবাসী প্রত্যেকটি ব্রিতানী প্রজার তত্ত্বাবধানের এরকম সুব্যবস্থা দেখে সত্যই মোহিত হ'লাম, এমন কি ভারতীয় হয়েও ব্রিতানীয় ছাড়পত্রের অধিকারীরূপে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। পরিচিত পোলদের কাছে কথায় কথায় ব্রিতানীয় প্রজাদের সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ করে' তাদের ঈর্ষার উদ্রেক করা গেল। এবং কনসুলাতে দু'টো মুখোসের টাকা জমা দিয়ে শ্রীযুক্ত কন্‌সুল্ মহোদয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কিঞ্চিৎ বাৎচিৎ করা গেল। আমার গলা শুনে কন্‌সুল্ ইংরেজ-সুলভ, মোলায়েম তকল্লুফের সঙ্গে জানালেন, "হ্যাঁ দেশে ফিরলেই ভালো, তবে—হ্‌ম্—হ্‌ম্—হ্‌ম্—আপনি ভারতীয়, সুতরাং আপনার পক্ষে এ সময়ে দেশে ফেরা কতদুর সম্ভব হবে জানি না।" মোট কথা বোঝা গেল, একজন ভারতীয় যে ইংরেজদের সঙ্গে ইঙ্গস্থানে ভিড় বাড়ায়, এটা ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়। কন্‌সুল্ তাঁর অক্সফোর্ডী ভদ্রতার বাক্যচ্ছটায় আমায় বারে বারে আশ্বাস দিলেন, যেহেতু আমি ওদেশে রুটি কামাই, আমার অত তাড়াতাড়ি দেশ ছাড়বার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এবং যদি প্রয়োজন হয়, ত আমায় শেষ মুহূর্তে খবর দেবেন, একথাও জানালেন। কথার ভাবে বুঝলাম, ইংরেজ কূটনীতিকরা তথনও বিশ্বাস করতেন না যে, ইংরেজ আর জার্মানে অত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বেধে যাবে।

আমার তখন কর্তব্য কী, তা নির্দ্ধারিত করবার গোড়ার কথা হ'লো, ওদেশ ছাড়বো কিনা। ওদেশ ছাড়বার অনুরোধ আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আগেই পেয়েছিলাম। তারা নিতান্ত দুঃখের সহিত জানিয়েছিল, পোলদের যে দুর্দিন আসছে, ভারতীয় হিসেবে তার ভাগী হবার প্রয়োজন কী? এখন সেই দুর্দিনের সম্মুখীন হয়ে ভাবলাম, কী করা উচিৎ। এই সময়ে, ১৯৩৫ সালে টাইম্‌সের একটা খবরের কথা

মনে পড়লো। ব্যাপারটা হাব্‌শী যুদ্ধ সংক্রান্ত। হাব্‌শী-ইতালীয় যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করতো না। হঠাৎ একদিন আদিস্‌-আবাবা থেকে এক সাংবাদিক জানালেন, এইবার যুদ্ধ বাধলো বলে', কারণ ভারতীয়রা পাত্তাড়ি গুটোতে সুরু করেছে। এই সঙ্গে তিনি একথাও জানালেন যে, যদি ভারতীয়রা কোনো দেশ থেকে সরে' পড়তে সুরু করে ত বুঝতে হবে, সেদেশে কোনো একটা গভীর অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। ইংরেজদের ভেতরই একটা কথার প্রচলন আছে তার সারমর্ম এই যে, যদি কোনো বন্দরে ইঁদুররা জাহাজ ছেড়ে ডাঙ্গায় লাফিয়ে, পালাতে আরম্ভ করে ত বুঝতে হবে, সে জাহাজের পরবর্তী বন্দরে পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। হাব্‌শী-যুদ্ধে ভারতীয়দের সম্বন্ধে কথাটা ঐ ভাবেই প্রযুক্ত হয়েছিল বলে' মনে পড়ে। সুতরাং আমি ওদেশে থেকে ওদের কোনোরূপ সাহায্যই করতে পারবো না, একথা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলেও ওদেশে থাকতে মনস্থ করলাম। তাছাড়া চর্মচক্ষে একটা সত্যিকার যুদ্ধ দেখবার লোভটাও দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো।

আসন্ন যুদ্ধের আবহাওয়া ক্রমেই গা-সওয়া হয়ে এলো। সারাদিন ধরে' দেখি মানুষ হয় আত্মরক্ষার তোড়জোড় করছে, দোকানে দোকানে গ্যাস্‌-মুখোস বা দোর-জানলা বন্ধ করবার ফিতে বা বার্নিস বা কিছু খাবার, বিশেষ করে' ময়দা, চিনি আর নূন, বেচবার জন্যে দোকান-দারদের হাতে পায়ে ধরাধরি করছে; আর না হয় সহর ছেড়ে মোটঘাট নিয়ে গ্রামের দিকে চলেছে। এখন আর "যুদ্ধ হবে" একথাটা বাড়ীর ছাদ থেকে মুখে মেগাফোন লাগিয়ে চীৎকার করে' বললেও পুলিসে হানা দেয় না, বরং তাতে খুসীই হয়। তাছাড়া রাদিও খুললেই শুনতে পাই যুদ্ধের আলোচনা, আর না হয় কান-ফাটানো, প্রাণ-নাচানো গোরা-বাদ্যি।

সত্যিকার যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করলে সহরের তমসাচ্ছন্ন অবস্থা। কয়েকমাস আগে থেকেই মাঝে মাঝে ভারশৌএর রাত্রির আকাশ সার্চ্ লাইটের আলোয় একেবারে দিনমানের মত পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। উদ্দেশ্য, রাতে-ভিতে অন্ধকারে পথ ভুলে (?) কোন জর্মান উড়ো-জাহাজ ভারশৌএর ওপর এসে পড়েছে কিনা, তারই তত্বাবধান করা। এখন এই পথ-ভোলা আকাশ-পথিকদের শ্যেন দৃষ্টির নীচে সমস্ত সহর-খানাকে যেন একটি ফুৎকারে দীপ-শিখার মত নিবিয়ে দেওয়া হ'লো।

তখনও কৃষ্ণপক্ষ চলেছে, অথবা শুক্লপক্ষের ঈদের চাঁদের আকারে এক-ফালি আধ-ফালি চাঁদ আকাশে দেখা দিচ্ছে। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রামের তার ও চালন-দণ্ডের সংঘর্ষে বিদ্যুতের ফুল্‌কি ছাড়া আর কোনো আলো চোখে পড়ে না। দূর থেকে মনে হয়, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপের আকাশ থেকে যে মুঠো মুঠো তারা খসে' পড়ে, তারই দু'একটা ছিট্‌কে জমীর খুব কাছে এসে পড়ছে। বাইরে ত কোনো আলো নেই-ই, ঘরের আলোরও বাইরে বেরবার কোনো সম্ভাবনা নেই। জান্‌লা, শার্শী সব মোটা, কালো কাগজ দিয়ে ঢাকা। আলোর ওপর নীল রং মাখানো, তার ওপর কালো কাগজের মুখোস চাপা। জান্‌লার ওপর আলো পড়ে' যাতে ঘুণাক্ষরেও বাইরে থেকে তার আভাস না পাওয়া যায়, সেইজন্যে পথের দিককার ঘরে আলো জ্বালবার হুকুম নেই, এমন কি, ভেতর দিককার ঘরে আলো জ্বাললে আগে সে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিতে হবে। রাস্তা-ঘাটে কোথাও এতটুকু অশৌচের কালো-বোরকা-ঢাকা আলোও নেই। দোকান-পসার থিয়েটার-সিনেমা, হোটেল-রেস্তোরাঁ, সর্বত্র প্রবেশ-পথ মোটা, কালো কম্বলের পর্দায় ঢাকা। ঢুকতে হ'লে পাশের অন্ধকার পথ দিয়ে ঢুকতে হবে। ট্রাম, বাস্ বা গাড়ী-ঘোড়া যে চলেছে, তা শুধু তার শব্দ শুনে

বোঝা যায়। কারো কারো হাতে ছোট ছোট পকেট-টর্চ্, নীল কাগজ দিয়ে তারও মুখ ঢাকা। পথে এমন কি স্বাভাবিক কায়দায় সিগারেট খাবার উপায় নেই, গাঁজার কল্কের ওপর হাত চাপা দেবার মত করে' খাওয়া চলতে পারে। সিগারেট ধরাতে হ'লে জামার ভেতর মুখ লুকিয়ে ফস্ করে' জ্বালিয়েই নিবিয়ে ফেলতে হবে। ধূম-নলের ভেতর দিয়ে যদি আগুন দেখা যায়, সেইজন্যে রাত্রে কয়লার আভেন্ বা চুলা জ্বালানোও শাস্তি-বিধেয়। এক কথায়, এতদিন ধরে' যে ভারশৌ আলোক-বিচ্ছুরণে নক্ষত্রমণ্ডলীকে উপহাস করতো আজ সে তারার আলোর ক্ষীণ দৃষ্টি থেকে আপনাকে অপসৃত করবার জন্যে সর্বাঙ্গে অন্ধকারের কালিমা লেপে যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল।

২৯শে আগষ্ট বিকেলের দিকে ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। দোকানটি প্রাচীন পল্লীতে, ভারশৌএর কেল্লার ঠিক সামনাসামনি। এ পাড়ায় ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের কেক ভীম নাগের সন্দেশ-জাতীয়। তাছাড়া দোকানটির আরো একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা এই যে, অল্পসংখ্যক বাঁধা খরিদারদের জন্যে এখানে পথের দিককার দোতালার বারান্দাটি একেবারে রিজার্ভ্ করা ছিল। আসবাবের আড়ম্বর বা ঢাক্, করতাল, বেহালা, শিঙ্গা (স্যাক্সোফোন্) প্রভৃতির অনৈক্যতানে জ্যাসের খেমটায় ভদ্রজনের কানে তালা ধরিয়ে যুবক-যুবতীর যুগপৎ পদবিক্ষেপের বন্দোবস্ত না থাকলেও, সংসারের ঝামেলা থেকে নিছক শান্তি উপভোগ করবার পক্ষে জায়গাটি প্রশস্ত ছিল। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে, ভারশৌএর প্রাচীন পল্লীর দৃশ্য আর উপনগরী প্রাগার সৌধাবলীর অপ্রতিহত বিস্তার। খানিকটা খোলা জায়গা, তার মাঝখানে স্তম্ভ, স্তম্ভের ওপর ষোড়শ শতাব্দীর রাজা জিগমুন্দ্-এর প্রতিমূর্তি। তার ওধারে ভারশৌএর রাজদুর্গ ধাপে ধাপে একেবারে ভীসলার তীর পর্য্যন্ত নেমে গেছে। ভারশৌএর এই অংশটির তুলনা, প্রাচ্য বা প্রতীচ্য ইউরোপের কোনো সহরেই মেলে না, এক পোলদেশের ক্রাকুফ্-এ ছাড়া।

সেদিন বিকেলে ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের চায়ের দোকানের এই বারান্দাটিতে প্রতিদিনের শান্তি নেই। এতদিন যাদের যুদ্ধে ডাক পড়ে নি, আজ তাদের ডাক পড়েছে। রাস্তায়, দেখতে পাই, বড় বড় বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার প্রথম কয়েকটা কথা বেশ পড়া যায় দূর থেকে—"সার্বজনীন রণসজ্জা!" বিজ্ঞপ্তির সামনে ভিড় জমেছে, সবাই আগ্রহের সঙ্গে পড়ছে, কোথায় গিয়ে ক'দিনের মধ্যে হাজরে দিতে হবে, এই ধরণের নানারকম খুটিনাটি নির্দেশ। জার্মানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এ খবরে সমগ্র পোলজাতি যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে পোলরা দেশের সম্যক্ ও স্বাভাবিক গতিনির্ণয়ে আশ্বস্ত হ'লো। পোল আর জার্মান যে কোনোদিন ভাই-ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ হবে না, এই ধরণের নানা প্রবাদবাক্য-সিদ্ধ ধারণা পোলদের একেবারে মজ্জাগত। গত পাঁচ বছর ধরে' শত্রুর সঙ্গে কৃত্রিম মিত্রতায় পোলদের মনে যে অস্বাস্থ্যকর দ্বৈধ উৎপন্ন হয়েছিল, এবং যা পোলদের দেহমনে অনাত্মীয় পদার্থের অন্তর্নিবেশনে দূষিত রক্তের সৃষ্টি করেছিল, তা এতদিন পরে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হ'লো। ২৯শে আগষ্ট মিতাদ্বয়ের অনুমতিক্রমে পোলদেশে "সার্বজনীন রণসজ্জা" ঘোষিত হ'লো। এতে অন্ততঃ এটুকু বোধগম্য হ'লো যে, তাঁরা আপন আপন মুলুকে জনসাধারণকে কাছা-কোঁচা বাঁধতে অনুরোধ করেছেন।

একটা সদ্য-স্বাধীন জাত আপন স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে যে আকিঞ্চন ও উৎসাহের সঙ্গে হাতিয়ার ধরতে ছুটলো, তা দেখবার মত দৃশ্য। কারো মুখে এতটুকু গ্লানিমার ছায়া নেই। দেশসুদ্ধ পুরুষকে সেইদিনই অথবা অল্পদিনের মধ্যে সংসার, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে' সীমান্তে যেতে হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার পরই, দেখছি, দলে দলে পুরুষ ছোট ছোট বাক্স বা থলে হাতে ঝুলিয়ে কুচ্‌কাওয়াজ করে' হাসির গানে



প্রাচীন-পল্লীর দৃশ্য। ডান-দিকে রাজ-দুর্গের চূড়া। দূরে ভারশৌএর সর্ব্বপ্রধান গির্জা। সাম্‌নে জিগ্‌মুন্দের স্তম্ভ। বাঁদিকে একটু দূরে ভেঙ্গ্যের্‌ক্যেভিচের চায়ের দোকান, ছবিতে নেই।

চোখের জল চেপে, স্টেশনের দিকে চলেছে। আমি যে বিদেশী, এবং পোলদের এই কঠোর দুর্দিনে শূন্য চা-খানায় নিষ্কর্মা হয়ে বসে' বসে' চা খাচ্ছি, এতে বেশ একটু লজ্জা বোধ করছি বৈকি। তবুও আশা ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজরা বা ফরাসীরা হয়তো পোলদেশবাসী আপন আপন প্রজাদের নিয়ে একটা প'ল্টন খাড়া করবে, এবং সেইসূত্রে, জন্মের মধ্যে কর্ম, বাঙ্গালীর ভাগ্যে উর্দি চড়ানো ঘটে' উঠবে। তা যদি নাও ঘটে' ওঠে ত ভাবছি, সাংবাদিক হিসেবে (এর আগেই ও অঞ্চল থেকে কিছুদিন ইউ. পি'র রিপোর্টারগিরি করা গিয়েছিল) সৈনিকদের সঙ্গে শিষ দিতে দিতে, সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সীমান্তে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে। গত মহাযুদ্ধের সময় সাংবাদিকদের সঙ্কটময় জীবনের বিবৃতি পড়ে' রোমান্তিক বাতিকগ্রস্ত বাঙ্গালীপুঙ্গবের এধরণের সখ হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের চা আর পিঠের একটা লক্ষণীয় গুণ ছিল এই যে, তা অল্পক্ষণের মধ্যেই মানুষকে এক অদ্ভুত, আষাঢ়ে, দিবাস্বপ্নে আবিষ্ট করে' ফেলতো। ফিল্‌মের ফিতের মত নিজের স-উর্দি কুচ্‌কাওয়াজ বা কামানের গোলার সুমুখে গাছের তলায় বসে' পোর্টেব্‌ল্ করোনা'র ওপর নিবিষ্টচিত্ত সাংবাদিকের জীবনযাত্রার ছবিগুলো যখন সর্ সর্ করে' চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে, সেই সময় বারান্দার নীচে পাথর-বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়া আর গাড়ী ছোটানোর শব্দ পাওয়া গেল। হঠাৎ মনে হয় যেন জার্মানরা দলে দলে ঘোড়ায় টানা কামান নিয়ে সবেগে সহরে ঢুকছে। কিন্তু রাস্তার লোকের মুখে কৌতুকের ছায়া ও তাদের—"চালাও জোরসে"! "ডি, ডি"! "লে, লে!"—প্রভৃতি উৎসাহবাক্য শুনে সে ভ্রম ভাঙ্গলো। বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে দেখা গেল, বড়রাস্তা জুড়ে, যতদূর দেখা যায়, ঘোড়ার-গাড়ী-দৌড় চলেছে। সহরের ঘোড়ায় টানা মাল-গাড়ী পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে' দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে থামকা

ছুটতে সুরু করেছে, এরকম ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। কিছু পরে শোনা গেল, সরকার থেকে চাষাদের কাছে মালবাহী ঘোড়ার-গাড়ী চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। এবং চাষারা দেশের সেবায় জীবনধারণের একমাত্র সম্বল, লাঙ্গলটানা ঘোড়া আর শস্যবাহী গাড়ী, দুইই অর্পণ করবার জন্যে ছুটে চলেছে, কে আগে সরকারের ঘাঁটিতে পৌছতে পারে! দেশের সেবায় সর্বস্বান্ত হওয়ার প্রতিযোগিতা অন্যদেশে আখছার চোখে পড়ে কি না সন্দেহ। জার্মানদের বড় বড় সেনা ও সামরিক মালবাহী মোটার-বাসের সঙ্গে পাল্লা দেবার পক্ষে এই শকটগুলি যে কী পরিমাণে তাৎপর্য্য-হীন, সেকথা পরে শোনা যাবে।

ভারশোএ যখন যুদ্ধের শেষ তোড়জোড় চলেছে তার অব্যবহিত আগে ও পরে রাষ্ট্রবিধাতাবৃন্দ কীভাবে দিনপাত করছিলেন তার একটা কঙ্কাল-ছবি এখানেই ছকে' দিই। বলা বাহুল্য, তখন ভারশোএ বসে' ঘটনাগুলির বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত কোনো নর-মানুষের দৃষ্টি বা কর্ণগোচর হয় নি। গ্রন্থ-কার স্বেচ্ছায় কবুল করছেন যে, নিম্নলিখিত ঘটনা-পারম্পর্য্য তিনি পোল-জর্মান যুদ্ধের পরে প্রকাশিত নানা পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করেছেন। *

২৩শে আগষ্ট।

রুশ-জর্মান অনাক্রমণ-সর্তের সমসাময়িককালে দান্‌ৎসিকের নবাব ফর্ষ্টার্ স্তাৎস্‌ওবেরহাউপ্ত্ বা বাদ্‌শাহের পদে নিযুক্ত হ'লেন, অর্থাৎ "স্বাধীন নগরীতে" তাঁর ওপরওয়ালা আর কেউ রইলেন না। কাজটা নিতান্ত

*How Hitler made the war—(H. M. Stationery office, London). Notre Combat—(8 Mars 1940, Paris).
Les relations polono-allemandes et polono-sovietiques.—(Flammarion, Paris).

রাষ্ট্র-সংহিতা-বিরুদ্ধ হ'লো। বোঝা গেল, গ্দান্স্ক-এর শাসনকার্য্যে এবার থেকে পোলদের কোনো কথাই খাটবে না।

২৪শে আগষ্ট।

এই ঘটনার এবং গ্দান্স্ক-এ পোলদের ওপর অনুষ্ঠিত নানা অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে বার্লিনে পোল রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত লীপ্স্কি জর্মান রাষ্ট্র-সচিব বারন্ ফন্ ভাইৎস্জ্যেকারের দর্শনপ্রার্থী হন। এঁর অবর্তমানে সেনানায়ক গ্যেরিঙের সঙ্গে লীপ্স্কির যে কথোপকথন হয়, তাতে গ্যেরিং সাহেব আফশোষের সহিত জানান যে, পোলদের সঙ্গে জার্মানীর বন্ধুতার দিন শেষ হয়ে এসেছে, এবং এসম্পর্কে তাঁর দিক থেকে করবার আর কিছু নেই। সেনানায়ক পোল রাষ্ট্রদূতকে ইঙ্গস্থানের সঙ্গে দোস্তী নাকচ করবার সদুপদেশ দেন।

২৫শে আগষ্ট।

তিনমাস আগেকারের পোল-ব্রিতানীয় সখ্যের চুক্তি এতদিন পরে পাঁচবছরব্যাপী পারস্পর সহায়তার সর্তে পরিণত হ'লো, অর্থাৎ যুদ্ধকালে সমুৎপন্নে, পোলদের সত্যিই সাহায্য করা হবে কি না, সেবিষয়ে ব্রিতানীয়া যুদ্ধের ঠিক এক সপ্তাহ আগে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লো। এতদিন যে চুক্তি পারস্পর সহায়তার সর্ত বলে' অখ্বারাদিতে প্রকাশিত হ'চ্ছিল, তা যে পরবর্তী সর্ত ব্যতিরেকে কাগজের টুকরো মাত্র ছিল, সেকথা স্পষ্ট বোঝা গেল।

ঐদিনই হিট্লার মহোদয় ব্রিতানীয় রাষ্ট্রদূত স্যর নেভিল্ হেণ্ডারসন্কে তলব করে' বলেন যেন পরোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তের শান্তিবাণীসহ তৎক্ষণাৎ বিমানপথে লন্দন যাত্রা করেন। শান্তিবাণীর সার মর্ম এই যে, পোলদের ঠাণ্ডা করে' দেওয়ার পর জার্মানীর সঙ্গে ব্রিতানীয় সাম্রাজ্যের মৈত্রীকে শাশ্বত করা হবে। এইসূত্রে ফ্যুরার্ আরো বলেন, তিনি কূটনীতিক নন,

স্বভাবগতরূপে তিনি শিল্পী (! একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তাঁর হাতে একদিন রঙের বাল্‌তি ও বুরুশ্‌ শোভা পেত)—পোলদের ব্যাপারটায় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেলে তিনি জীবনের শেষ ক'টা বছর শিল্প নিয়েই কাটিয়ে দেবেন।

২৮শে আগষ্ট।

স্যর নেভিল্‌ হিট্‌লার মহোদয়কে জানান যে, ব্রিতানীয় সরকার পোল সরকারের কাছে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে, পোলরা জার্মানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনা করতে রাজী আছে। এইসূত্রে, তিনি আশা করেন, ব্রিতানিয়া ও জার্মানীর মধ্যে বোঝাপড়া করবার সুযোগ হবে।

হিট্‌লার প্রসঙ্গক্রমে পোলদের ধ্বংসীকরণের কথাও বলেন।

২৯শে আগষ্ট।

পোলদেশে সার্বজনীন রণ-সজ্জার ঘোষণা।

ফ্যুরার্‌ স্যর নেভিল্‌কে জানান যে, ব্রিতানীয় সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত পোল-জর্মান প্রত্যক্ষ আলোচনায় তাঁর অমত নেই। তবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পোল সরকারের কাছ থেকে পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো রাষ্ট্রদূতকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারকল্পে এসে পৌছানো চাই। সমগ্র চেক্‌ জাতির প্রতিনিধিরূপে (?) হাহা যেভাবে হিট্‌লারচরণে চেক্‌দের দাসখৎ লিখে দিয়ে এসেছিলেন, এই তথাকথিত পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের অবস্থাও যে তাই হবে, পোলদেশে সেকথা সম্যক্‌ উপলব্ধি করবার মত লোকের অভাব ছিল না। তাছাড়া একটা আত্মসম্মানবোধী স্বাধীন জাতকে ঐভাবে হুকুম করা যে অন্ততঃ কূটনৈতিক ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, শিল্পী হিট্‌লারের হয়তো তা জানা ছিল না।

৩০শে আগষ্ট।

ভারশৌএ ব্রিতানীয় রাষ্ট্রদূত স্যর হাউয়ার্ড্ কেনার্ড্ দেশে এই মর্মে খবর পাঠান যে, পোলরা হিট্লার-প্রস্তাবিত রীতিতে মঃ বেক্ বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে বার্লিনে পাঠাতে অসম্মত। কারণ এধরণের অপমান স্বীকার করা অপেক্ষা তারা যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়া অধিক কাম্য মনে করে। উভয় পক্ষের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পোল-জর্মান প্রত্যক্ষ আলোচনা একমাত্র কোনো নিরপেক্ষ দেশ, যথা ইতালিয়াতে, হ'তে পারে।

ঐদিনেই রাত বারোটায় স্যর নেভিল্ ফন্ রিব্বেনত্রপ্‌কে জানান, ইঙ্গ-জর্মান সম্পর্কের উন্নতিকল্পে ব্রিতানিয়া তার অন্যান্য বন্ধুদের স্বার্থের হানী করতে রাজী নয়।

ফন্ রিব্বেনত্রপ্ স্যর নেভিলের সমক্ষে পোলদের সঙ্গে বোঝাপড়া উপলক্ষে তথাকথিত ষোলটি সর্ত হুড় হুড় করে' পড়ে' গেলেন, এবং স্যর নেভিল্ তার নকল চাওয়াতে ফন্ রিব্বেনত্রপ্ তা দিতে অসম্মত হ'লেন। শেষোক্ত ব্যক্তি আরো জানালেন যে, রাত বারোটা বেজে গেল, তবুও পোলরা কাউকে পাঠালে না।

ভারশৌ থেকে বেক্ মহোদয় পোলীয় রাষ্ট্রদূতকে খবর পাঠালেন, যেন তিনি প্রত্যক্ষ আলোচনায় পোলদের সম্মতি জর্মান পররাষ্ট্রসচিবকে জানান। তবে যেন কোনও কারণে কোনো সর্ত-পূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ না করেন। তা হ'লে তাঁর হাহার অবস্থা হবে।

৩১ আগষ্ট।

ঐদিন সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত পোলরাষ্ট্রদূত লীপ্স্কি ফন্ রিব্বেনত্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পান নি। লীপ্স্কি-রিব্বেনত্রপ্ সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই জর্মান রাদিও তথাকথিত ষোলটি সর্ত ঘোষণা করে। শ্রীযুক্ত লীপ্স্কির পক্ষে তখন পোল সরকারের সঙ্গে খবরাখবরের কোনো

উপায়ই ছিল না, কারণ জার্মানরা পোলদেশের সঙ্গে সকল প্রকার যোগাযোগ ঠিক এর আগেই বন্ধ করে' দিয়েছে। এইসূত্রে রাদিও আরো জানালে যে, যেহেতু গত দু' দিনের মধ্যে পোলদের তরফ থেকে কোনো পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এসে পৌছল না, সুতরাং ফ্যুরার্ মনে করেন, পোলরা তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে। এই ষোলটি সর্ত, যা এর কিছুক্ষণ আগে শ্রীযুক্ত লীপ্স্কিকে শোনানো হয়েছিল, এবং মাত্র একদিন আগে ঘোড়দৌড়ের গতিতে স্যর নেভিলের কর্ণগোচর করা হয়েছিল, সেই ষোলটি সর্ত এইবার প্রথম জনসাধারণকে রাদিওযোগে জানানো হ'লো। এই ষোলটি সর্তের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুভুক্ত নয়। সুতরাং সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম না। সুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, পূর্বোল্লিখিত হিট্লারের চারটি দাবীর এ হেরফের মাত্র।

৩১শে আগষ্ট শুতে যাবার আগে কী ভেবে রাদিও বন্ধ করলাম না। এর আগের ক'দিনের সঙ্গে এদিনের ঘটনাবলীর বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। তবুও মনে হ'লো, কী জানি, হিট্লারের জ্যোতিষী যদি ১লা সেপ্টেম্বর দিনটাকে শুভকর্মের উপযোগী বলে' ধার্য্য করে' দিয়ে থাকেন! পাঁজিতে ঐদিন পশ্চিমে ও উত্তরে যাত্রা নাস্তি লেখে বটে, কিন্তু দক্ষিণে ও পূর্বে যাত্রা শুভ। "দ্রাং নাথ্ অস্তেন্" বা পূর্বে অভিযানের পক্ষে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সাল সুপ্রশস্ত। যাই হোক, এই পুণ্যাহে হিট্লার গুরুতর রকমের কিছু একটা করবেন, এ বিশ্বাস যে কোথা থেকে এলো জানি না। রাদিও খুলে রেখেই শুতে গেলাম।

১লা সেপ্টেম্বর ভোরবেলা আধোঘুমন্ত অবস্থায় শুনছি, পাশের ঘর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলছে, "যুদ্ধ! যুদ্ধ সুরু হয়েছে! হালো,

হালো ! যুদ্ধ সুরু হয়েছে !” প্রথমে মনে হ’লো, হয়তো স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু চোখ খুলে বারংবার একই কথা শুনতে শুনতে উপলব্ধি করলাম, পাশের ঘরে রাদিও থেকে খবর আসছে। এ খবরের পূর্বাভাসে মন এতদূর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, যে সত্যিকারের যুদ্ধের সংবাদ শুনেও বিছানা ছেড়ে ওঠবার পর্য্যন্ত উৎসাহ হ’লো না। শুয়ে শুয়েই শুনলাম, সেদিন ভোর হবার আগে থেকে জার্মানরা ক্রাকুফ্‌, ভীল্‌নো, গ্রদ্‌নো, লূদ্‌জ্‌, কাতোভীৎসে প্রভৃতি সহরের ওপর যথেচ্ছ বিমান আক্রমণ করেছে।

গ্যাসের ভয়ে আটেকাঠে বন্ধ শার্শীর ভেতর দিয়ে চোখে পড়লো, কিছুক্ষণ আগেই দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় ছবি এঁটে দেওয়া হয়েছে, স্বস্তিক-আঁকা পাঁচ আঙুলের থাবা পোলদেশ লক্ষ্য করে’ ছুটে আসছে। একটি পোল সৈনিক ঐ পাঞ্জার ওপর প্রাণপণ শক্তিতে সঙ্গীন বসিয়ে দিয়েছে। তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—Wara !—খবর্দার !

এতদিন পরে হিট্‌লারের মুখের ওপর চোপা করবার মত লোক পাওয়া গেল।

W a r a !

১লা সেপ্টেম্বর সুরু হ'লো পোলে জার্মানে দাঙ্গা। একে "যুদ্ধ" বলা চলে না, কারণ তা হ'লে শব্দ ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটবে। "যুদ্ধ" বলতে, "ঘোষণা" কথাটা মনে আপনা আপনিই উঠে থাকে, অন্ততঃ সভ্য মানুষের মনে। গত মহাযুদ্ধের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, তাঁদের স্মরণ থাকা উচিত যে, পঁচিশ বছর আগেও এক জাতি অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ "ঘোষণা" না করে' খামখা পরস্পরের মাথায় ডাণ্ডা চালাতে সুরু করে নি। উপস্থিত মহত্তর যুদ্ধেও এই সামান্য আন্তর্রাষ্ট্রিক তকল্লুফের খিলাফ্ হয় নি। পোলদের সঙ্গে ইংরেজ ও ফরাসীদের যে চুক্তি ছিল, তদনুযায়ে শেষোক্ত উভয় জাতিই জার্মানীর বিরুদ্ধে আইনতঃ যুদ্ধ "ঘোষণা" করে। এমন কি ফরাসীদেশের গণেশ ও'টাবার কয়েকঘণ্টা আগেও ইতালিয়া তার বিরুদ্ধে মহা আড়ম্বরে যুদ্ধ "ঘোষণা" করেছিল। যতদূর স্মরণ হয়, উপস্থিত সংগ্রামে একমাত্র জার্মানীই কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি। বিনা ঘোষণায় যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি কুরুক্ষেত্রের দেশ ভারতবর্ষে—ঢাকায়, বোম্বাইএ, আমেদাবাদে। সুতরাং পোলদের ওপর আচমকা হামলাকে "আমার-গুণ্ডামি"-পরিকল্পিত দস্যুবৃত্তি ছাড়া আর কি বলা চলে?

আধুনিক (!) রণকৌশলে পোলদের একটা মস্ত ভুল হ'লো এই যে, তারা আগে থেকেই ডাণ্ডা চালায় নি, এবং দোস্ত্‌দ্বয়ের সুপরামর্শে লাঠি গুটিয়ে চুপ্‌চাপ্ বসে' রইল যতক্ষণ না জার্মানরা ডাণ্ডা চালায়। "ব্যুলি"-স্বভাব জার্মানদের যতটুকু আমার জানা আছে, তাতে আমার বদ্ধমূল ধারণা এই যে, পোলরা যদি তাদের যৎসামান্য, বিমান-বহর নিয়ে জার্মানীর ওপর খামখা চড়াও হ'তো, তাহ'লে হয়তো আলেমানী জন-সাধারণের ভেতর তা এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করতো, যাতে নাৎসী-রাজের গণেশ ও'ল্টানোও আশ্চর্য্য হ'তো না। কারণ হিট্‌লারের আবির্ভাব থেকে সুরু করে' তখন পর্য্যন্ত এমন ঘটনা ঘটে নি, এবং যে রাজত্বের প্রসাদে জার্মানদের বীয়ার-ভুঁড়ির গর্ভে মদ্যমাংস প্রয়োগের ব্যাঘাত ঘটে, সে রাজত্বকে বরদাস্ত করা জার্মানদের রেওয়াজ নয়। (উপস্থিত সংগ্রামে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিট্‌লার দেশের লোকের মন জোগাবার জন্যে উক্ত দু'টি জিনিষ বরাবরই জুগিয়ে আসছেন)।

যাই হোক্, পোলদের ধারণা হয়েছিল, যুদ্ধটা গত মহাযুদ্ধের মতই ফুট্‌বলী কায়দায় সুরু করা হবে। দু'পক্ষের সৈন্যসামন্ত সীমান্তের দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াবে কাতারে কাতারে, তার পর, দিন বারোটা বা রাত বারোটার সময় (ইতালীয়রা উপস্থিত যুদ্ধেও আগে থেকে নোটিস দিয়ে ১০ই জুন রাত বারোটায় প্রথম কামান দাগে) দু'পক্ষই কামান দেগে জানিয়ে দেবে, তাদের মধ্যে সকল প্রকার মৈত্রীসম্পর্ক কিছু দিনের জন্যে বিচ্যুত হ'লো। সৈনিকরা ভাবলে তারপর আর কী?—চলবে যুদ্ধ, কামান দাগাদাগি, বন্দুক ছোড়াছুড়ি, সঙ্গীন-কিরীচ নিয়ে হাতাহাতি, অশ্বের হ্রেষা, কুচকাওয়াজী গান, রাতে-ভিতে অপেক্ষাকৃত নির্ভীক চাষার মেয়ের সঙ্গে ধারে-কাছের বনবাদাড়ে অভিসার, এমন কি লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ী আসবার ছুটি! তাছাড়া মদ্য-মাংসের

ব্যবস্থা ত আছেই। এক কথায়, গত মহাযুদ্ধের সময় যে সব ঈপ্সিত সামগ্রী বা সুযোগ-সুবিধা এবং উত্তেজনা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে পাওয়া যেত না এবং রণক্ষেত্রে পাওয়া যেত, তা পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা দু'একজন সাধারণ সৈনিকের মনে জাগা আশ্চর্য্য নয়। যুদ্ধ যে একটা মারাত্মক রকমের স্পোর্ট্ এ ধারণাও কারো কারো হয়তো ছিল। এই স্পোর্টে যে অনুপাতে মানুষ আপন জীবনকে বিপন্ন করে, সেই অনুপাতে পায় দুষমনের রক্তপাত করা এবং নিজের মাথা বাঁচানোর উত্তেজনা। ইংরেজ লেখক হাক্স্‌লী বা অল্‌ডিংটন্, ঠিক মনে নেই, মানুষের যুদ্ধবৃত্তিকে ঐন্দ্রিকতার চরমরূপ বলে' বিবৃত করেছেন! সাদিজ্‌ম্ ও মাসোচিজ্‌ম্-এর সংমিশ্রণ হিসেবে যেকোনো প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামাতেই কিয়ৎপরিমাণে ঐন্দ্রিকতা প্রচ্ছন্ন থাকা আশ্চর্য্য নয়। তবে যুদ্ধকামী যেসব পোল পল্টনের সঙ্গে নিকট পরিচয়ের সুযোগ হ'লো অন্ততঃ তাদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ পোলদের পক্ষে এ লড়াই বিলাস বা আদিম পাশবিক বৃত্তিসমূহের চরিতার্থতার লড়াই নয়। পোলদের পক্ষে এ মরণ-বাঁচনের সংগ্রাম। তাছাড়া এ যুদ্ধে যে সমগ্র পোলজাতির অস্তিত্ব এবং আত্মসম্মান নিরূপিত হবে, একথা সামান্য সৈনিকের ও অজানা ছিল না। পোলদের ভুলচুক যা ঘটেছিল তা যুদ্ধের উদ্দেশ্য বিষয়ে নয়, তার রীতি ও নীতি-বিষয়ে। ফল কথা, পোলরা আশা করেছিল, আবহমান কাল ধরে' যে ধরণে যুদ্ধ হয়ে আসছে, এ যুদ্ধও অল্পবিস্তর সেই ধরণেই হবে। সুতরাং তারা খাঁটি স্পোর্টস্‌ম্যানের মত দলে দলে সীমান্তে গিয়ে হাজির হ'লো।

ভারশৌ ক্রমে নিষ্পুরুষ হয়ে আসছে। সহরে যারা আছে তাদের অধিকাংশই বাল-বৃদ্ধ-বনিতা। দেশের আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার জন্যে

হাতিয়ার, গোলা-বারুদ, যন্ত্রপাতি এবং উড়োজাহাজ যা আছে তা দিয়ে উৎকৃষ্ট সামরিক যাদুঘর সাজানো যায় বটে, তবে শত্রুর সঙ্গে যোঝবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। চেকো-স্লোভাকিয়া অধিকৃত হবার পর পোল-জর্মান সীমান্ত হয়ে দাঁড়াল ১৬০০ মাইল, অর্থাৎ সমগ্র পোল সীমান্ত-রেখার প্রায় অর্দ্ধেক। তাছাড়া রুশ সীমান্তেও সৈন্য মোতায়েন রাখতে হ'লো। সুতরাং সুদীর্ঘ এবং অরক্ষিত, অনবহিত পোল-জর্মান সীমান্তের সংরক্ষণে কত সৈন্যের প্রয়োজন হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। পোলরা যখন ক্ষত্রিয়ের মত, শহীদের মত সম্মুখ-যুদ্ধে আত্মবলি দেবার জন্যে দলে দলে সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে হাজির হয়েছে, তখন তাদের মাথা ডিঙিয়ে তাদের সংসার, স্ত্রী-পুত্র, ভিটেমাটির উচ্ছেদ করবার জন্যে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে জর্মান বিমান-বাহিনী।

এ ত গেল পোল-জর্মান যুদ্ধের নৈতিক মূল্য-নির্দ্ধারণ। এখন ১লা সেপ্টেম্বর দু'পক্ষের শক্তির অনুপাতটা কী ধরণের হ'লো তার মোটামুটি দু'চারটে অঙ্ক আপনাদের চোখের সামনে ধরি।

পোলপক্ষে—২২ ডিভিজন পদাতিক, ৮ অশ্বারোহী ব্রিগেড্, ১ মোটার ব্রিগেড্, উড়ো জাহাজ ৪০০।৫০০।

জর্মান পক্ষে—৭৩ ডিভিজন পদাতিক, ১ অশ্বারোহী ব্রিগেড্, ১৫ মোটার ও আর্মার্ড্ ডিভিজন, উড়োজাহাজ ৫০০০।

সুধু তাই নয়, নামে ডিভিজন হ'লেও পোল ডিভিজন শক্তিতে জর্মান ডিভিজনের প্রায় অর্দ্ধেক। উদাহরণস্বরূপ—

১ জর্মান পদাতিক ডিভিজন=৮৪ কামান, ১৩৬ কল-বন্দুক, ৫৪ ট্রেঞ্চ্-মর্টার, ৫৪ ট্যাঙ্ক্-শিকারী কামান।

১ পোল পদাতিক ডিভিজন=৪৮ কামান, ৬০ কল-বন্দুক, ১৮ ট্রেঞ্চ্-মর্টার, ২৭ ট্যাঙ্ক্-শিকারী কামান।

বলা বাহুল্য, অঙ্কগুলি যুদ্ধের পরে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত। অঙ্কের হারে পোল-জর্মান শক্তির অসমতা যা চোখে পড়ে, বাস্তবিক পক্ষে তা আরো অধিক ছিল। কারণ যে সময়ে পোলদেশে সার্বজনীন রণসজ্জা ঘোষিত হ'লো, তখন সমস্ত আহূত ব্যক্তির হাতে হাতিয়ার দেওয়া দূরে থাকুক্, এমন কি তাদের উর্দি পরাবারও সময় নেই। সুতরাং যুদ্ধক্ষম পুরুষদের অর্দ্ধেকও রণসাজে সজ্জিত ত হ'লোই না, উপরন্তু যারা অঙ্গে উর্দি এবং হাতে হাতিয়ার পেলে তারা যে কীভাবে ছন্নছাড়া হয়ে, ভাগাবন্দের মত দেশময় আপন আপন পল্টনের খোঁজে পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তার বিবরণ পরে পাওয়া যাবে। ইতিহাসের যদি সত্যকথা বলা অভ্যাস থাকে ত অসম্পূর্ণ রণসজ্জা-হেতু পোলদেশের এই শোচনীয় ছত্রভঙ্গ অবস্থার জন্যে তার মিতাদ্বয়কে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে দোষী সাব্যস্ত করবে, সন্দেহ নেই। বন্ধুদ্বয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করে' পোলরা যদি আগেভাগেই জার্মানদের মত বেপরোয়া হয়ে লাঠি-সোঁটা আর লাঠিয়াল জোগাড় করে' রাখতো, তা হ'লে রণধর্মী, ক্ষাত্র-মনোভাবাপন্ন পোল সৈনিক ও সুসংহত, সুব্যবস্থিত পোল সেনার পক্ষে জার্মানদের বিরুদ্ধে অন্ততঃ মাস ছয়েক বা বছর খানেক যুদ্ধ চালানো সম্ভব হ'তো। ফরাসীদেশের পতনের উদাহরণ দিয়ে পোলদের পিঠ চাপড়ানোর পক্ষপাতী আমি নই। কারণ ফরাসীরা এ সংগ্রামে "ডুএল" বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে "দ্বিতীয় ব্যক্তি"র সামিল। আসল যুদ্ধটা যে পোলে-জার্মানে তা ভুললে চলবে না। এবং এই "ডুএলে" আত্মসম্মানবোধী, সংহত পোলরা যে অপর পক্ষকে দস্তুরমত ঘায়েল করতো সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই।

পোল-জর্মান শক্তির অসমতার প্রথম এবং মুখ্য রূপ প্রতীয়মান হ'লো উভয় পক্ষের বিমান-বাহিনীতে। জর্মান পক্ষে ৫০০০—পোলপক্ষে ৪০০।৫০০। অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, পোলরা আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি

পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশকে বিমানপোত সরবরাহ করে’ এসেছে। এর কারণ, কেউ কেউ সন্দেহ করে, কর্তাদের মধ্যে হয়তো কোনো ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা। আমার মনে হয়, পোলরা শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতো না যে, বজ্র-অভিযান সত্যিই ব্লিৎসি কায়দায় চালানো কোনো সুসভ্য জাতির পক্ষে, এমন কি দুঃস্বপ্নেও সম্ভব হ’তে পারে। কাজেই তারা “বিলাসের” সামগ্রী, উড়োজাহাজ বেচে “কাজের” জিনিষ বন্দুক-হাতিয়ার, গোলা-বারুদ প্রভৃতি কেনাই সুবিবেচনার কাজ হবে, মনে করেছিল।

ক্ষত্রিয় পোলরা তখনো উপলব্ধি করে নি যে, এ সংগ্রামে ক্ষাত্রধর্মের স্থান নেই।

১লা সেপ্টেম্বর।

সারা সকাল আর দুপুর বাড়ীতে বসে' কাটলো। বাইরে বেরিয়ে, যাবার মত জায়গা নেই। বন্ধু-পরিচিতেরা প্রায় সবাই যুদ্ধে গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনো গরমের ছুটি চলেছে। নিস্পুরুষ ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের চায়ের দোকানে বা সাধারণ গ্রন্থাগারে গিয়ে বসবার মত সাহস পাই না। সুতরাং বাড়ীতে বসে' সম্প্রতি লেখা একখানা বই মেজেঘসে ছাপাখানায় পাঠাবার জন্যে তৈরী করছি। তাছাড়া অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষামন্ত্রিত্বের কাছ থেকে আগেই নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল, যুদ্ধের সময়ে আমাদের কর্তব্য এমনভাবে জীবনযাপন করা যাতে মনে হয়, যুদ্ধ হ'চ্ছেই না। লড়াইএর হিড়িকে ফ্ল্যাটের এমন অবস্থা হয়েছে যে, বাড়ীতে বসে' আছি কি চোরবাজারে বসে' আছি, তা দস্তুরমত ভেবে উপলব্ধি করতে হয়। শোবার ঘরের জান্‌লায় বিছানার গদি আর তোষক ঝুলছে, যাতে বোমার আওয়াজে ভাঙ্গা কাচের টুকরো এসে এই অধমকে ঘুমন্ত অবস্থায় জখম না করতে পারে। এ ঘরে জড়ো হয়েছে যতরাজ্যের বাজে জিনিষ, আর জুতো, ছাতা, থালা, গেলাস, ফার্‌-কোট, টুপি, সুট্‌-কেস্‌ এবং সখের এটা, ওটা, সেটা। খাবার ঘর হয়েছে বইয়ের গুদাম। তাকের ওপর

থাকে থাকে বই প্রায় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে। বাদবাকী মেঝের ওপর গাদা করা। খাবার ঘরে জান্‌লার ধারে একটু জায়গা করে' নিয়ে মেশিনের ওপর কাজ চালাচ্ছি। স্বয়ং লাইব্রেরী ঘরকে করা হয়েছে গ্যাসের আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে "আশ্রয়"। সেখানে আলো হাওয়া বলে' যে দু'টি "ভূত" আছে তার নামগন্ধও নেই—অন্ধকার, শূন্য ঘরে সুধু রাদিও-যন্ত্রের মিটমিটে একটুখানি আলো। এবং ঘোলাটে অন্ধকারের গর্ভ থেকে আসছে বক্তার কণ্ঠস্বর।

কথা যা শুনি তার বিন্দুবিসর্গও বোঝবার যো নেই। সুধু উপলব্ধি করি ঘন-ঘন, থেপে-থেপে বিমান-বাহিনী পোলদেশের সীমান্ত অতিক্রম করছে এবং রাদিও-যোগে দেশরক্ষীদের তা জানিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। বোঝা গেল, সমস্ত দেশটাকে ছক কেটে এক একটি বিভাগের এক একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও সংখ্যা নিরূপিত করা হয়েছে। তবে কোথায় যে সেসব অঞ্চল তা বোঝবার উপায় নেই। চলেছে বিরামহীন সতর্কতা-বিজ্ঞপ্তি।

হালো, হালো! সাবধান, সাবধান! আসছে! কু মা ২৫, দো রে ৫৭। এসে পড়েছে! কু মা ২৫, দো রে ৫৭। ইত্যাদি।

এই ধরণের সাঙ্কেতিক সতর্কতা-বিজ্ঞপ্তি শুনে মনে হ'লো সমগ্র পোলদেশের ভেতর হাজারে হাজারে উড়োজাহাজ একসঙ্গে বা কয়েক মিনিটের ব্যবধানে যেখান দিয়ে সেখান দিয়ে পঙ্গপালের মত পিল্‌পিল্‌ করে' ঢুকতে সুরু করেছে। বক্তার গলা কখনো পুরুষের কখনো স্ত্রীলোকের। পুরুষের গলা সুসংযত, অবিচলিত। কিন্তু গান বা বাজনার রেকর্ড্‌ হঠাৎ বন্ধ করে' দিয়ে সতর্কতা-বিজ্ঞপ্তি পাঠাবার সময়ে বেচারী ভদ্রমহিলার যে সামান্য আত্মসংযমের বিচ্যুতি ঘটেছে তাতে বেশ বোঝা যায়, আক্রমণগুলো নেহাৎ মোলায়েম হ'চ্ছে না।

ভারশৌএ তখনো সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার

এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নি। জান্‌লা দিয়ে দেখি, ঝি-চাকরাণী, বাড়ীর গিন্নী বাজারের থলী হাতে রোজকার মতই ঐ সরু গলিটার ভেতর দিয়ে চলেছে, তবে তার চলার গতি যেন একটু দ্রুততর। রাস্তায় ঠেলা-গাড়ী বোঝাই রাশ রাশ তোমাতো আর শসা নিয়ে সব্জী-ওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে, "পমিদরী, পমিদরী—অগূর্‌কি, অগূর্‌কি!" আশপাশের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ইহুদী "শিশি-বোতল-বিক্রী" রোজকার মতই ভাঙ্গা, কাঁপা গলায় হাঁকছে—"হান্দেল, হান্দেল, হান্দেল!" শুনতে পাই পাতালফোঁড় আর মাছ-ওয়ালীর চিরপরিচিত রব—"গ্‌ঝ্যীবী, গ্‌ঝ্যীবী, গ্‌ঝ্যীবী—র‍্যীবী, র‍্যীবী, র‍্যীবী!" শুনতে শুনতে মনে হয়, কোথায় যুদ্ধ, কোথায় বোমারুর হাম্‌লা! রাদিও-নিঃসৃত বিরামহীন—কু মা ২৫, দো রে ৫৭, আসছে, আসছে, সাবধান, সাবধান, এসে পড়েছে, কু মা ২৫—মনে হয় পাগলের প্রলাপবাক্য।

হঠাৎ সহর কাটিয়ে উঠলো আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তির আর্তনাদ। দূরে কারখানার ভোঁ, এবং সহরের বাড়ীতে বাড়ীতে রাদিও থেকে বিকট চীৎকারে জানিয়ে দিলে শত্রুপক্ষীয় বিমান-বাহিনী সহরের খুব কাছে এসে পড়েছে। রাদিওতে বক্তার গলা শোনা গেল—

হালো, হালো, সাবধান, সাবধান! ভারশৌএ বিমান-আক্রমণ! হালো, হালো, সাবধান, সাবধান!

এক নিমেষেই রাস্তার লোকচলাচল বন্ধ হয়ে গেল। কোথাও জীবনের সামান্য স্পন্দন পর্য্যন্ত শোনা যায় না। সুধু দূরে দূরে বোমা ফেলার শব্দ আর বোমারু-শিকারী কামানের একঘেয়ে কাটা-কাটা আওয়াজ—পা-পা-পা-পা-পা! পা-পা-পা-পা-পা! তার সঙ্গে বোমারুর গর্জন। মনে হ'লো, দূরে কোথাও দু'পক্ষের বিমান-পোতে ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হ'লো, শত্রুপক্ষীয়রা ফিরে গেল।

এই ধরণের আক্রমণ চললো সারা সকাল আর দুপুর ধরে'। তাতে নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামান্যও ব্যাঘাত ঘটলো বলে' মনে হ'লো না। ঝি ঠিক সময় মত এগারোটায় কাফি এবং দুপুরবেলায় পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সাজিয়ে দিয়ে গেল। এমন কি ছুটির দিনের দিবানিদ্রাটুকুও বাদ গেল না।

বিকেলের দিকে আমার একটি পরিচিতা দেখা করতে এলেন, তাঁর সঙ্গে পছন্দ করে রাদিও কিনতে যেতে হবে। বাড়ীতে রুগ্ন স্বামী, তিনি নিজে সারাদিন কাজ করেন আফিসে। সুতরাং বিপৎকালে নগরবাসী-দের কী করা উচিত, তা তাঁর স্বামীকে জানাবার কেউ নেই। বিশেষতঃ শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করে' নগরবাসীদের নিরপত্তার জন্যে রাদিও থেকে যে খবর দেওয়া হয়, তা যুদ্ধকালে অপরিহার্য্য এই অতি সহজ কারণে যে, আক্রমণ সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ নানা পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্র থেকে সর্বাগ্রে এসে হাজির হয় রাদিও-আফিসে, এবং সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ নিরাপত্তা-বিষয়ক সকল প্রকারের খুটিনাটি নির্দেশ পাঠানো হয় নগরবাসীদের কাছে প্রত্যক্ষরূপে। সেই জন্যেই যুদ্ধের সময়ে সর্বক্ষণ রাদিও খুলে রাখতে অনুরোধ পাওয়া গিয়েছিল সরকার থেকে। আক্রমণের সময়ে বাড়ী ছেড়ে "আশ্রয়ে" যাবার দরকার আছে কিনা, সে কথাও রাদিও থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া সহরের ঠিক কোন্ পাড়ায় বোমা পড়ছে তারও খবর পাওয়া যায়, যাতে টালিগঞ্জে বোমা পড়লে, বেলেঘাটার লোকেরা অকারণে আতঙ্কিত না হয়ে ওঠে। এখানে অবান্তর হ'লেও, আপনাদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করি যে, যুদ্ধকালে সমুৎপন্নে, রাদিও জিনিষটি একেবারে অপরিহার্য্য।

ভদ্রমহিলার হাতে বিকেল-বেলাকার কাগজ দেখলাম। দুপুরে কোথায় কোথায় বোমা পড়েছে তার হিসেব দেওয়া হয়েছে, এবং তার

সঙ্গে সহরতলীর বোমা-বিধ্বস্ত দু'একখানা বাড়ীর ছবিও বেরিয়েছে। সেই প্রথম চোখে পড়লো, বোমার চোটে বড় বড় ইমারতের কী অবস্থা হয়। বাড়ীর বাইরের দিকের আধখানা কে যেন পাঁউরুটির চাক্‌লার মত কেটে নিয়েছে। বোরকা-বিচ্ছিন্ন অন্তঃপুর যেন মরিয়া হয়ে ধৃষ্টার মত আত্মপ্রকাশ করছে। কত মানুষ, স্ত্রীলোক আর শিশু, মারা পড়েছে, তারও একটা মোটামুটি আন্দাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ছবিমাত্র, তাকে বাস্তব বলে' বিশ্বাস করতে মন তখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি।

বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরী হ'চ্ছি, এমন সময়ে আবার আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তির আর্তনাদ। এবার আক্রমণটা খুব কাছে বলে' মনে হ'লো, কারণ বোমারুর গর্জন বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, খুব উঁচুতে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনের মত বোমারু এগিয়ে আসছে। নীচের দিকে নামবার সাহস নেই তাদের, কারণ তাদের লক্ষ্য করে' বোমারু-শিকারী কামান ক্রমাগত অগ্নি-উদ্‌গার করে' চলেছে। চোখের নিমেষে খানদুই-তিন হালকা লড়িয়ে উড়োজাহাজ পোলপক্ষ থেকে ছুটলো শত্রু-বাহিনীকে লক্ষ্য করে'। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তারা সোজা ওপর দিকে উঠে গেল, ঠিক হাউইয়ের মত। বিমান-সৈনিকদের পরীক্ষা দেবার সময় এসেছে। ওপরে উঠে তারা একেবারে শত্রু-বাহিনীর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার পর সুরু হ'লো ঝটাপটি। তুলনা দিতে হ'লে মনে হয়, এক ঝাঁক শকুনের মাঝখানে গুটি দুই তিন চড়াই পাখী। নীচে থেকে অন্ততঃ তাদের তাই বলেই মনে হয়। শকুনরা ছোঁ মারতে আসে, চড়াইরা লাট খেয়ে, পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যায়।

এ ধরণের লড়াই সেদিন প্রথম চোখে পড়লো। লড়াই দেখবার জন্যে পুলিস এবং নগররক্ষীদলের বারণ অগ্রাহ্য করেও পথে লোক জড়ো হয়ে

গেল। জার্মানরা চড়াইদের আক্রমণে অস্থির হয়ে উঠে কল-বন্দুক ছুড়তে আরম্ভ করেছে। তার গুলিতে সহরের লোকের প্রাণ যাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক! তবুও কে শোনে কার কথা? পাহারাওয়ালারা নিজেই উট-মুখো হয়ে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে লাগলো। যুদ্ধ চললো বেশ খানিকক্ষণ। তারপর পোল উড়োজাহাজের গুলি খেয়ে হঠাৎ একখানা জর্মান বোমারু দাউ দাউ করে' জ্বলে' উঠলো। শূন্যে পাক খেতে খেতে সেখানা চোখের নিমেষে মাটিতে পড়লো, সহরতলীতে, আমাদের বাড়ী থেকে অন্ততঃ ক্রোশ দুই দূরে। মাটিতে পড়তে পড়তেই তার পেটে যতগুলি বোমার ডিম পোরা ছিল, সবগুলি একসঙ্গে ফেটে গেল। সবগুলি বোমা একসঙ্গে ফাটার শব্দে আমাদের বাড়ীটা পর্য্যন্ত থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো! সুতরাং সহরতলীর যেখানে জ্বলন্ত জাহাজখানা গিয়ে পড়লো সে পাড়ার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সঙ্গীদের মধ্যে একজনের মৃত্যুতে বাদবাকী জাহাজগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালো। পথে যেতে যেতে যেখানে সেখানে পেট খোলসা করে' বোমার ডিম পাড়তে পাড়তে গেল। কারণ বোমারু জাহাজের গঠন এমন যে, সব ক'টি বোমা না ঝেড়ে দিয়ে তার মাটিতে নামবার উপায় নেই। তা হ'লে নামবার সময় ঝাঁকুনিতে বোমা ফেটে চোখের নিমেষে বোমারুখানিকে নিশ্চিহ্ন করে' দেবে। বোমাগুলো পড়লো সহরের বাইরে, না হ'লে এই ক'মিনিটেই তা যে কত হাজার লোকের প্রাণ-সংহার করতো তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম পোল বিমান-সৈনিকদের সাহস ও রণচাতুর্য্য। ইংরেজী বিমান-বাহিনীর অংশরূপে আজ যে পোলরা জার্মানীর ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিচ্ছে, এবং তার সুখ্যাতি আখ্‌ছার শুনতে পাচ্ছি স্বল্প-প্রশংসী ইংরেজদের মুখে, সেই পোলদের হাতে অন্ততঃ হাজার দুই উড়োজাহাজ থাকলে জার্মানীর অবস্থা আজ কী হ'তো তাই ভাবি!

যাই হোক, পরিচিতা মহিলাটির সঙ্গে রাদিও কেনবার জন্যে বাইরে বেরুনো গেল। আগে যেমন ফস্ করে' আল্না থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে এক নিমেষে বেরুনো যেত, এখন আর তা চলে না। নগরবাসীদের পুনঃ পুনঃ সাবধান করে' দেওয়া হয়েছে, যেন বাইরে বেরুবার আগে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই "গ্যাস্-মুখোস" এই কথাটি প্রণব-অক্ষরের কাজ করে। বলা বাহুল্য, সহরবাসীদের মধ্যে গ্যাস্-মুখোসের গর্ব করতে পারে এমন লোক খুব বেশী নেই। দু'এক দিন আগে ব্রিতানীয় কন্সুলাতে টেলিফোঁ-যোগে খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, সৌভাগ্যবান ব্রিতানী প্রজাদের জন্যে মুখোস পোলদেশে পৌছতে পারবে বলে' বিশ্বাস হয় না, তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। অবশেষে পরদুঃখকাতর এই ভদ্রমহিলাটির কৃপায় অনেক সুপারিশ ও কর্ম্মচারীদের অনেক আভ্যন্তরীণ অসাধুতার জোরে এর এক দিন আগে আন্কোরা নতুন একটি গ্যাস্-মুখোস এসে আমার পোষাকের আল্না অলঙ্কৃত করছিল। সেটিকে যজ্ঞোপবীতের মত কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরুনো গেল।

পথে যান-বাহনের ঝঞ্ঝাট নেই। মোটার, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি যাকিছু চাকা-ওয়ালা জিনিষ ছিল, তা প্রায় সবই যুদ্ধে গেছে। সুধু ঘড়ঘড়িয়ে ট্রাম চলেছে থেকে থেকে, তাতেও মানুষ বেশী নেই। সহরের ভেতর দিয়ে হেঁটে চললাম। বারংবার বিমান-আক্রমণেও পথ-চলা মানুষের মুখে কোনো উদ্বেগের ছায়া পড়ে নি। হঠাৎ দেখা গেল, মাথার ওপর খুব উঁচুতে ফট্ ফট্ করে' বোমারু-শিকারী কামানের গোলা ফাটছে, এবং একেবারে মেঘের ওপরে কয়েকখানা বোমারু। নীচে থেকে তাদের অস্তিত্ব চোখেই পড়ে না। মাথার ওপরে যুদ্ধ চলেছে, অথচ এখন আর মানুষ তার দিকে তাকিয়েও দেখে না।

রাদিওর দোকানে বড় একটা যন্ত্র থেকে যুদ্ধের খবর আসছে; তা শোনবার জন্যে রাস্তায় লোক জমে গেছে। জানা গেল, জার্মানরা ভোর চারটের সময় তিন দিক দিয়ে পোল সীমান্ত অতিক্রম করে, এবং চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই প্রায় সমগ্র পোলদেশের ওপর এসে হাজির হয়। বড় বড় সহরে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যা আছে, তাতে জার্মানরা সেসব অঞ্চলের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। তবে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান ছোট ছোট সহর, এবং গ্রাম ধ্বংস করতে সুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বড় সহরের কাছে না আসতে পেরে, খুব উঁচু থেকে তারা যেখানে সেখানে বোমা ফেলেছে। এই সঙ্গে লন্দন থেকে আরো খবর দেওয়া হ'লো, যদিও ফরাসী ও ইংরেজরা এখনো যুদ্ধে নামে নি, তত্রাচ পোলদের নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। জনসাধারণকে একথাও স্মরণ রাখতে অনুরোধ করা হ'লো যে, ব্রিতানী সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটি, এবং পোলরা এই পঞ্চাশ কোটি নরনারীর সহানুভূতি ত ভোগ করছেই, উপরন্তু অচিরে এদের প্রকাশ্য সাহায্য পাবারও আশা করতে পারে। এই পঞ্চাশ কোটি নরনারীর মধ্যে যে পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতীয়ও আছে, একথা মনে হওয়াতে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। অনেক দিন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। তাই এই পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর প্রকাশ্য সাহায্য দানের খবর শুনে অনুমান করলাম, হয়তো যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে এতদিন পরে ইঙ্গস্থান ও হিন্দুস্থানে একটা চলনসইগোছের বোঝাপড়া হয়েছে, তা না হ'লে এই যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে ভারতীয়দের টানা হ'লো কী করে' ?

রাদিওর দোকান থেকে যখন ফিরলাম, তখন বেশ গা-ঢাকা হয়ে এসেছে, আব্ছা অন্ধকারে পথ-চলা পাশের মানুষকে ঠিক চেনা যায় না। বিকেল থেকে ভারশৌএর ওপর আর আক্রমণ হয় নি, তাই অনেকেই

আত্মীয়-বন্ধুদের খবরাখবর করবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছে। সুতরাং পথে ভিড় কম হয় নি। বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখলাম, ভিড় ঠেলে ষণ্ডামার্কা কে একজন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছে এবং তার পশ্চাদ্ধাবন করছে পিস্তল উঁচিয়ে তিন চার জন পাহারাওয়ালা। পাহারাওয়ালাদের "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো! গোলী মারেগা!"-প্রভৃতি শব্দে হঠাৎ মনে হয়, লোকটা চোর-ডাকাত কেউ হবে। কিন্তু পাহারাওয়ালারা যখন তাকে ঘেরাও করে' ধরে' ফেললে, তখন শোনা গেল, এই ষণ্ডামার্কা ব্যক্তিটি একটি হৈট্‌লার, পোলদেশ-প্রবাসী জার্মান। প্রাচীন পল্লীর ঘিঞ্জী পাড়ায় বাস, ব্যবসা মিস্ত্রিগিরি বা ঐ ধরণের একটা কিছু। লোকটা সুধু নামে জার্মান, আসলে পুরুষানুক্রমে এদেশে বাস করবার ফলে তার জার্মানত্ব কিছুই নেই, এমন কি জর্মান ভাষা পর্য্যন্ত সে জানে না। এও শোনা গেল যে, লোকটা নিজেকে সর্ববিষয়ে খাঁটি পোল বলে' পরিচয় দিত। আজ তার প্রতিবাসীরা হঠাৎ আবিষ্কার করলে, এ ব্যক্তি ভাষায় এবং আচারে-ব্যবহারে পোল হ'লেও হিট্‌লারের একজন গুপ্তচর। কিছুক্ষণ আগে তাকে হাতেনাতে ধরে' ফেলা হয়েছে। সহরের ভেতর যখন অন্ধকার ছম্‌ছমিয়ে আসছে, তখন এই লোকটি শত্রুপক্ষীয় বিমান-বাহিনীকে ভারশোএর অস্তিত্ব-জ্ঞাপক সঙ্কেত দেবার জন্যে নিজের জান্‌লা থেকে চুপি চুপি একটি আতস-বাজি আকাশে পাঠায়।

হিট্‌লারী গুপ্তচরদের ব্যবহারের জন্যে এ ধরণের আতস-বাজি পরেও অনেকবার চোখে পড়েছে। সাধারণতঃ, কোথা থেকে তাকে ছাড়া হ'লো তা হঠাৎ বোঝা যায় না। কারণ আকাশে ওঠবার সময়ে হাউইয়ের যেমন একটা জ্বলন্ত রেখা-পথ দেখা যায়, এ আতস-বাজির সেরকম কোনো প্রকট গতি-চিহ্ন লক্ষিত হয় না। হঠাৎ সে অন্ধকার আকাশের বুকে শুক-তারার মত জ্বল-জ্বল করে' জ্বলে ওঠে। এই শুক-তারাটি আকাশে থাকেও

বেশ খানিকক্ষণ, যাতে শত্রুপক্ষীয়েরা তার আলো ও আকার দেখে আক্রমণীয় স্থান সম্বন্ধে বিশদ ধারণায় উপনীত হ'তে পারে। প্রাচীন পল্লীর এই গুপ্তচরটিরও ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা থাকতো না যদি না সে আপন দুষ্কর্মে অনভ্যাসবশতঃ বাড়ী ছেড়ে হন্ত-খন্ত অবস্থায় ছুটে পালাতে প্রয়াস না পেত। পাহারাওয়ালারা পাক্‌ড়াও করে' তাকে নিয়ে চললো, নিঃসন্দেহ যুদ্ধের সময়ে গুপ্তচরদের যেখানে পাঠানো হয়, সেই মুলুকের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে লোকটার স-গুল দেহ বুলেটের ঘায়ে ধরাশায়ী হ'বে, সেকথা মনে হওয়ায় তার জন্যে যে একটু দুঃখ হ'লো না, তা নয়। তবে আশ্চর্য্য হ'লাম, পথের জনতা তাকে চাঁটিয়ে খুন করলে না, যেমন অন্য যেকোনো দেশে আশা করা যেত, জার্মানীতে ত নিশ্চয়ই।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোনো রকমের শ্রমসাধ্য কাজই করা হয় নি, অথচ বাড়ী ফিরে দেহমনে ভারী একটা অবসাদ অনুভব করলাম। সারাদিনের উত্তেজনা অলক্ষিতে স্নায়ুগুলোর ওপর স্তরে স্তরে শ্রান্তির পলি রেখে গেছে। আবার রাদিও খুলে বসলাম। যুদ্ধের খবর দেওয়া হ'চ্ছে। জানা গেল, জার্মানরা সারাদিন ধ'রে বহু গ্রাম আর সহর ধ্বংস করেছে এবং বোমা ফেলবার সময় সামরিক কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে' বোমা-বর্ষণের প্রয়োজন বোধ করে নি। মরেছে হাজারে হাজারে অসামরিক নাগরিক, বাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এইসূত্রে খবর পাওয়া গেল, পোলদেশের কামাখ্যা, চেঁস্তোহোভার মারীয়া-দেবীর মন্দির বিধ্বস্ত হয়েছে, এবং শত শত বছর ধরে' লক্ষ লক্ষ পোলের অর্চনা-অভিষিক্ত মারীয়ার প্রতিমূর্তিখানি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পোলরা যাতে ব্যথা না পায়, সে জন্যে খবরটা ইতালীয় ভাষায় দেওয়া হ'লো সমগ্র জগতের জনসাধারণের উদ্দেশে। ভারতীয় হিসেবেও খবরটা শুনে একটু বিচলিত হ'লাম। হাজার হাজার পোল নরনারী পঞ্চাশ, ষাট বা শতাধিক ক্রোশ পায়ে হেঁটে, সঙ্কীর্তন করতে

করতে চেঁস্তোহোভায় তীর্থ করতে চলেছে, এ দৃশ্য যখন মনে পড়লো, তখন পোলদের এই আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল, যেখানে লাখে লাখে পোল বস্তুবাদের তাড়নায় মা মারীয়ার বুকে মুখ লুকিয়ে শান্তি পেত, সেই মাতৃ-ক্রোড়ের অবমাননায় হয়তো ক্ষণিকের জন্যে নিজের মনে বহু প্রাচীন হিন্দুত্বের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম—সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদযানি বঃ।

রাদিওতে আরো একটা খবর পাওয়া গেল, যার উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করতে চাই। পোলজাতির এবং পোলদের পোলীয়তার কঠোর অগ্নিপরীক্ষা চলেছে গ্দান্স্ক বা দান্ৎসিক্ সহরে। গ্দান্স্কে ভেস্তের-প্লাত্তে নামক পল্লীতে পোলদের একটা শস্ত্রাগার ছিল। প্রসার তার খুব বিস্তৃত নয়, এবং তা রক্ষা করবার জন্যে সৈন্যসামন্তও খুব বেশী ছিল না। জার্মানরা তা দখল করবার জন্যে সমুদ্রের দিক থেকে অবিরত গোলাবর্ষণ করছে। এই অল্পসংখ্যক পোল সৈনিক মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও দেশাত্মবোধ ও সম্মানের সংরক্ষণে শস্ত্রাগার পরিত্যাগ করে নি। সারাদিন ধরে’ যুদ্ধ চলেছে, রাত্রেও তার অবসান হয় নি। পোলরা সমানে আত্মরক্ষা করছে, যদিও তাদের সংখ্যা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাদের সাহায্যকল্পে বাইরে থেকে সৈন্য পাঠানোর উপায় নেই, কারণ জার্মানরা চারদিক থেকে তাদের ঘেরাও করেছে।

ঠিক এই সময়ে সেনানায়কের নিজের মুখ থেকে আশ্বাসবাণী পেলে হয়তো এই অল্পসংখ্যক সৈনিক আরো কিছুদিন যুঝতে পারতো, এবং তাতে সমগ্র পোল সেনার “মরাল” যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেত। ভেস্তেরপ্লাত্তে থেকে যখন সৈনিকদের বীরত্বের কথা দেশময় প্রচারিত হ’চ্ছে, সেই সময়ে শ্মীগ্লি-রীদ্জ্ রাদিও-যোগে তাদের একটা সামান্য উৎসাহবাক্যও দিলেন না। রাদিওর সংবাদদাতা স্থধু নিতান্ত

লৌকিকতাপূর্ণ গোটাকয়েক শিষ্ট শব্দ সেনানায়কের তরফ থেকে তাদের উদ্দেশে মাঝে মাঝে পাঠাতে লাগলেন। সেদিন মনে হ'লো, পোলরা না জেনেশুনে, যে ব্যক্তিকে পিল্‌সুদ্‌স্কির শূন্য গদিতে আসীন দেখে, দূর থেকে সেলাম ঠুকে আসছিল, তাঁর পক্ষে "হাইল্‌-হিট্‌লার"-মন্ত্রে দীক্ষিত জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো বেশীদিন সম্ভবপর নয়। যাঁর ফটোপট পোলদেশের আমীর-ওমরাহ, গৃহস্থ, কারিগর, মজুর এবং চাষার ঘরে বিরাজ করতো, তিনি আগে একদিনের তরেও সৈনিক-সাধারণের সম্মুখীন হয়ে একটা বাৎসল্যবাক্যও কখনো উচ্চারণ করেন নি। আজ পোলদের এই কঠোর পরীক্ষার দিনে আগের মতই তিনি অজ্ঞাত, অদৃশ্য, অনভিগম্য এবং ব্রীড়া-জড়িত হয়ে রইলেন।

রাত দশটা বাজলো। সন্ধ্যা থেকে আর আক্রমণ হয় নি। ঘরে আলো নেই। তাই বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'লো। রাদিওতে যুদ্ধের খবর শেষ হয়ে বাজনা আরম্ভ হ'লো। প্রতিদিনের মতই চললো, শোপ্যাঁর এত্যুদ্‌, বাখ্‌-এর প্রেল্যুদ্‌, বেতোফেনের সিম্ফনী। রাদিও খুলে বিছানায় শুয়ে সেদিনের ঘটনাগুলো মনের মধ্যে উলটে পালটে দেখছি। একেই বলে যুদ্ধ। এরই তোড়জোড় চলছিল এত দিন ধরে'।

দৈনন্দিন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার খুটিনাটি ও যুদ্ধের কুৎসিত, নৃশংস ঘটনাস্তূপের মাঝখানে মন এক অদ্ভুত উপায়ে সামঞ্জস্যের সেতু বাঁধতে বসলো। বুঝলাম, অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি।

২রা সেপ্টেম্বর।

ভোর পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আকাশ ফাটিয়ে আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তির আর্তনাদ উঠলো। হাতের কাছেই পোষাক ছিল, তাড়াতাড়ি পরে' নিয়ে ঘুম-জড়ানো চোখে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। যে বাড়ীতে থাকি তাকে তাসের বাড়ী বললেই হয়। পতনোন্মুখ বোমা তখনও চোখে দেখিনি, তবে শান্তির যুগে ভারশৌএর পথে-ঘাটে দু'এক জায়গায় প্রোপাগান্দার উদ্দেশ্যে সাজানো বোমার খোল দেখেছি বটে। তার চেহারা ঠিক বাপুজীর হাতের টাকুয়ার মত। আকাশ থেকে যদি ঐ ধরণের প্রকাণ্ড একটি টাকুয়া ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বাড়ীর ওপর এসে পড়ে ত তার কোনো চিহ্ন থাকবে না। তা ছাড়া ভিত-কামরার "আশ্রয়" সে বাড়ীতে ছিল না, যদিচ আমার ফ্ল্যাটটিকে বেরসিক সহকর্মীরা "আ-স্রা-মা" বলতেন। দেখতে দেখতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ ভারশৌএ এসে হাজির হ'লো। ভোর থেকেই চললো বোমারু-বিমানের গজরানি আর বোমারু-শিকারী-কামানের অবিরত হাততালি দেওয়ার মত শব্দ।

ঘুরতে ঘুরতে আবার এসে বসা গেল ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের চায়ের দোকানে। এখানেও যে মাথা বাঁচাবার জন্যে তথাকথিত কোন আশ্রয়

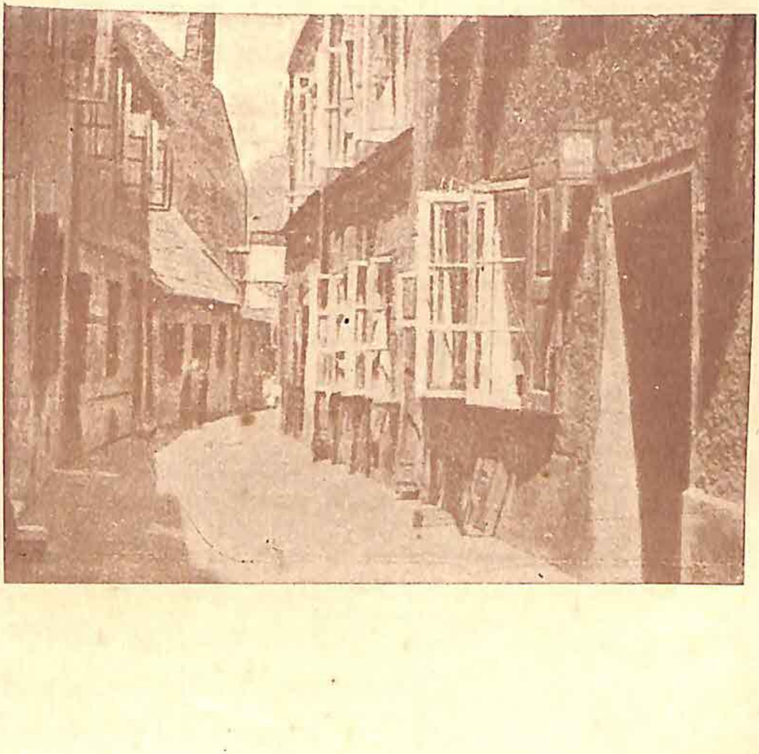
ছিল তা নয়, তবে উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত করবার জন্যে এবং স্বল্পনিদ্রা-জনিত অবসাদ দূর করবার জন্যে ছিল উৎকৃষ্ট কাফি আর মালাই। তাছাড়া দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রের অপ্রতুলতা এখানে ছিল না। ভারশৌএ প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি খবরের কাগজ উলটে পালটে দেখলাম। এতদিন ধ'রে কাগজে কাগজে যে খেয়ো-খেয়ি চলতো—"আমাদের সমসাময়িক অমুক, তমুক" বলে', আজ আর তা চোখে পড়লো না। পোলদেশের আভ্যন্তরীণ দলাদলি একেবারে উধাও হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে এটাও অন্ততঃ ভারতবাসীর পক্ষে একটা দেখবার জিনিষ। যদিচ আমার গভীর সন্দেহ হয়, আমাদের দেশ চিতায় উঠলেও কোনোদিন আমাদের দলাদলি বা সাম্প্রদায়িকতার অবসান হবে, তবুও এখানে বলা অবান্তর হবে না যে, যেসব কমুনিস্ত্ ফাশিস্ত্‌দের বুকে ছুরী লাগাতো, এবং যে সব ফাশিস্ত্ কমুনিস্ত্‌দের মাথায় লাঠি চলোতো, তারা আজ বহিঃশত্রুর আক্রমণে একজোট হয়ে লড়াই করতে চলেছে। যেসব মানুষের মনুষ্যত্ব আজও বজায় আছে তাদের সমাজকে বহিঃশক্তির অবস্থিতি সঙ্ঘবদ্ধ করে। এই ধরণের কতকগুলি অসংলগ্ন চিন্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি নিজেকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে। এ দিকে সহরের সর্বত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক সেকেণ্ড অন্তর বোমাবর্ষণ হ'চ্ছে, তার অনুকম্পনে টেবিলের ওপর পেয়ালার কাফি পিরিচের উপর চলকে পড়ছে।

খুব নিকটেই, ভারশৌ থেকে উপনগরী প্রাগায় যাবার পুল—মস্ত্ ক্যের্বেজ্যা। শত্রুপক্ষ নাগাড়ে তার ওপর বোমা ফেলে' তাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, যাতে ভীস্‌লা পার হয়ে সৈন্যসামন্তের পক্ষে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। পোলদের দিক থেকে সেতু রক্ষার কড়া বন্দোবস্ত থাকায় জার্মানরা তার ধারে-কাছেও ঘেঁসতে পারছে না। ফলে বোমাগুলো পড়ছে পুলের আশে পাশে। ভেঙ্গ্যের-

ক্যোভিচের চায়ের দোকানের ওপর এসে পড়াও যে দু'একটির পক্ষে অসম্ভব, তা বলা যায় না। তবুও সেখানেই কিছুক্ষণ সময় কাটাতে মনস্থ করলাম; ঘণ্টাখানেক ধরে' বোমা-পড়ার আওয়াজে মৃত্যুর সম্ভাবনার সঙ্গে মন একরকম বোঝাপড়া করে' ফেলেছে। তখন বোমার আওয়াজ কতকটা বাজ পড়ার শব্দের মত মনে হয়; কপালে লেখা থাকলে মাথায় বজ্রপাত হবেই, তা না হ'লে বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে বোমা বা বোমারুকে কদলী প্রদর্শন করলেও মৃত্যুর আশঙ্কা নেই।

নিষ্পুরুষ চায়ের দোকানে বেকারভাবে ঘণ্টা তিন চার সময় কাটানোর পর অতিবড় যোগীপুরুষেরও তিতিক্ষার বিচ্যুতি ঘটে। সুতরাং হাতে-পায়ে ঝিনঝিনি ধরার সঙ্গে সঙ্গে মনে ছটফটানি ধরলো। দোকান থেকে বেরুবার সময়ে শুনতে পেলাম বিদায়বাণী—"দ ভিদ্‌জেনিয়া!"—পুন-র্দর্শনায়। বেশ অনুভব করলাম, কথাটা বক্তার মুখ থেকে রোজকার মত নেহাৎ মামুলিভাবে বের হ'লো না। এই যে এখন দোকান থেকে বেরুচ্ছি, আবার একদিন এই দোকানে মর্ত্ত্য শরীর সমেত প্রবেশ করা হবে কি না, তার স্থিরতা নেই। কাজেই দোকানের মালিক যথার্থ আন্ত-রিকতার সঙ্গে বিদায় জানালেন। আমিও তার প্রতিধ্বনি করলাম—"দ ভিদ্‌জেনিয়া"।

পথে বেরিয়ে মনে পড়লো, আজ দোসরা, কাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তলব বিতরণ করা হ'চ্ছে। সুতরাং সেইদিকেই পাড়ি দিলাম। বিমান-আক্রমণ তখন কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষান্ত হয়েছে। রাস্তা-ঘাটে আবার লোক চলাচল সুরু হয়েছে, তবে সবাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে, যাতে এই ফাঁকে গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে। আমার গন্তব্যস্থল, ঐ মাষ্টারের দৌড় ইস্কুল অবধি। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় খুব দূর নয়। কাজেই স্নায়ু ঠাণ্ডা রেখে আফিস-ফের্তা চালে চলা গেল। হঠাৎ কে ডাকলে—"পানিয়ে



উলীৎসা র‍্যীৎসের্স্কা। ভারশৌএর সঙ্কীর্ণতম পথ। এইখানেই গ্রন্থকারের "আ-স্রা-মা" ছিল।

প্রফেসঝে" !—মাষ্টার মশাই ! ফিরে দেখি আমারই একটি ছাত্রী। বয়েস বছর কুড়ী বাইশ, সর্বাঙ্গে অটুট স্বাস্থ্য, মুখে সুধু বেঁচে থাকার আনন্দ-জনিত হাসি। ভারী উৎসাহের সঙ্গে জানালে, আপাততঃ সাহিত্য পড়া বন্ধ রেখে সে নার্স্ হয়েছে, আহত সৈনিকদের সেবা করবার জন্যে। কয়েকমাস আগে এই ছাত্রীটিরই বিবাহে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, মনে পড়লো। একটু হেসে বললে, "সে গেল লড়তে, তাই আমিও নার্স্ হ'লাম।" তার পর যোগ করলে, "আপনি দেখে নেবেন, পানিয়ে প্রফেসঝে, আমরা জিতবোই জিতবো, আর যদি হারি ত মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত লড়ে' তবে হারবো। হারলেও আমরা বশ্যতা স্বীকার করবো না। পিলসুদ্স্কি বলে' গেছেন—'হেরে গিয়েও বশ্যতা স্বীকার না করা আর জেতা, দুই সমান।' "

ছাত্রীটির উৎসাহ দেখে ভারী আনন্দ হ'লো। স্বামী যুদ্ধে গেছে, সুতরাং সে পা ছড়িয়ে কেঁদে পাড়াসুদ্ধ লোককে নিজের বিরহ জানাতে বসে নি। স্বামীর সত্যিকারের জীবন-সঙ্গিনীর মত সেও ঐ একই কাজে ব্রতী হয়েছে। পতি-ভক্তিকে এরা কুইনিনের মত অ-গলাধঃকরণীয় করে' তোলেনি। তাছাড়া ঈশ্বরের দয়ায় এদের পতি-ভক্তি নেই, আছে পতি-প্রীতি। যাই হোক, মেয়েটিও চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কাজে, সুতরাং এক সঙ্গেই চলা গেল।

কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, সহরের কয়েকটা বড় বড় ইমারতের ভিত-কামরার বাইরের দিকের জান্লাগুলো বস্তা বস্তা বালি দিয়ে ঢাকা, যাতে কল-বন্দুকের গুলি বা বোমার টুকরো জান্লা দিয়ে এসে ভেতরকার "আশ্রিত" লোকদের প্রাণসংহার না করতে পারে। টমাস্-কুকের টহল-বুরোর কাছে এসে দেখলাম রাস্তার ধারের বালির বস্তাগুলো গুলি লেগে ফুটো হয়ে গেছে। একটা বস্তার ওপর অনেকখানি খুন-

খারাপী রঙের মত ঘন কি একটা তরলপদার্থ বালির সঙ্গে মিশে গেছে। আমার "নার্স্"-ছাত্রীটি জীবনে হয়তো সেই প্রথম আহত মানুষের রক্ত দেখলে। লক্ষ্য করলাম, যুদ্ধ সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহ সত্বেও বেচারীর কচি, ঢল-ঢলে মুখখানি একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তাকে অন্য-মনস্ক করবার জন্যে হেসে বললাম, "গ্যাসের হিড়িকে বস্তার খাঁজে খাঁজে রং লেপে দিয়েছে, কিন্তু দেখাচ্ছে ঠিক যেন রক্ত, নয় ?" মেয়েটি হয়তো মাষ্টার মশায়ের ব্যাখ্যা অনিচ্ছাসত্বেও মেনে নিলে। গ্যাস সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতে করতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের মাঠটা পার হয়েছি এমন সময় আবার আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তির আর্তনাদ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রকাণ্ড মৌমাছির চাকে ঢিল মারলে যেরকম শব্দ শোনা যায়, খুব দূর থেকে সেই রকম গজরানি শোনা গেল। সামনেই একটা থামের উপর আঁকা অঙ্গুলি-নির্দেশ চোখে পড়লো—"আশ্রয় ঐদিকে।" নির্দেশ লক্ষ্য করে' ছাত্রীটিকে নিয়ে দৌড়তে হ'লো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনদিকটা পাহাড়ের মত ঢালু, এ পাশের উঁচু জমী ক্রমে একেবারে ভীস্‌লা-গর্ভে নেমে গেছে। গড়েন জমীর গায়ে গায়ে বেড়াবার পথ, দু'পাশে বাগান। একটা পথের খানিকটা ঢালু কাঠের ছাউনি দিয়ে আশ্রয় বানানো হয়েছে। এ ধরণের আশ্রয় এই প্রথম দেখলাম। গড়েন ছাদের উপর বালির বস্তা, যাতে কল-বন্দুকের গুলি ছাদ ভেদ করে' ভেতরে না ঢুকতে পারে। তাছাড়া ছাদের ওপর বোমা পড়লে হয়তো তা দৈব কৃপায় ফাটবার আগেই গড়িয়ে অনেক নীচে পড়ে' যাবে।

আশ্রয়ে ভিড় কম হয় নি, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কর্মচারী, কর্মচারিণী ছাত্র, ছাত্রী, দারোয়ান, বেয়ারা সবাই এসে জমা হয়েছে এইখানে। এই অল্পপরিসর আশ্রয়টিতে নড়বার চড়বার জায়গা নেই। এখানে বোমা

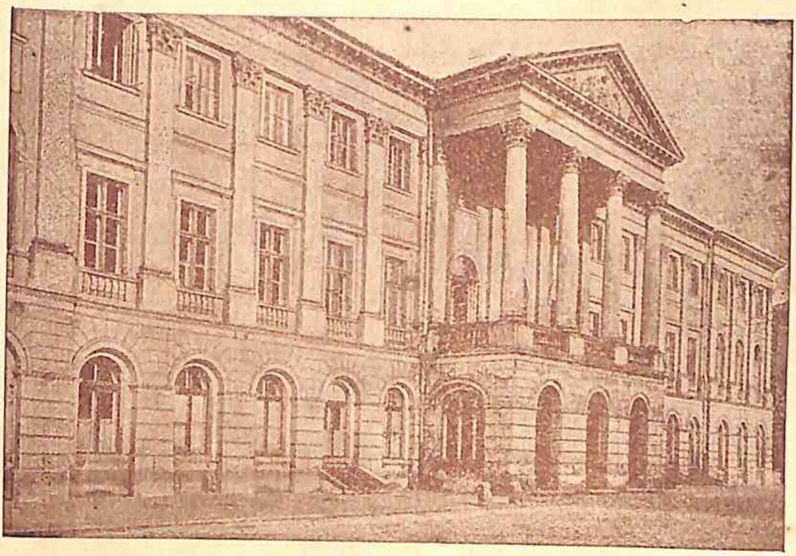
পড়লে অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা যে, পরলোকে ইস্কুল-পাঠশালা খুলতে হ'লে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সবরকমের মানুষই হাতের কাছে পাওয়া যাবে। আমার দিক দিয়ে সুবিধা এই যে, স্বর্গের (নরকেরও হ'তে পারে) পথে কোথাও বসে' দু'দণ্ড আড্ডা দেবার জন্যে সহকর্মী মাষ্টারদেরও অভাব হবে না। সত্যি কথা বলতে, তখন পরলোককে নেহাৎ পাশের একটা কোনো দেশ বলে' মনে হ'তো।

ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মানী উড়ো জাহাজ দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে ফেললে। এবার আক্রমণের লক্ষ্য হ'লো ভারশৌ-এর আর একটি পুল—মস্ত্ পনিয়াতভ্স্কিয়েগো'। জায়গাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইল খানেক দূর হ'লেও, আমাদের আশ্রয়ের ভেতর থেকে যুদ্ধ দেখবার সুযোগ ঘটলো। পোল পক্ষ থেকে অবিরত বোমারু-শিকারী কামানের গোলা আকাশে গিয়ে ফাটছে ফট্ ফট্ করে'। জার্মানরা ওপর থেকে কল-বন্দুকের টোটা-ওয়ালা ফিতে চালাচ্ছে—পা-পা-পা-পা-পা! পা-পা-পা-পা-পা! বোমারুগুলো একটু নীচে নেমে আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে কালো কালো ডিম পাড়ছে পুল লক্ষ্য করে'। দেখলাম, সত্যিই বোমা-গুলো পড়বার সময় দূর থেকে মনে হয় যেন এক একটি টাকুয়া বন্ বন্ করে' ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসছে। মনে হ'লো, বাপুজীর হাতের ঐ অহিংস টাকুয়াটির নিগূঢ় অর্থ কী, তা কে জানে! টাকুয়াগুলি নামবার সময়ে সাপ-বাজির মত শিস্ দিতে দিতে নামে। একটু পরেই ফাটবার আওয়াজ পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে মাটি কেঁপে ওঠে। ওগুলি ফাটবার সময়ে ধারে-কাছে কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তার অভিজ্ঞতা তখনও লাভ করা হয়ে ওঠে নি। বোমাগুলোর একটাও পুলের ওপর পড়তে পাচ্ছে না, কারণ পোলরা বোমারুগুলোকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে। কাজেই খুব ওপরে উঠে বোমা ফেলা ছাড়া উপায় নেই, এবং

সেগুলো আশপাশের বাড়ীঘরদোর ভেঙ্গে চুরমার করছে। কত শত নরনারী এবং শিশুর যে মৃত্যু ঘটছে প্রতি মিনিটে, তার ইয়ত্তা নেই। দূরে দূরে দেখতে পাচ্ছি, বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা বাড়ীর ইট কাঠ শূন্যে ছিটকে পড়ছে।

এ ধরণের আক্রমণ চললো প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে'। আক্রমণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীয় তলবটি পকেটস্থ করে' আবার পথে বেরুলাম।

সহরের অনেক জায়গায় কিছু কিছু ধ্বংস হয়েছে বটে, তবে তখনো নগরবাসীদের তা একেবারেই বিচলিত করে নি। কারণ জার্মানরা বেপরোয়া হয়ে, নৃশংসভাবে আক্রমণ করলেও পোলরা তাদের সঙ্গে সমানে যুঝে চলেছে। পথ-চলা মানুষ পরস্পরকে দু'টি প্রশ্ন করছে, শুনতে পাচ্ছি : পোলদেশের অসামরিক জনসাধারণের ওপর জার্মানী আক্রমণের প্রত্যুত্তর পোলরা ঠিক ঐ কায়দায় দিচ্ছে কি না? এবং সমগ্র পোলদেশের ওপর জার্মানদের এই যথেচ্ছ, বিবেকহীন আক্রমণ ও সহস্র সহস্র পোলীয় বাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণসংহারের খবর পাওয়া সত্বেও ফরাসী ও ইংরেজরা পোলদের সাহায্য করা দূরে থাকুক, জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করছে না কেন? আমার মনেও ওদু'টি প্রশ্ন উঠেছিল। বলা বাহুল্য, সমগ্র পোলজাতির মত আমিও তখন প্রশ্ন দু'টি সম্বন্ধে যে তিমিরে সেই তিমিরে। ঐ দু'টি কথা ভাবতে ভাবতে যখন বাড়ী পৌঁছলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বাড়ী ফিরে মনে পড়লো একবার ব্রিতানী কন্‌সুলাতে দেখা দিলে ভালো হ'তো। সকালে এ সঙ্কল্প নিয়ে বেরুলেও গোলমালে তা একেবারে ভুলে গেছি। মনে পড়লো কন্‌সুল্ মহোদয়ের আশ্বাস-বাণী। এমন কি প্রয়োজন হ'লে তাল্পি করে' আমার বাড়ীতে খবর দেওয়ার যখন প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, তখন আর ভাবনা কী?



ভারশৌ পিল্‌সুদ্‌স্কি বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান সৌধ।

দুপুরবেলাটা শান্তিতে কাটলো। ঘণ্টা দুই একেবারে চুপ্‌চাপ্‌। ব্যাপার দেখে কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগলো, হয়তো পশ্চিমে ডাণ্ডা খেয়ে হিট্‌লার শান্তির প্রস্তাব করছেন, হয়তো বা ইংরেজ আর ফরাসীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে' যুদ্ধটা আপাততঃ স্থগিত রাখা হ'লো। জান্‌লা দিয়ে পথ-চলা মানুষের মুখে এমন কথাও শুনতে পাই যে, জার্মানরা পোলদের কাছে পাল্টা ডাণ্ডা খেয়ে একটু শান্ত হয়েছে। কিন্তু ঘণ্টা দুই যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ঠিক দু'টোর সময়ে, আবার পূরোদমে আক্রমণ সুরু হ'লো। আমি তখন আমাদেরই পাড়ার এক বাজিয়ে বন্ধুর বাড়ীতে বাজনা শুনে দুদণ্ড স্থির হয়ে বসবার জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। বাজিয়ে ভদ্রলোক বাড়ীতে নেই, এবং আক্রমণের সময়ে পথে বেরুবারও হুকুম নেই। কাজেই তাঁদের বাড়ীতে সিঁড়ির তলায় যে আশ্রয় বানানো হয়েছে সেইখানেই আটক পড়লাম।

বাড়ীতে লোক বেশী নেই, জন দশ-বারো, আর পথ-চলা দু'চারজন ভদ্রলোক। এই বাড়ীখানি বোমার লটারীতে প্রথম পুরস্কার পাবার মত। কারণ এটি একেবারে ভারশৌ-এর রাজদুর্গের গায়ে গায়ে লাগানো, এবং এর ঠিক সামনে সরু গলির ওপারে ভারশৌএর সবচেয়ে বড় গির্জা। হিট্‌লারের দুলালদের পক্ষে এ দু'টিই যৎপরোনাস্তি লোভনীয়। অবশ্য রাজদুর্গে রাত কাটাবার জন্যে সেটাকে যদিও হিট্‌লার মহোদয় জিইয়ে রাখতে হুকুম দিয়ে থাকেন ত গির্জাটাকে অনায়াসে ধ্বংস করা চলতে পারে। আক্রমণ খুব কাছেই চলেছে। তবে আপাততঃ কেল্লা আর গির্জার ওপর জার্মানদের নজর নেই। হামলার চোট পূর্ণ-মাত্রায় গিয়ে পড়ছে ক্যের্বেজ্যা পুলের ওপর, যার দূরত্ব আমাদের আশ্রয় থেকে শ' দেড়েক বা শ' দুই গজ মাত্র। সুতরাং দু' একটা টন-খানেক ওজনের বোমা একটু বেঁকে আমাদের ওপর এসে

পড়াও আশ্চর্য্য নয়। বাড়ীর সামনের গলিটায় বোমারু-বর্ষিত কল-বন্দুকের গুলিগুলো ছরছরিয়ে পড়ছে শিলা-বৃষ্টির মত। আশ্রয়ে যারা আছি, সবাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পরপারে যাবার জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে নিয়েছি। সবার মুখই মৃত্যুর ঠিক পূর্ব-মুহূর্তের এক অপৌরুষ কঠোরতা ধারণ করেছে। জনকয়েক ভদ্রলোক, গুটিকয়েক কাচ্চাবাচ্ছা আর বাদবাকী স্ত্রীলোক। সবাই উত্তেজনায় থরথর করে' কাঁপছে। বাড়ীর দারোয়ান সুধু মুখে কাষ্ঠহাসি টেনে সবাইকে সাহস দিচ্ছে। আমাদের স্নায়ুর যেরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে অতিবড় কেটো-চরিত্রের লোকের পক্ষেও হঠাৎ হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে লজ্জাকর কোনো কাজ করে' ফেলা আশ্চর্য্য নয়। ঠিক এই সময়ে এখানে একটি ছোটখাটো নাটিকা অভিনীত হ'লো যার প্রসাদে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হ'লাম।

মাথার ওপর সিঁড়ি দিয়ে ভারী খানকয়েক পায়ের নেমে-আসার শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরেই বাড়ীর অবশিষ্ট দু'জন অধিবাসী নীচে নেমে এলেন। একটি প্রৌঢ়বয়স্কা ভদ্রমহিলা এবং তাঁর পশ্চাদ্‌গামী স্বামীজাতীয় একটি ভদ্রলোক, বয়েস পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হবে। ভদ্রলোক মাথার টুপি, মুখের পাইপ এবং হাতের পেটমোটা একটা কাগজপত্রের ব্যাগ নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন। বোঝা গেল, এঁরা বার বার ওপর-নীচে করার ফলে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। যে নাটিকাটি অভিনীত হ'লো তা সংক্ষেপে এই :

ভদ্রমহিলা। যত বলি, নাম্‌বো না, ওঁর তত জেদ, নাম্‌তেই হবে।

ভদ্রমহোদয়। হাঃ, নাম্‌বো না! একে এই পল্‌কা বাড়ী, বোমার আওয়াজে ঝড়ের মুখে নৌকোর মত দুলচে, তার ওপর আমাদের এই দু'টি লাশ তেতলায় বসে' বসে' বাড়ীখানার

মাথা ভারী করচে। তাইত বললাম, বলি চল গো, নীচে গিয়ে একটু দাঁড়াই যাতে বাড়ীওলার বাড়ীখানা অন্ততঃ রক্ষে পায়।

ভদ্রমহিলা। ওঁর যত ফ্যাসাদ! বলি, যাওনা বাপু তুমিই। এই কত কষ্টে ইহুদী মুদী ব্যাটার হাতে-পায়ে ধরে' আলুক'টা কিনলাম! সেদ্ধ করতে চড়িয়েচি, আমি গেলে হয় গলে' ছাতু না হয় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তা ওঁর পছন্দ নয়। একসঙ্গে মরতে হবে! আমি তেতলায় মরবো, আর উনি এক তলায়, তাতে ওর হবে না। সারাটা জীবন বিদেশে বিভুঁয়ে কাটিয়ে এলেন, কত ঢলাঢলি করলেন যাকে তাকে নিয়ে, আর মরণকালে আমার সঙ্গে নিতে হবে। কেন রে বাপু! সারাটা জীবন, ইহকালে জ্বলে' পুড়ে ম'লাম, পরকালে গিয়েও সেই জ্বলুনি! দেখো দিকিন, আলুগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণে গলে' ছাতু হ'য়ে গেছে! চড়াবার সময়েই ভাবচি, বলি, এই খোসা-সুদ্ধু আলু চড়াচ্চি, আর ঠিক "শ্বাব্"-গুলো* এসে হাজির হবে। খোসা-সুদ্ধু আলুর গন্ধ পেয়েচে, থাকতে পারবে কেন?

ভদ্রমহোদয়। ভান্দেচ্‌কো, † বলি শুন্‌চো? কেবল বকোর বকোর করবে, যত সব আজে-বাজে কথা! বলি শুন্‌চো? কিসের একটা গন্ধ পাচ্চি যেন! কিসের গন্ধ গো? এ্যাঁ?

ভদ্রমহিলা। গন্ধ! হ্যাঁ, গন্ধই ত বটে! শ্বাব্-ব্যাটাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। উঁঃ, কী বিট্‌কেল গন্ধ! হ'তেও পারে।

* পোল ভাষায় জার্মানদের অবজ্ঞাত অভিধা।

† স্বীয় স্ত্রীর "ভান্দা" নামের সাদর রূপান্তর।

একটি ভদ্রলোক। গ্যাস্-ফ্যাস্ নয় ত! ধারে কাছে যেরকম বোমা পড়চে! কিসে কী আচে, কে বলতে পারে?

ভদ্রমহোদয়। এ্যাঃ! কী বললেন? গ্যাস্! ভান্দো, ভান্দেচ্‌কো, এখন দেখ্‌লে ত, বলেছিলাম কিনা আগে যে, ওরা গ্যাস্ ছাড়বেই ছাড়বে? তখন ত কিছুতেই মুখোস কিনতে রাজী হ'লে না, এখন সামলাও! ভান্দো, বলি কথাগুলো কি কানে যাচ্চে, রুমালে সেই ওযুধটা মাখিয়ে নাকে-মুখে বেশ করে' চেপে ধরে' চোখ বুজে থাকো।

স্বয়ং হন্তদন্ত হয়ে গ্যাস্-মুখোস পরলেন। তাঁর দেখাদেখি গ্যাস্-প্রতিরোধক যার যা ছিল, ব্যবহার করতে লাগলো। দারোয়ানের স্ত্রী কিন্তু অটল রইল।

দারোয়ান-পত্নী। ঢং দেখে হাঁসিও পায়। গন্দ! গন্দ, তার হয়েচে কী? আমারে যেসব সামিগ্‌গির সাপ্ করতে হয়, তার গন্দ ঠেকানো তোমাদের ও মুকোসের বাপের সাদ্দি নয়! তবুও কি নাকে কাপড়টা পজ্জন্ত দি'! গন্দ, তার হয়েচে কী!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। (মুখোসের ভেতর থেকে) সর্বনাশ! বুড়ী করচে কী? আরে মশায়, দিন দয়া করে' কার কাছে আচে একটা রুমাল আর একটু ওযুধ!

দারোয়ান-পত্নী। হ্যাঃ, দিলে নিচ্চে কে? আমার মন অমন ডুব্বল নয় যে, শ্বাব্‌দের তুকতাক্ আমার গায়ে নাগবে!

দারোয়ান। (নাকে মুখে রুমাল চেপে, চোখ বুজে) হেলেন্‌কো, তোর দু'টি পায়ে ধ'চ্চি, বাবুদের কতা শোন্। এই ছাক আমি

এই নাকে-মুকে ওষুধ দিচি, আমার আর মরবার ভয় নেই। হেলেন্‌কো, তোর হু'টি পায়ে ধ'চ্চি!

তৃতীয় ভদ্রলোক। (মুখোসের ভেতর থেকে) আচ্ছা, গ্যাস্ হ'লে কি এতক্ষণ বুড়ী বেঁচে থাকতে পারতো!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। (পূর্ববৎ) না, প্রশেঁ পানা,* এতক্ষণে দম বন্ধ হয়ে ডাঙ্গায়-তোলা বোল মাছের মত তড়্‌পাতে তড়্‌পাতে ওর প্রাণ বেরিয়ে যেত।

চতুর্থ ভদ্রলোক। সত্যিই ত! আচ্ছা, গন্ধটা কেমন চেনা-চেনা, নয়? কিসের গন্ধ বলুন ত?

মুখোসের ফাঁক দিয়ে কেউ কেউ ভরসা করে' নাক টেনে গন্ধটার জাতি-নির্ণয়ে ব্যাপৃত হ'লো।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। আরে, এ যে স্মেলিং সল্টস্-এর গন্ধ!

উপস্থিত সকলে। হ্যাঁ, তাই ত!

চতুর্থ ভদ্রলোক। দেখুন ত দয়া করে', কার পকেটে স্মেলিং সল্টস্-এর বোতলের ছিপি খুলে গেচে।

ভদ্রমহিলা। দেখ ত গা, তোমার ঐ ব্যাগটায়। ওটি সঙ্গে না নিলে উনি একপা ঘর থেকে নড়তে চান না, বলেন, পথে অজ্ঞান হয়ে গেলে দেখবে কে?

ভদ্রমহোদয়। (মুখোস খুলে, ব্যাগ হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে) এ্যাঃ, বল কী? আমার বোতলটারই ছিপি খুলে গেচে নাকি? বললেই অমনি হবে? ইস্ক্রুপের প্যাঁচ দেওয়া ছিপি! (বিরাম)

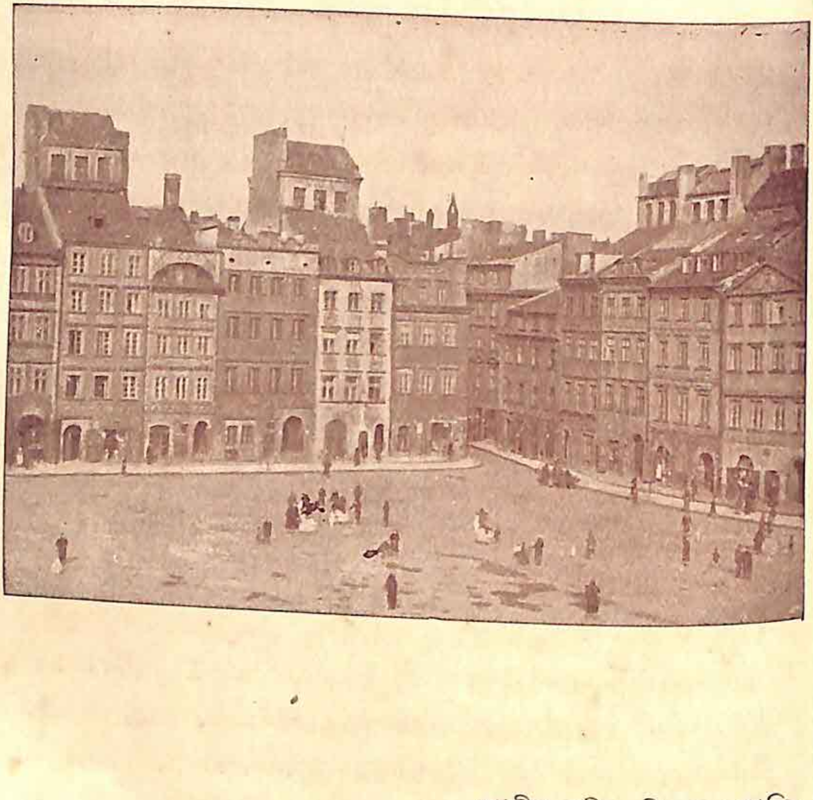
* পোল ভাষায় "প্রশেঁ পানা" (পুং), "পানিয়ে" (পুং), "প্রশেঁ পানী" (স্ত্রী), "প্রশেঁ পানস্তভা" (পুং ও স্ত্রী), বাংলার "মশাই" শব্দ বা ইতালীয় "প্রেগো" শব্দের মত, কথার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এ্যা, হ্যা, হ্যা! ঠি—ক যা বলেচ তাই। ছি, ছি, ছি, ছি, ছি, দরকারী কাগজ-পত্তরগুলোয় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেচে! তাই বলি, গন্ধটা অত কাছ থেকে আসচে কেন? একেবারে যেন আমার পকেট থেকে। ছি, ছি, ছি, ছি, ছি! *

থেকে থেকে, খেপে খেপে আক্রমণ চললো প্রায় দু'ঘণ্টা। সুতরাং দু'ঘণ্টা ধরে' মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মানুষের চারিপাশে গুলি ছোঁড়া হ'লে তার যে অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও সেই রকম। আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তির অবসানে বাইরে বেরিয়ে পৃথিবীটাকে একেবারে নতুন বলে' মনে হ'লো। প্রাচীন পল্লীর কেন্দ্রস্থল, বেশ একটু খোলা জায়গা যেখানে আগে বাজার বসতো। সেই থেকে তার নাম র‍্যানেক্ বা বাজারই রয়ে গেছে। র‍্যানেক্-এর চারিধার ঘিরে পুরাণো বাড়ী, তাদের দেওয়ালে দেওয়ালে সবুজ, নীল, লাল রঙে কত রকম ছবি আঁকা, রেখার বৈচিত্র্যে শিল্পীর কল্পনা-ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয়; র‍্যানেক্-এর ভেতর দিয়ে যাবার সময়ে অস্তগামী স্র্য্যের কিরণ-বিচ্ছুরিত আকাশের তলায় ভারশৌএর এই চিত্রমেখল পল্লীটিকে নিতান্ত অবাস্তব বলে' মনে হ'লো।

বিকেলে একটু বিশ্রাম করবার জন্যে বাড়ী ফিরলাম। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই বেলা পাঁচটা আন্দাজ সময়ে আবার হাম্‌লা সুরু হ'লো। ধারে কাছেই কোথাও সমানে চললো ধ্বংসলীলা, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। ভিত-কামরার অন্ধকূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটক থাকার চেয়ে নিজের ফ্ল্যাটে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা অধিক বাঞ্ছনীয় বলে' মনে হ'লো। বোমার

* নিখিল-ভারত রাদিও প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা কেন্দ্রে অভিনীত লেখকের "মাটির নীচে" শীর্ষক নাটিকায় এই ঘটনাটি উল্লিখিত আছে।



প্রাচীন-পল্লীর র‍্যীনেক্‌। চারি-
পাশের চিত্র-মেখল বাড়ীগুলি
পোলদেশের গৌরবস্থল।

প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ছোট দোতলা বাড়ীখানা থর থর করে' কাঁপছে। জানলার ধারে চেয়ারে বসে' ভ্রম হয়, বুঝি দোতলা বাস্-এর মাথায় চড়ে' চলেছি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, বাড়ীটার ছাদের এক দিকে চিড় খাচ্ছে আস্তে আস্তে। বইএর গাদার মধ্যে বারে বারে অনিচ্ছাসত্বেও চোখে পড়ছে "প্রেমচন্দ"জীর হিন্দী গ্রন্থ "**কফ়ন্**" (কফিন্)। ভাবছি, হয়তো বারে বারে "**কফ়ন্**" কথাটা চোখে পড়ার কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে; হয়তো এই বাড়ীখানাই হবে আমার জীবন্ত কবর, তাই নিয়তি ক্ষণে ক্ষণে আমায় কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে পড়লে বোধ হয় এ ধরণের মানসিক দুর্ব্বলতা এবং দৈবে বিশ্বাস নিতান্ত স্বাভাবিক।

দিনের শেষে জার্মানদের আক্রমণের হিসেব করতে গিয়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। দেখা গেল, আক্রমণগুলি হ'চ্ছে প্রায় ঘড়ি ধরে'। ভোর পাঁচটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত, তারপর ঘন্টাখানেক জার্মানী সৈনিকদের কাফি খাবার ছুটি। বারোটা থেকে দু'টো পর্য্যন্ত মিট্টাক্-এসেন বা মধ্যাহ্ন ভোজন। বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত চা-রুটি খাবার ছুটি। তার পর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত কাজ। অর্থাৎ দিনে মোট দশ ঘণ্টা বোমা ফেলার কাজ চলেছে। পরেও লক্ষ্য করেছি, এই নির্দিষ্ট সময়গুলির পরিবর্তন হয় নি। যতদূর বোঝা গেল, সমগ্র পোলদেশে বজ্র-অভিযান চালাবার জন্যে জার্মানী বিমান-সৈনিকদের দিনে দশঘণ্টা মেহন্নৎ করতে হ'চ্ছে, এবং একটি সৈনিকও বেকার বসে' নেই। সুতরাং এই দশঘণ্টাব্যাপী আক্রমণের ফল অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত অঞ্চলে কী ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। এ সংবাদ রাদিও-যোগে ইঙ্গস্থান ও ফরাসীদেশে পৌছলেও তখনো হয়তো তা সেসব দেশের জনসাধারণকে বিচলিত করে নি।

সেদিন সন্ধ্যা হবার কিছু পরেই চাঁদের আলোয় আকাশ ভরে' গেল। রাস্তায় বা বাড়ীতে কোথাও একটিও প্রদীপ পর্য্যন্ত নেই। বহুদিন ইউরোপ-প্রবাসের পর জ্যোৎস্নাকে আজ প্রথম নিছক, অবিমিশ্রিত জ্যোৎস্না-রূপে উপভোগ করবার সুযোগ মিললো। দু'একটি অতি নিকট আত্মীয়-প্রতিম পরিবারের নিরাপত্তা বিষয়ে খবর নেওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম। বিশেষতঃ যে পরিচিতাটির অনাবিল, নিঃস্বার্থ ভগিনী-স্নেহ আকণ্ঠ পান করেছি, সারাদিনের বোমাবর্ষণে অন্ততঃ তিনি এবং তাঁর রুগ্ন স্বামী সুস্থ ও অনাহত কিনা, খোঁজ নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

সমস্ত ভারশৌ সহরটাকে কোনো প্রতিভাশালী চিত্র-শিল্পীর আলো-ছায়ার ছবি বলে' ভুল হয়। অন্য কোনো রং চোখে পড়ে না, সুধু আলো আর অন্ধকার—lux et ombra—জ্যোতিঃ ও তমস্। আলো-কে প্রতিহত করে' পৃথিবীর বুকে এই যে ছায়াপাত করছি, এতে আমি বেঁচে আছি এ কথাটা যেন সেদিন নূতন করে' উপলব্ধি করলাম। তখন চ্যেহভের নাটক সম্বন্ধে বই লিখছিলাম। তাই মনে হ'লো, হয়তো বিশ্বব্যাপী বজ্র-অভিযানে পৃথিবী একদিন নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়ে সৃষ্টির আদিতে পৌছবে। চ্যেহভ্ তাঁর "সিন্ধু-শকুনে" ত্রেপ্লোভ্-পরিকল্পিত অভিনব উপ-নাটিকায়, স্তিমিত চন্দ্রালোকে পৃথিবীবক্ষে আসীনা, প্রাণরূপিণী, অশরীরী আত্মার প্রতীক, নীনার মুখ দিয়ে হয়তো ভবিষ্যদ্বাণী করছেন ঃ

মানুষ, সিংহ, ঈগল, তিতির, শিং-ওয়ালা হরিণ, রাজহাঁস, মাকড়সা, জলচর, শব্দহীন মাছ, সাগর-তারকা এবং সমস্ত জীব যা চোখে দেখা যায় না—সমস্ত প্রাণী, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত প্রাণী, আপন দুঃখের চক্রগতি সম্পূর্ণ করে' নির্বাপিত হয়েছে···সহস্র যুগ ধরে' পৃথিবীর কোলে একটি প্রাণও অঙ্কুরিত হয় নি, আর ঐ নিঃসঙ্গ চাঁদ আজ

বৃথাই স্থধু আপন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে···প্রান্তরে আজ সারসের কর্কশ ধ্বনি নেই, "লীপ"-কুঞ্জে পতঙ্গের ঝঙ্কার নেই।...জীবের দেহ ধূলোয় মিশেছে ; শাশ্বত "বস্তু" তাদের আজ পাথর, জল আর মেঘের রূপে রূপান্তরিত করেছে···আমার অন্তরে এক হয়ে মিশেছে মানুষের চেতনা আর জন্তুর প্রবৃত্তি, মনে পড়ে সব, সব, সব, আর প্রতিটি জীবন আমি আবার নূতন করে' অনুভব করি।

প্রকৃতির কোলে স্রষ্টার স্থষ্টির আবেগে এই যে জীবলোকের উৎপত্তি, তা যদি সত্যিই এই মহত্তর বা মহত্তম যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তা হ'লে বিধাতার কাছে নতমস্তকে শান্তির প্রতীক্ষায় দাঁড়াবে একটি মানুষ এবং একটি জাতি—হিট্‌লার এবং "হাইল্-হিট্‌লার"-মন্ত্রে দীক্ষিত জার্মানী। ভাবতে ভাবতে চলেছি। চ্যেহভের অপূর্ব, সরল ভাষা মন আপনা আপনি আবৃত্তি করছে—"মানুষ, সিংহ, ঈগল, তিতির, শিং-ওয়ালা হরিণ, রাজহাঁস, মাকড়সা, জলচর, শব্দহীন মাছ, সাগর-তারকা···সমস্ত প্রাণী, আপন দুঃখের চক্রগতি সম্পূর্ণ করে' নির্বাপিত হয়েছে।" এমন সময়ে আবার আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তির আর্তনাদ।

জ্যোৎস্না-রাত্রিতে বিমান-আক্রমণ সম্ভবপর কিনা, তাই পরখ করবার জন্যেই হয়তো জার্মানরা আবার সহরের ওপর চড়াও হ'লো। ভিত-কামরার আশ্রয় গ্রহণ না করে' একটা বড় বাড়ীর ফটকের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে ; জনশূন্য ট্রাম, বাস্ বা দু'একখানা অশ্বহীন শকট পথে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখনো-অনভ্যস্ত চোখে এ দৃশ্য কেমন যেন অদ্ভুত লাগে ; মনে হয় যেন পৃথিবী থেকে সমগ্র মানবজাতি বিলুপ্ত হয়েছে, স্থধু পড়ে' আছে তার শূন্য ঘরবাড়ী আর সভ্যতার শেষ নিদর্শনগুলি। মাথার ওপর বোমারুর ধাতব গর্জন আর তার যান্ত্রিক পক্ষবিস্তার, চেক্ লেখক কারেল চাপেক্-পরিকল্পিত

যন্ত্র-মানুষ, "রবত্"-এর যুগের সূচনা করে। মাথার ওপর রবত্-চালিত বিমান-বাহিনী রাত্রির স্বল্পালোকে নির্বিবেক, নির্দয়ভাবে ঘণ্টাখানেক ধরে' বোমা-বর্ষণ করে' গেল। ভারশৌএর ওপর রাত্রে বিমান-আক্রমণ এই প্রথম ও শেষ। ধারে-কাছে কোথাও শত্রু-অধিকৃত হাওয়া-বন্দর না থাকায়, নামবার সময়ে উড়োজাহাজগুলো ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবার আশঙ্কাতেই বোধ করি রাত্রে আক্রমণ জার্মানরা স্থগিত রাখলে। নৈশ অভিযানে জার্মানরা তখনও নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল।

আমার পরিচিতা দিদিটির বাড়ী সেখান থেকে খুব কাছেই। তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনে আশ্বস্ত হ'লাম, তিনি আর তাঁর স্বামী, দু'জনেই জীবিত এবং অনাহত। তবে একটু দূরে, নদীর ধারে কতকগুলো বাড়ী হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তাঁরা দু'জনেই আমায় সুস্থ অবস্থায় দেখে অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁদের "বাঙ্গালী"-পনায় আমার "ইউরোপীয়" মন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো বটে, তবে মানুষের ওপর মানুষের স্নেহ যে হিমালয়, হিন্দুকুশ বা ভারত মহাসাগরের বাধা মানে না, তা উপলব্ধি করে' আমার চোখেও জল এলো। তাঁদের ওখানে রাত্রির আহার সেরে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। বিদায়কালে দিদি সজল চোখে বললেন—"দ ভিদ্‌জেনিয়া!"—আবার যেন দেখা হয়। আমিও অনভ্যস্ত অনুভূতির সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি করলাম—"দ ভিদ্‌জেনিয়া!"

পথে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে যেতেই দেখলাম যা শেষ কয়েকদিন ধরে' চোখে পড়ে নি। ভারশৌএর চিরপরিচিত ফিটন। কাজের অবসরে সন্ধ্যায় একখানা ফিটন ভাড়া করে' ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দুই চক্কর দিয়ে আসা এই অধমের একটা ব্যসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচ্য ইউরোপের এ বিলাসটুকু প্রতীচ্য ইউরোপের গতি-সভ্যতা-নিপীড়িত প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে নিতান্ত উপভোগ্য। ভারশৌএ নিজের মোটার ছেড়ে

ফিটনে সপরিবার হাওয়া খাচ্ছেন, এ রকম অতিবড় ইংরেজদেরও দেখা যেত। যাই হোক, ফিটনে চড়ে' বাড়ীর দিকে চলা গেল। যেতে যেতে আবার হঠাৎ আকাশে গুপ্তচরের সাঙ্কেতিক আতস-বাজি চোখে পড়লো। আকাশের বুকে শুক-তারাগুলি একটি নেববার আগেই আর একটি জ্বলে' উঠছে। পথে একজন পাহারাওয়ালার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। জানা গেল, পোল সরকারের এ বিষয়ে কড়া নজর আছে। কিন্তু বাজিগুলো যে কোথা থেকে ছাড়া হ'চ্ছে, তা নির্ণয় করে' "বাজিকরের" হাতে হাতকড়া লাগানো, আর উড়ন্ত পাখীর পুচ্ছে লবণ-সমর্পণ, দুই-ই সমান।

পথে কোথাও সামান্য একটি কুটি পর্য্যন্ত পড়ে' নেই। সমস্ত ভারশৌএর পথঘাট যেন বল-নাচের মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। কারণ সহজেই অনুমান করা গেল। কর্তৃপক্ষ থেকে আগেই হুকুম দেওয়া হয়েছিল, যেন সহরের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নগরবাসীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। উড়োজাহাজ থেকে যদি ইপেরিৎ বা অন্য কোনো বিষ-মাখানো ছেলে-পুলেদের খেলনা, চকোলেট ইত্যাদি অথবা জাল নোট বা টাকা-পয়সা ফেলা হয়, যা সাধারণ মানুষে লোভসম্বরণ করতে না পেরে হঠাৎ তুলে নিতে পারে, এমন জিনিষ রাস্তায় পড়লে যাতে তা সহজেই পুলিস কিংবা নগররক্ষীদের চোখে পড়ে, সেইজন্যই এই পরিচ্ছন্নতা।

বাড়ী ফিরে কিছুক্ষণ রাদিও খুলে যুদ্ধের খবর শুনলাম। সেই একই কথা, জার্মানরা সমগ্র পোলদেশের ওপর সারাদিন ধরে' যথেচ্ছ বোমাবর্ষণ করেছে, এবং ইংরেজ ও ফরাসীদের এখনও দেখা নেই। ভেস্তেরপ্লাত্তে এখনও সমানে যুজছে, এবং আগের মতই রাদিওর সংবাদদাতা সৈনিকদের কাছে সেনানায়কের নিতান্ত নির্ব্যক্তিক উৎসাহবাণী পাঠাচ্ছেন। যতদূর মনে পড়ে, এর পরে ভারশৌএ বসে' ভেস্তেরপ্লাত্তের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। যুদ্ধের পর শুনলাম,

এক সপ্তাহকাল ধরে' দিনের পর দিন সমানে লড়াই করে' এই অল্পসংখ্যক পোল সৈনিক অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। জার্মানরা যখন বিজয়োল্লাসে শস্ত্রাগারে প্রবেশ করলে, তখন সেখানে পোলদের একজনও জীবিত নেই। জগতের ইতিহাসে ভেস্তেরপ্লাত্তের বীরত্বের কাহিনী যদি ভবিষ্যতে উল্লিখিত না হয়, ত সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ঠিক শুতে যাবার আগে রাদিওতে কে একজন ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা হাল্‌কা কথায় নগরবাসীদের প্রবোধ এবং সাহস দিতে প্রয়াস পেলেন। মনে আছে, ভারি প্রীতিকর তাঁর গলার স্বর এবং সুন্দর তাঁর বলবার ভঙ্গীটি। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ-শক্তি তাঁর চেহারা না দেখেও উপলব্ধি করা যায়। তাঁর কাছেই শোনা গেল, লন্দনে নাকি যেসমস্ত বোমারু-শিকারী কামান বসানো হয়েছে, তার অনেকগুলিই পোলদেশে তৈরী। একথা তিনি সম্প্রতি লন্দন-প্রত্যাগত এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন। সুতরাং ভয় কী? যে পোলরা ইংরেজদের পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করতে পারে, নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে যে তাদের কাছে কত কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ থাকা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। বক্তার অভিপ্রায় ছিল, এই কথাটি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরে পোলদেশের আত্মরক্ষায় বন্ধুদের দেশে চালান দেওয়া (অবশ্য যদি তা সত্যি হয়) এই বোমারু-শিকারী কামানগুলোরই বিশেষ কমতি পড়লো।

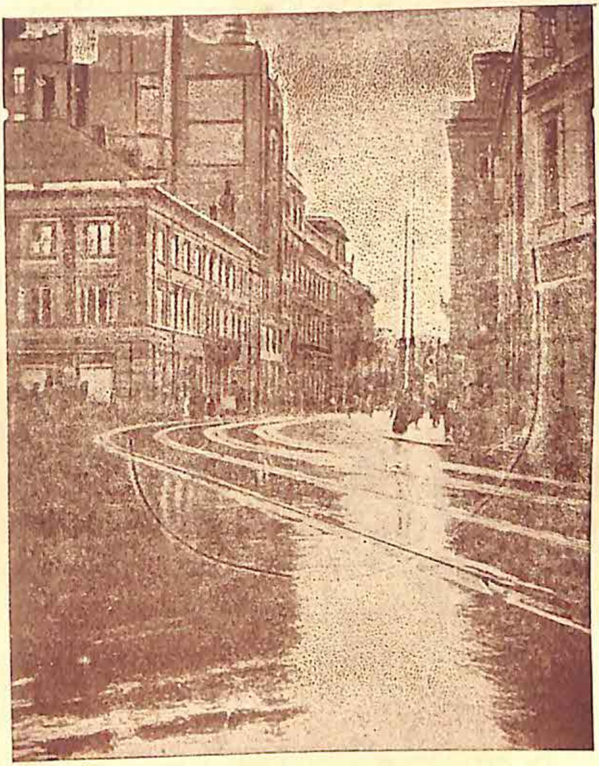
আজ শুতে যাবার সময় পোষাক বদলান হলো না। কী জানি, হয়তো গভীর রাতে, সুপ্ত নগরীর ওপর আবার বিমান-আক্রমণ হবে! বিছানায় শুয়ে বারে বারে মনে পড়তে লাগলো—"মানুষ, সিংহ, ঈগল, তিতির, শিং-ওয়ালা হরিণ, রাজ-হাঁস, মাকড়সা, জলচর, শব্দহীন মাছ, সাগর-তারকা...।" কে জানে, এই সরল, অনাড়ম্বর কথাগুলোর মধ্যে কী এক নিহিত শক্তি আছে যা আমার মনকে আজ এমন করে' পেয়ে বসলো!

৩রা সেপ্টেম্বর।

ভোর পাঁচটার সময়, একরকম প্রায় ঘড়ি ধরে' জার্মানরা কাজ আরম্ভ করলে। আজকের আক্রমণে মনে হ'লো, জার্মানদের রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি, এবং সকালে কড়া কাফির সঙ্গে বেশ খানিকটা ব্লূদ্-ভূস্ত বা জমাট শূকর-রক্তে তৈরী সসেজ তাদের পাতে পড়েছে। নতুন তাকৎ ও উদ্যম সহকারে তারা সহরের ওপর, স্রেফ্ জীবনানন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে, বোমা ফেলতে সুরু করলে। সকাল থেকে মেশিনের ওপর বই-লেখার কাজ চালাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে তা অসম্ভব হয়ে উঠলো। মানুষ অনেকসময়ে একা থাকতে ভালবাসে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরা স্বভাবের নিয়ম হ'লেও, মরণের ঐ একাকীত্বটাই বোধ হয় সব চেয়ে ভয়াবহ। তাছাড়া বাঙ্গালী-সুলভ নরক গুলজারের প্রবৃত্তিটাও দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো। কথাটা ওদেশ-প্রবাসী, সোদর-প্রতিম একটি কাফ্কাসী (ককেশীয়) মুসলমান বন্ধুর কাছে টেলিফোঁ-যোগে ব্যক্ত করলাম। বাড়ীতে বসে' হরিনাম করার চেয়ে একটা কাফি-খানায় আড্ডা জমিয়ে বসা, অধিক বাঞ্ছনীয় বোধ হ'লো। কাফ্কাসী বন্ধুটির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে', কাঁধে গ্যাস্-মুখোস ঝুলিয়ে নির্দিষ্ট কাফি-খানা অভিমুখে রওনা হ'লাম।

উক্ত কাফি-খানাটি আমার ওখান থেকে মিনিট পঁচিশের পথ, প্রাচীন পল্লী পার হয়ে বেশ অনেকটা হেঁটে যেতে হয়। কিন্তু পথে বেরিয়ে প্রাচীন পল্লী পার হওয়াই দুরূহ হয়ে উঠলো। দু'পা যাই, আর মাথার ওপর বোমারুর গর্জন শুনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে কল-বন্দুকের গুলি শিলা-বৃষ্টির মত রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। ছুটে পাশের একটা বাড়ীতে আশ্রয় নিই। জার্মানরা যেন সুধু আমাকেই মারবার চেষ্টা করছে। এই রকমে দু'পা দু'পা করে' এগিয়ে প্রাচীন পল্লী ছাড়িয়ে আসতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। তার পর বড় রাস্তায় পড়ে' আর এগুনো অসম্ভব হয়ে উঠলো। খুব কাছেই ভারশৌএর প্রাচ্য-ভাষা বিদ্যালয়। সেখানেও অধ্যাপনা করতাম। কাজেই দু'একজন পরিচিতের সাক্ষাৎ পাবার আশায় সেখানেই ঢুকে পড়লাম। প্রকাণ্ড ইমারৎ। নাপোলেওঁ মস্কৌ-অভিযানের পথে ভারশৌএর এই বাড়ীটিতে কিছুদিন বিশ্রাম করেছিলেন, এবং এখানে অভিজাতা একটি পোল-সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর প্রেম-বিনিময় হয়। সুতরাং ঐতিহাসিকদের পক্ষে বাড়ীখানা তীর্থস্থান বললেই চলে। সেকেলে প্রাসাদ, কেল্লার দেওয়ালের মত পুরু তার দেওয়াল। সিঁড়ির ধাপগুলো এত চওড়া যে, কে এক পোলীয় বীর নাকি এই সিঁড়ি দিয়ে তাঁর সাদা ঘোড়ায় চড়ে' একেবারে চারতলায় গিয়ে উঠতেন, প্রবাদ আছে। এই সিঁড়ির তলায় পথ-চলা মানুষ আর প্রাচ্য-ভাষা বিদ্যালয়ের দারোয়ান-বেয়ারারা এসে আশ্রয় নিয়েছে।

আবার ঘণ্টাখানেক আটক পড়লাম। চারিদিকে বোমা পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকাণ্ড প্রাসাদখানা বেতস-পত্রের মত কাঁপছে। পুরাণো বাড়ী, বহু শতাব্দী ধরে' মানুষের সহবাসে হয়তো তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পুরাণো বাড়ী বা পীঠস্থানের যে আত্মা বলে' কোন জিনিষ থাকতে পারে, তা সেদিন প্রথম চোখে পড়লো। লক্ষ্য



উলীৎসা মিঅদভা। বাঁদিকের তৃতীয় সৌধটি প্রাচ্যভাষা বিদ্যালয়। এই রাস্তাতেই অধুনা-বিলুপ্ত মুদ্রালয়ে ইউরোপে প্রথম সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

করলাম, মাথার ওপর বোমারুগুলো ধাতব চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে উড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীখানা যেন আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে। এ আমার নিছক কল্পনাও হ'তে পারে।

মরণকালে যীশু-নাম করা এদেশেও রীতি দেখলাম। "আশ্রিত" নরনারী নতজানু হয়ে, বুকে ক্রুশ্-চিহ্ন আঁকার মত হস্ত সঞ্চালন করে', "পাতের্-নস্তের্" জপতে বসলো। এরা যদি মারা যায়, ত আমি যে মৃত্যুকে কদলী দেখিয়ে এ বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে পা দিতে পারবো, এমন বিশ্বাস হ'লো না। কাজেই নিজেকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে হাতের গত সপ্তাহের Times Educational Supplement-খানায় গভীর-ভাবে মনোনিবেশ করলাম। চারিপাশের মানুষ মন্ত্রের শক্তিতে যে ভাবে নিজেকে হিপ্নোটাইজ্ করে ফেলতে চেষ্টা করছে, তার চেয়ে Educational Supplement-এর কড়াপাকের রচনায় নিজেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলা ঢের সহজ বলে' মনে হ'লো। যাই হোক্, বোমরুরা চলে' গেল, এবং আমিও পূর্বের মত সুস্থ শরীরে পথে বেরুলাম।

কাহ্বে-খানের মোলাকাৎ-এর নির্দিষ্ট সময় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেলেও, বন্ধুর সাক্ষাতের ক্ষীণ আশায় সেইমুখো ধাওয়া করলাম। এবার সত্যিই স্বীয় স্বভাব-বিরুদ্ধ-ভাবে পা চালিয়ে চললাম, অর্থাৎ নেহাৎ যুদ্ধের সময় না হ'লে আমার গতিতে আশপাশের মানুষের আমায় পলায়মান চোর বলে' ভুল হ'তে পারতো। পথটাকে যতদূর সম্ভব খাটো করবার জন্যে অলি দিয়ে গলি দিয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু খুব বেশীদূর এগুনো গেল না। আবার আক্রমণ সুরু হ'লো।

এইবার প্রথম একখানা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিত-কামরায় আশ্রয় নিলাম। সব রকমের মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে, অভিজাত-সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ, চাষা-ভূষো, মুটে-মজুর। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সব মানুষের মুখে একই

ভাব প্রকাশ পায়, এ ভারি মজার জিনিষ। পুঁজীতন্ত্রীর হাতের দামী সিগার পুড়ছে নিঃশব্দে ধূপের মত। মজুরের মুখ শ্বেত-পাথরের মত সাদা, যেন জ্বলন্ত-কারখানার একখানা লোহার বর্গা তার মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করছে, পালাবার পথ নেই। চাষী বুড়ী একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে' থরথরিয়ে কাঁপছে, ওষ্ঠাধর নড়ছে মা মারীয়ার কাছে একান্ত প্রার্থনায়।

আমাদের ঠিক মাথার ওপরে যুদ্ধটা চলেছে। বোমারু বিমান যদি একখানাও জখম হয়ে পড়ে আমাদের বাড়ীটার ওপর ত ছ'তলা ইমারৎখানা যে ধূলিসাৎ হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। খুব কাছেই হুদ্দাড় করে' হুমড়ি খেয়ে পড়লো একখানা সাততলা বাড়ী। কিছু পরেই শত্রুরা তাদের আংশিক ধ্বংসলীলা শেষ করে' ফিরে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সাততলা বাড়ীখানা উপুড় হয়ে পড়েছে। প্রায় তিন তলার সমান ইট, কাঠ আর লোহার ভগ্নস্তূপ। তার তলায় চাপা পড়েছে শ দুই তিন মানুষ, মাটির নীচে যারা "আশ্রয়" নিয়েছিল। তাদের ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করা অন্ততঃ মাসখানেকের কাজ। কিন্তু অবিরত বোমাবর্ষণে সে কাজ করবে কে? মাটির গর্ভ থেকে তাদের আর্ত স্বর শোনা যাচ্ছে, "বাঁচাও, বাঁচাও"।* দৃশ্যটা প্রাণপণে ভোলবার চেষ্টা করতে করতে বাড়ী ফিরলাম।

সেদিন দুপুরে বাড়ী ফিরে মনে হ'লো, সারা জীবন যেন শ্মশানে চণ্ডালগিরি করে' এসেছি। এর কতদিন আগে, বাল্যকালে, গভীর রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে' বাড়ী ফেরার পথে একজন মোটার চাপা পড়ে' মারা যায়, স্বচক্ষে দেখেছিলাম। সেদিন প্রথম নিহত মানুষের রক্তাক্ত চেহারা চোখে পড়ে, এবং সে দৃশ্য বহুবৎসর ধরে' অনেক চেষ্টা করেও ভুলতে

* লেখকের রাদিও-বক্তৃতায় দৃশ্যটি বিবৃত হয়েছিল।

পারি নি। আজ, একটু আগে অতগুলো মানুষের প্রাণসংহার আর মুমূর্ষুর আর্ত সাহায্য-যাচ্ঞা নেহাৎ মামুলি জিনিষ বলে' বোধ হ'লো। নির্বিকার, অবিচলিত চিত্তে খাবারের থালা সাজিয়ে বসলাম।

ঝির এক দেশ-ওয়ালী সখী ভারশৌএ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তার কাছে এক বিচিত্র বিবরণ শোনা গেল। পোলদেশের পশ্চিম অঞ্চলে তাদের বাড়ী। ১লা সেপ্টেম্বর সে অঞ্চলে জার্মানদের আক্রমণ এমন ভীষণ হয়ে দাঁড়ালো যে, ছোটোখাটো সহর এবং গ্রামের মানুষেরা যে যেদিকে পারলে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাতে সুরু করলে। মেয়েটি ঐদিনই ট্রেনে চড়ে' ভারশৌএ তার মাসীর কাছে আসবার জন্যে রওনা হ'লো। শুনলাম, জার্মানরা দিনের বেলায় ট্রেন চালানো অসম্ভব ক'রে তুলেছে, এবং রেলের লাইনের ওপর বোমা ফেলে ট্রেন চলাচলও প্রায় বন্ধ করে' ফেলেছে। ১লা সেপ্টেম্বর সারারাত ধরে' নানা ঘোরা পথ দিয়ে তাদের ট্রেন ভারশৌ লক্ষ্য করে' আসছিল। যখন ভোর হ'লো তখন তারা ভারশৌএর মাইল তিরিশ দূরে একটা ছোট সহরের কাছে এসে পড়েছে। এমন সময় দূরে উড়োজাহাজ দেখা গেল। সকালবেলা বিমান-দর্শনের ফল কী তা তাদের কালকের অভিজ্ঞতায় উত্তমরূপে জানা ছিল। কাজেই যাত্রীরা ট্রেন ছেড়ে পালাতে উদ্যত হ'লো। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই যখন জাহাজখানা কাছে এসে পড়লো, তখন তারা আশ্বস্ত হয়ে দেখলে সেটা পোলদের। আস্তে আস্তে ট্রেন চলতে সুরু করলে, এবং উড়োজাহাজখানা খুব নীচু হয়ে একেবারে ট্রেনের ওপর এসে পড়লো। হুবহু পোলীয় বোমারু-বিমান, তা'র ডানার তলায় লাল আর সাদা রঙের চৌকো চৌকো ছক কাটা। আশ্বস্ত হয়ে ট্রেনখানা যখন আবার বেশ জোরে চলতে সুরু করেছে, ঠিক সেই সময়ে এই "পোলীয়" বোমারু থেকে

পোলদের ওপর যথেচ্ছ বোমাবর্ষণ আরম্ভ হ'লো। ইঞ্জিনখানা বোমার চোটে লাইন ছেড়ে ছিটকে পড়লো। একটু দূরে গিয়ে গাড়ীগুলো থামলো, কোন-কোনটা ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে পড়লো। যারা কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচিয়ে মাঠ দিয়ে ছুটে পালাতে লাগলো কল-বন্দুকের গুলিতে তাদের বেশীর ভাগকেই ধানকাটা করলে। মেয়েটি কোনরকমে আত্মরক্ষা করে' পায়ে হেঁটে আজ সকালে ভারশৌএ এসে হাজির হয়েছে। আপন জাতীয় সম্মানকে বিসর্জন দিয়ে শত্রুপক্ষের জাতীয় পতাকাকে "কামুফ্লাঝ্"-রূপে ব্যবহার করা, এ এক অভিনব রণচাতুর্য্য।

বিকেলের দিকে রাদিও-যোগে খবর পাওয়া গেল, শীঘ্রই মিতাদ্বয় জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। এ সংবাদে মুহ্যমান ভারশৌ যেন উৎসবের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অবিরত বোমা-বর্ষণকে তুচ্ছ করে' হাজারে হাজারে নগরবাসী ছুটলো ব্রিতানী রাষ্ট্রদূতের দৌলৎখানার দিকে। পথে লোক ধরে না, বেশীরভাগই অবশ্য স্ত্রীলোক, কারণ সহরে বেশী পুরুষ নেই। কিছু পরে রাদিওতে খবর পাওয়া গেল, পোলদেশের সঙ্গে সহায়তার চুক্তিবদ্ধ ইঙ্গস্থান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। রাষ্ট্রদূত স্তর হাউয়ার্ড্ কেনার্ড্ যিনি তাঁর ভাবভঙ্গী এবং কার্য্যকলাপ দ্বারা পোলদের বুঝতে দিয়েছিলেন যে, পোলদের সাহায্যকল্পে ইংরেজদের তিনি টেনে এনে যুদ্ধে নামাতে সমর্থ হবেন, সেই স্তর হাউয়ার্ড্ আজ আনন্দে আত্মহারা হ'লেন। স-বেক্-সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে জনতার সম্বর্দ্ধনা-ধ্বনি গ্রহণ করলেন, এবং খাঁটি ইংরেজী উচ্চারণে পোলভাষায় জয়-হুঙ্কার ছাড়লেন—"স্তেখ্ ঝ্যীয়ে পোল্স্কা!"—পোল মাঈ কী জয়! তাঁর উত্তেজিত, বিজয়-গর্বে গর্বিত মুখ-ভঙ্গী দেখে এবং তাঁর ইংরেজ-দুর্লভ জয়ধ্বনি শুনে সবাই আশ্বস্ত হ'লো, পঞ্চাশ কোটি ব্রিতানী প্রজা এবার আট কোটি জার্মানদের নাস্তানাবুদ করে' ছাড়বে।

ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের দৌলৎখানা ছেড়ে এবার জনতা ফরাসী রাষ্ট্রদূতের আস্তানার দিকে ধাওয়া করলে। সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "ভীভ্ লা ফ্রাঁস্", "ভীভ্ লা রেপ্যুব্লিক্"-প্রভৃতি জয়তু-শব্দে আকাশ ফাটিয়ে এবং "মার্স্যায়েজ্"-কীর্তনে গলা ভেঙ্গে পোলরা অবশেষে জানতে পারলে, ফরাসীরাও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ "ঘোষণা" করেছে। তবে রাদিও-যোগে খবরটা যেভাবে পাওয়া গেল, তাতে মনে হ'লো ফরাসীরা খুব স্বেচ্ছায় যোগদান করলে না। এমন কি বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল, ফরাসীদের নামবার ইচ্ছা ছিলই না। ইস্কুল-পালানো ছেলেদের যেভাবে চ্যাংদোলা করে' ধরে' আনা হয়, বা মদ্যপ ইয়াররা দলভুক্ত নতুন-ইয়ারকে যেভাবে ধরে-পাকড়ে শুঁড়ির দোকানে টেনে নিয়ে যায়, অথবা বিদ্রোহী ছেলেকে গলায় গামছা দিয়ে যেভাবে আল্পনা দেওয়া পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়, ফরাসীদের যুদ্ধে নামানো ঠিক সেই ধরণের বলে' মনে হ'লো।

যাই হোক, অবশেষে মিতাদ্বয়ের যুদ্ধে অবতরণের খবর শুনে পোলদের ধারণা হ'লো, রাত বারোটা আন্দাজ সময়ে পশ্চিমদিক থেকে জার্মানী লক্ষ্য করে' তাল তাল গোলা ছোঁড়া হবে, এবং পরের দিন ভোর হ'তে না হ'তেই জার্মানীর আকাশে ইংরেজ ও ফরাসী বোমারু বিমান হেমন্তের ঘনঘটার ভ্রম উৎপাদন করবে। প্রতীচ্য অভিধানে "যুদ্ধ-ঘোষণা" ও "যুদ্ধ-আরম্ভ" এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য যে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং "ঘোষণা" ও "আরম্ভের" মধ্যে ছ'মাসের ব্যবধান থাকলেও তাতে যে আন্তর্রাষ্ট্রিক আইন অমান্য করা হবে না, একথা প্রাচ্য পোলদের জানা ছিল না।

উৎসব-মত্ত জনতাকে বাড়ী ফেরানো পোল সরকারের পক্ষে একটা দায় হয়ে উঠলো। পথে জায়গায় জায়গায় ভিড় করে' লোকে যুদ্ধের আলোচনা করছে, আর না হয় রাস্তা জুড়ে দলে দলে মানুষ "God save the King" বা "Allons enfants de la patrie"-প্রভৃতি

সঙ্কীর্তন গাইতে গাইতে চলেছে। রাদিও-যোগে বারংবার উন্মত্ত জনতাকে সাবধান করে দেওয়া হ'তে লাগলো, যেন তারা রাস্তায় ভিড় না জমায়, কারণ ভিড় দেখলেই জার্মানরা বোমা ফেলতে সুরু করবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ইংরেজ, ফরাসী আর পোলরা মিলে যে হপ্তাখানেকের মধ্যে হিট্‌লারকে বন্দী করে', তাঁর মাথায় ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে, এই পূর্ব-প্রত্যাশার আনন্দ তাদের রাখবার জায়গা নেই। কিন্তু যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, হ'লোও ঠিক তাই। জার্মানরা ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ শুনে তাদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্যে দ্বিগুণ উৎসাহে সুরু করলে পোলদের ধ্বংসীকরণের কাজ। ভারশৌ লক্ষ্য করে' হু হু করে' উড়ে এলো জার্মান বিমান-বাহিনী, এবং নিরস্ত্র জনতাকে বাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিচারে কল-বন্দুকের গুলিতে কচু-কাটা, আর না হয় বোমা ফেলে নিশ্চিহ্ন করতে লাগলো। যারা ইংরেজ ও ফরাসীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই ফিরল না।

পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে আর একটি হিট্‌লারী গুপ্তচরের দর্শন হ'লো, ইনি সত্যিকার "আর্য্য-কৌরব।" ব্যাপারটা যে ভাবে চোখে পড়লো তা এই : সহরের রাস্তা দিয়ে নানা রকমের লোক যেমন রোজ চলে আজও তেমনি চলেছে, নাগরিক, সৈনিক ইত্যাদি। হঠাৎ একটি সৈনিককে একজন পাহারাওয়ালা পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তার পরিচয়-বিষয়ক কাগজপত্র দেখতে চাইলে। তার পোষাক-পরিচ্ছদের প্রত্যেকটি খুটি-নাটিতে অ-পোলীয় বিন্দু-বিসর্গ চোখে পড়ে না। পোলীয় উর্দি, ঠিক সেই রঙের, সেই ছাঁট-কাটের, পোলীয় সামরিক "চাপ্‌কা" বা টুপি, পোলীয় তক্‌মা, পোলীয় ঈগল-মার্কা বোতাম, সমস্ত হুবহু পোলীয়। সৈনিকটির পায়ে গুরুতর চোট লেগেছে বলে' মনে হয়, কারণ পায়ে তার ব্যাণ্ডেজ

বাঁধা, আর সে দু'খানি খঞ্জের যষ্টি বগলে চেপে অতি কষ্টে পথ দিয়ে চলেছে। পুলিসের সওয়ালের জবাব দিতে গিয়ে তার মুখের পোলভাষার জার্মানী ঢংকে বেচারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকা করতে পারলে না, যদিচ লক্ষ্য করলাম পোলভাষা সে মন্দ বলে না।

পুলিসের তার ওপর সন্দেহ হওয়ার কারণও অদ্ভুত, শুনলাম। তার নিখুত বেশ-ভূষার মধ্যে একটি অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছিল, তা' তার নীল চশমা জোড়াটি। বোঝা গেল, এই হৈট্‌লারটিকে উড়োজাহাজ থেকে পারাশ্যুট্‌-যোগে নামিয়ে দেওয়া হয়। নামতে গিয়ে বেচারার পাটি যায় গুরুতর রকমে মচকে। তার পর কোনো উপায়ে খঞ্জের যষ্টি দু'টি জোগাড় করে' সে আপন কার্য্যসিদ্ধি করবার জন্যে নগর-পর্য্যটনে বেরিয়েছে। কিন্তু সে যে এই অবস্থায় কাজ করতে বেরিয়েছে এবং তার ফল যে কি হ'তে পারে, সেই চিন্তা বোধ করি তাকে দস্তুরমত বিচলিত করে' ফেলে। তাই সে চোখের ভয় বা অস্বাভাবিক প্রকাশকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করবার জন্যে কিনেছে এক জোড়া নীল চশমা। এইখানেই সে তার কাজে কাঁচামির পরিচয় দিলে। কারণ চশমা কেনবার আগে তার লক্ষ্য করা উচিৎ ছিল, সহরে এ ধরণের চশমার রেওয়াজ আছে কি না। প্রথমতঃ তখন ভারশৌএ হেমন্ত পড়ি পড়ি করছে, এবং রৌদ্রের তাপ খুব প্রখর নয়, দ্বিতীয়তঃ সময়টা বিকেল, এবং তৃতীয়তঃ জার্মানীতে রঙিন চশমার খুব চলন বটে, কিন্তু পোলদেশে সাধারণতঃ, অর্থাৎ খুব দুর্বল চোখ না হ'লে, কেউ রঙিন চশমা পরে না। যাই হোক, তাকে গ্রেপ্তার করে' পুলিস নিয়ে চললো সৈন্যের ঘাঁটির দিকে। বেচারার আতঙ্কিত, কাঁচুমাচু মুখ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভুলতে পারলাম না।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমানে চললো জার্মানদের নির্বিবেক ধ্বংসলীলা। ভারশৌএর দুর দূর পল্লীতে যেসব ঘটনার বিবরণ পড়ছিলাম, গত দু'দিন

ধরে'—বিধ্বস্ত সৌধ, শত শত নারী ও শিশুর জীবন্ত সমাধি, নিহত বা আহত নরদেহের বিবমিষা-জনক অবস্থা, তা আজ পদে পদে প্রত্যক্ষ করবার দুর্ভাগ্য ঘটলো। স্বাভাবিক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মন যে পারিপার্শ্বিক কদর্য্যতার সঙ্গে এমন সহজে নিজেকে কী এক অদ্ভুত উপায়ে খাপ খাইয়ে নিলে, তা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারলাম না।

সন্ধ্যার একটু পরেই আবার ভারশৌএর আকাশ চাঁদের আলোয় ভরে' গেল। জার্মানরা সেদিনকারমত আক্রমণ স্থগিত রাখলে। বাড়ী ফেরবার পথে সেদিন প্রথম চোখে পড়লো ভারশৌএর কোনা কোনো বাড়ীর ওপর অনেক উঁচুতে বেলুন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিমান-বিতাড়ক বেলুন চার পাঁচটির বেশী নজরে পড়লো না। এক একটি বেলুনের দড়ীতে লট্‌কে এক একখানা উড়োজাহাজ যে ধরাশায়ী হ'তে পারে, এ আশা পোলদের মনে এখনও জেগে আছে দেখে, একটু হাসি পেল।

পথে লোক-চলাচল কমে' আসছে। মাঝে মাঝে সৈন্যের দল চাপা গলায় গান গাইতে গাইতে রাত্রির নিস্তব্ধতা আলোড়িত করে' চলেছে—Raz, dwa! Raz, dwa!—এক, দুই! এক, দুই!

কী এক বস্তুহীন, লক্ষ্যহীন, অকারণ বিষাদে মনটা ভারী হয়ে ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে মনকে স্পর্শ করে এমন একটি অনুভূতি যাকে রুশীরা বলে—তস্কা, পোলরা বলে—ত্যাঙ্ক্‌নতা। একি শুধু হেমন্তের বাদল সন্ধ্যার কায়াহীন বিরহ-বিষাদ!

৪ঠা, ৫ই সেপ্টেম্বর।

এই দু'দিনের ইতিহাসে কোনো ঘটনা-বৈচিত্র্যের কথা মনে পড়ে না, অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই একঘেয়ে বোমা-বর্ষণ আর কল-বন্দুকের গুলির শিলাবৃষ্টি। ভারশৌএর "আত্মরক্ষার" ব্যবস্থা তখনো দস্তুরমত "বলীয়ান্", রাদিও মার্ফৎ খবর পাচ্ছি। ব্লিৎস্-যুদ্ধে "আত্মরক্ষা" বলতে যা বোঝায় তা এই ঃ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ আক্রমণ করতে আসবে, এবং তাদের লক্ষ্য করে' অবিরত বোমারু-শিকারী কামান দাগা হবে। তাতে বোমারুরা কিঞ্চিৎপরিমাণে ইতস্ততঃ করতে বাধ্য হবে। তবে শীঘ্রই তারা আবিষ্কার করবে, কোন্ কোন্ জায়গা থেকে তাদের লক্ষ্য করে' অপমানসূচক শব্দ করা হ'চ্ছে। এবং মরিয়া হ'য়ে উঠে তারা একেবারে নীচে নেমে এসে সেই সেই ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করতে সুরু করবে। তারপর খানিকক্ষণ অবধি চলবে অসহায় নাগরিকদের ওপর অজস্র বোমা-বর্ষণ, যতক্ষণ না নূতন ঘাঁটি থেকে আবার কামানদাগা সুরু হবে। মোট কথা, বোমারু আর শিকারীতে চলবে লুকোচুরী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে', এবং আনুসঙ্গিকভাবে শত শত নিরস্ত্র, নিঃসহায় নরনারী, বৃদ্ধ ও শিশু, ইট, কাঠ আর লোহার স্তূপের তলায় জীবন্ত সমাধি লাভ করবে। আধুনিক

যুদ্ধের অভিধানে যে "আত্মরক্ষা" অর্থে লেখে "প্রতি-আক্রমণ", তা পোলরা তখনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। কারণ, ৪ঠা তারিখেও পোল সরকার ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূতকে মধ্যবর্তী করে' জার্মানদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, অসামরিক কেন্দ্রের ওপর অযথা আক্রমণে জার্মানরা আন্তর্জাতিক রণপ্রথার অবমাননা করছে।

যাই হোক, এই দু'দিন ধরে' চললো ভারশৌএর ভেতর এই ধরণের নিতান্ত "বে-আইনী" অনধিকার-প্রবেশ, এবং পোলরাও (মিতাদ্বয়ের সু-পরামর্শে কিনা জানি না) ডাউনিং ষ্ট্রীট্-ই কায়দায়, পরিমার্জিতভাবে তার ঘোরতর প্রতিবাদ ওলন্দাজ সরকার মার্ফৎ জার্মানদের পাঠাতে লাগলো। আপত্তির প্রত্যুত্তরে জার্মানরা তাদের আক্রমণের মাত্রাকে দুই দিয়ে গুণ করলে মাত্র।

মনে আছে আমার ঐ প্রাচীন পল্লীর "আ-স্রা-মা"-টিতে একদণ্ডও টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। যতবার বাড়ী ফিরে একটু স্থির হয়ে বসতে যাই, ততবারই চোখে পড়ে **রুফনু**। এতে নিজ চোখে দেখা জীবন্ত কবরের ছবি এমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অসহ্য হয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।

আপন অভিজ্ঞতা এবং পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করলাম। অবশ্য আগেই বলে' রাখা ভালো, এজাতীয় উপায় অবলম্বন করতে হ'লে চাই বেপরোয়া নির্ভিকতা এবং কপালের জোর। দ্বিতীয়তঃ আক্রমণের সময়ে এই উপায় অবলম্বন করা মাত্র দু'একজনের পক্ষেই সম্ভব; একাধিক লোকের দ্বারা তা অনুসৃত হ'লে সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়।

ব্যাপারটা এই: এই ক'দিনে লক্ষ্য করা গেল, ভিত-কামরার আশ্রয়-গুলিতে শত শত মানুষের সজ্ঞানে কবর-লাভ হ'লো। পার্কের ভেতর যে সব "আশ্রয়"-গুহা বানানো হয়েছিল সেগুলি সাধারণতঃ বড় বড় গাছের

তলায় আত্ম-গোপন করাতে জার্মানদের ধারণা হ'লো, ঐ গাছগুলির তলায় তলায় দলে দলে সৈনিক গা-ঢাকা দিয়েছে, এবং সহরের যেখানে যেখানে বড় বা মাঝারি রকমের গাছ তাদের পেরিস্কোপ-গোচর হ'লো, সেইখানে সেইখানে একেবারে টিপ্ করে' তারা বোমা ফেলে গেল। ফলে, "আশ্রিত" মানুষের বোমা-বিধ্বস্ত, বিকৃত দেহাংশ কতক মাটির সঙ্গে মিশলো, কতক রাস্তা-ঘাটে যত্রতত্র বিকীর্ণ হ'লো। লক্ষ্য করলাম, রাস্তার ওপর বোমা পড়ছে সব চেয়ে কম, কারণ "আশ্রয়"-গুলির দৌলতে পথ-ঘাট একেবারে ফাঁকা, এবং যেখানে একটি লোকেরও প্রাণসংহারের আশা নেই, সেখানে উলুবনে মুক্তো ছড়ানো জার্মানদের কুষ্ঠিতে লেখে না। রাস্তায় অবশ্য বিপদ কম নয়, কারণ কল-বন্দুকের শিলাবৃষ্টি চারদিক থেকে ঠিকরে এসে রাস্তাতেই জড়ো হয়; তাছাড়া বোমার উদরস্থ গ্রেনেড্-এর লংজাম্প্ ও হাইজাম্প্-গুলো রাস্তার ওপরই বেশীরভাগ হয়ে থাকে। তত্রাচ মোটামুটি রাস্তাতেই যমদূতের যাওয়া-আসা অপেক্ষাকৃত কম বলে' মনে হ'লো। হিসেব করে' দেখা গেল, লটারীতে লাখটাকা জেতা যেমন ব্রাহ্মণ-সন্তানের পাথর-চাপা কপালে লেখে না, তেমনি হয়তো ঐ দুর্ভাগ্যটুকুর ক্ষতিপূরণরূপেও গুলি বা গ্রেনেড্-এর স্পর্শসুখ লাভ করা ঘটে' উঠবে না। সুতরাং প্রায় সারাটা দিন কাটে পথে পথে, কখনো বা কাফির আড্ডায়!

রাতে শুতে যাবার আগে রাদিওতে যুদ্ধের খবর পাই। সেই একই ধ্বংসলীলার ইতিবৃত্ত। তবে দু'একটা নতুন খবর পাওয়া গেল। জার্মানরা অনেক জায়গায় গ্রামে গ্রামে, যেখানে চাষাদের কাছে নিরাপত্তা সম্বন্ধে সবরকম নির্দেশ এখনো পৌঁছয় নি, সেসব জায়গায় উড়োজাহাজ থেকে বিষ-মাখানো ছেলেপুলেদের খেলনা ও চকোলেট, লজেঞ্চুস ইত্যাদি বা চাষার মেয়ের মনোহারী চক্চকে কাচের কণ্ঠহার বর্ষণ করছে। সুতরাং রাদিও-যোগে দূর গ্রামবাসীদের বারবার সাবধান করে' দেওয়া হচ্ছে, যেন

তারা ঐসব জিনিষ স্পর্শ না করে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানানো হ'লো যে, চকোলেট বা লজেঞ্চুসগুলি যে কাগজে মোড়া আছে তা হুবহু পোলীয় মিষ্টান্নকারদের ছাপা ঐ জাতীয় মিষ্টির কাগজে মোড়া।

আরো একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল, তা এই: আজ পর্য্যন্ত যেসব বিমান-সৈনিকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অর্থাৎ জাহাজে চোট লাগায় যারা পারাশ্যুট্-যোগে মাটিতে নামতে বাধ্য হয়েছে, তাদের বেশীর ভাগই কড়া মদের নেশায় একেবারে প্রায় বে-হেড্। বয়েস তাদের বেশী নয়, সতেরো, আঠারো, উনিশ। সবাই ভদ্রঘরের ছেলে, অনেকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্র। এরাই পালে পালে হয়েছে হিট্‌লারয়ুগেন্দ্ বা হিট্‌লারী তরুণের দল। অ-হৈট্‌লার সহপাঠীদের কিলিয়ে, চড়িয়ে, জামা ছিঁড়ে দিয়ে এরাই হৈট্‌লারদের দলবৃদ্ধি করেছে, এবং ইহুদীদের নাক খাম্‌চানোতে এদের দ্বিতীয় মেলে না। তত্রাচ এদের পরিবারের ঐতিহ্য বা শিক্ষার জলুস্ যদি পোলদের উচ্ছেদের কাজে বাধক হয়, সেই আশঙ্কায় এদের সুধু মদ খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় নি, পকেটেও মদের শিশি পূরে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক, নির্বিবেক যুদ্ধে বিবেককে বলি দিতে হ'লে যে কারণ-বারির প্রয়োজন হ'তে পারে, একথা নিরামিষাশী, অ-মদ্যপ হিট্‌লারের মাথা থেকে যদি বেরিয়ে থাকে ত বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হবার দরকার নেই। কারণ ইনি যখন যেমন সুবিধা হয়, সেই অনুসারে কখনো ধরেন বাঁশী আবার কখনো ধরেন অসি। তাছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইনি হ'চ্ছেন "শিল্পী"। এবং কৃতকার্য্য শিল্পীদের রেওয়াজই হ'চ্ছে, যা তাঁরা শিল্পে প্রকাশ করেন তা কাজে করেন না, এবং যা কাজে করেন তা শিল্পে প্রকাশ করেন না। ছোকরা কবি বা শিল্পীদের মধ্যে যারা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে গেছে তারা সুধু চেল্‌সী, ব্লুম্‌স্‌বেরী বা কার্তিয়ে লার্ত্যাঁ-র বোহেমিয়ার দলবৃদ্ধি বা পাগলা

গারদের পরিবার-বৃদ্ধি করে। যাই হোক্, এই ধরণের নয়া নয়া রণচাতুর্য্যের বিবৃতি প্রায়ই রাদিও-যোগে কানে আসে, এবং তা বিশ্বাস করতে মন বাধা পায় না। কারণ, ভারশৌএ স্বচক্ষে যে ধ্বংসলীলা দেখছি তার তুলনায় এসব প্রায় কিছুই নয়।

৫ই তারিখে সামান্য একটু ঘটনা-বৈচিত্র্য দেখা গেল। অর্থাৎ বোমার বর্ষা আর গুলির শিলাবৃষ্টিটা বেশ একটু চেপে এলো। কারণটা শুনলাম আমার কাফ্‌কাসী মুসলমান বন্ধুটির কাছে; উত্তর দিক থেকে ভারশৌ লক্ষ্য করে' যে বিরাট জার্মানবাহিনী আসছিল তা নাকি সহরের খুব কাছেই এসে পড়েছে, চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ মাইলের ভেতরেই। সুতরাং বিমান-আক্রমণের ঘাঁটি করা হয়েছে ভারশৌ থেকে মাইল চল্লিশ দূরে। অর্থাৎ জার্মানী উড়োজাহাজের পক্ষে তা বড়জোর ভবানীপুর থেকে ধর্মতলা; এবং এক উড়োনে ঘন্টা দুই বোমা ফেলে আবার অনায়াসে ঘাঁটিতে ফেরা যায়।

ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে জার্মানরা সহরময় বোমার পরিবর্তে পোল-ভাষায় ছাপানো কাগজের টুক্‌রো ছড়িয়ে গেল। তার সার মর্ম এই: "পোলগণ, এখনো সময় আছে আত্মসমর্পণ করো। যদি না করো ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হবার জন্যে প্রস্তুত হও। এইসঙ্গে তোমাদের আরো জানানো প্রয়োজন যে, ইংরেজ ও ফরাসীদের যে সাহায্য তোমরা আশা করছো, তা সুদূরপরাহত। তাদের পক্ষে তোমাদের সাহায্য করা অসম্ভব ত বটেই, উপরন্তু তারা পশ্চিম থেকেও আমাদের আক্রমণ করে নি। আত্মসমর্পণ করো, এখনো সময় আছে। হাইল্ হিট্‌লার!"

দেখতে দেখতে সহরের সর্বত্র, রাস্তাঘাটে সাদা কাগজের টুক্‌রো অসময়ে তুষারপাতের ভ্রম উৎপাদন করলে। পুলিস বা নগররক্ষীদল তা ঝাঁট দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরাল করবার প্রয়াসমাত্র করলে না। কারণ

জনসাধারণ জার্মানদের ধৃষ্টতায় হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। কেউ কেউ সন্দেহ করলে, হিট্‌লার এবার শান্তিস্থাপনের জন্যে এই ধরণের ছলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এবং ইংরেজ ও ফরাসীরা যে জার্মানদের এখনো আক্রমণ করে নি, এ খবর শুনে পোলরা বিকট অট্টহাস্যে আকাশ ফাটাতে লাগলো। হা-হা-হা-হা-হা! পশ্চিমে গুঁতো খেয়ে এখন ভালো মানুষটি সাজা হ'চ্ছে! বলা বাহুল্য, ব্রিতানী প্রজা হিসেবে পরিচিতদের সস্নেহ পিঠ-চাপড়ানি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ এই অধমের ওপর অবাধে বর্ষিত হ'লো। এবং এই অধমও এই সংক্রান্তে দু'একটা চায়ের নিমন্ত্রণ নির্বিবাদে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লো। ব্রিতানী কন্‌সুলাতে এখন নিশ্চয়ই ভীষণ কাজের ভিড়, সুতরাং বারে বারে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁদের বিরক্ত করা নিতান্ত অ-ব্রিতানী কাজ হবে ভেবে টেলিফোঁ-যোগে আমার অস্তিত্বের কথাটা তাঁদের মনে করিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করলাম। তাছাড়া আমি পুরুষ, এবং আপৎকালে Women and children first, এ ব্রিতানী প্রবাদ জগতে না জানে কে?

সুতরাং খাঁটি জেণ্টেল্‌ম্যানের মত স-সুট্ এবং স-বুট্ বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ সেদিন ঘুমন্ত অবস্থায় বণ্ড্ ষ্ট্রীটের উৎকৃষ্ট পোষাকের আচ্ছাদনে যেকোনো ব্যক্তিই এই অধমকে জেণ্টেল্‌ম্যান্ বলে' ভুল করতে পারতেন। কারণটা যদি স্পষ্ট করে' শুনতে চান ত তা এই যে, বোমার চোটে যদি আমার সর্বস্ব ব্যোমে বিলীন হয়, তাহ'লে দামী সুট্‌টা আর এ্যাবটের বাড়ীর জুতো জোড়াটাও যে অন্ততঃ আমার অঙ্গে থাকবে, সে সান্ত্বনাটা বড় কম নয়! তাছাড়া যদি পরলোকবাসই কপালে লেখা থাকে ত আজকালকার এই বণিক্-সভ্যতার যুগের ভগবানের কাছে দস্তুরমত ওয়েল্-ড্রেস্‌ড্ হয়ে না গেলে বিশেষ খাতির পাওয়ার আশা করা যায় কিনা সন্দেহ।

৬ই সেপ্টেম্বর।

ভোর থেকেই বোমাবর্ষণের বহরে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা গেল, কাফ্‌কাসী বন্ধুর অনুমান মিথ্যা নয়। উত্তর দিক থেকে যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারুর আমদানী হ'তে লাগলো, তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, ঐ অঞ্চলে সহরের অনতিদূরে জার্মানরা এসে হাজির হয়েছে। মুখে মুখে ভারশৌ-এ খবর এসে পৌছল যে, জার্মানরা নাকি বড় বড় লোহা আর ইস্পাতের কেল্লায় চড়ে' সহরের দিকে এগিয়ে আসছে। চাষাদের মুখে যেসব বড় বড় ট্যাঙ্ক্‌ আর আমার্ড্‌ কারের বিবরণ শোনা গেল, তাকে অশিক্ষিত, তমসাচ্ছন্ন-মস্তিষ্ক, গ্রাম্য মানুষের অতিরঞ্জন বলে' লোকে হেসে উড়িয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ খবরও পাওয়া গেল যে, পোলরা ঐ স্নায়ুহীন লোহা-লক্কড়ের সঙ্গে নিজের রক্ত, মাংস, পেশী দিয়ে সমানে লড়ছে। এমন কথাও শুনছি, জর্মান ট্যাঙ্ক্‌-বাহিনীকে পোল অশ্বারোহী সেনা সবলে আক্রমণ করছে। মরতে মরতে যারা তাদের কাছে গিয়ে পৌছতে পারছে, তারা হাত-গ্রেনেড্‌ বা পেট্রোল দিয়ে ট্যাঙ্ক্‌ আর আর্মাড্‌-কার জ্বালিয়ে দিয়ে তার ভেতর জার্মানদের জীবন্ত দগ্ধ করছে। পরে যখন একেবারে যুদ্ধের ভেতরে গিয়ে পড়েছিলাম, তখন উপলব্ধি করে-

ছিলাম, এসব বিবরণ চাষাদের কল্পনা-প্রসূত নয়। যাই হোক্, পোলরা সহরের বাইরে, মাঠে-ঘাটে যতই বীরত্ব এবং সাহসের সঙ্গে লড়ুক্ না কেন, তাতে ভারশৌ-এর ওপর বিমান আক্রমণের উপশম ত হ'লোই না, উপরন্তু ক্রমেই তার মাত্রা বেড়ে চললো।

এতদিন যে অন্ততঃ রাস্তা-ঘাটে অপেক্ষাকৃত নিরাপদভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে বিচরণ করা যাচ্ছিল, এবং এমন কি কাহ্‌বে-খানের নরক গুলজার করে' বসা যাচ্ছিল, তাও আজ দুরূহ হয়ে উঠলো। তবুও আমার আ-স্রা-মা-টিকে ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর রইল না। কারণ বাড়ী চাপা পড়ে,' দিনের পর দিন ধরে' নির্জল একাদশীর প্রসাদে এক পা এক পা করে' স্বর্গে যাওয়ার চেয়ে গুলি খেয়ে সটান পরলোকে, তা সে যেখানেই হোক্, যাওয়া যথেষ্ট বাঞ্ছনীয় বোধ হ'লো।

পথে পথে সারাদিন কীভাবে কাটলো তা ঠিক স্মরণ নেই। সুধু মনে আছে, বারো ঘণ্টা অভাব্য, অকল্প্য ধ্বংসলীলা আর অসংখ্য নিহত এবং আহত নরনারী ও শিশুর দেহ প্রত্যক্ষ করে' যখন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলাম, তখন আয়নায় নিজের মুখ দেখে তার আমিত্ব সম্বন্ধে কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহ জাগলো, যেমন উন্মত্ততার প্রথম অবস্থায় ডাক্তাররা কখনো কখনো লক্ষ্য করে' থাকেন। মনে হ'লো যেন একজন "আমি" অপর একজন "আমি"-র সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে, এবং দু'জনের মধ্যে যেন কোনো সম্পর্কই নেই। পাকা মনো-বিশ্লেষকের মত এ ধরণের সত্তা-দ্বৈধের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধরা পড়লো একটি ঘটনা যেটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে' নিজের কাছে গোপন করতে চেষ্টা করছিলাম। ঘটনাটা এই ঃ পথে একটা সদ্য বোমায় ভাঙ্গা বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময়ে নজরে পড়েছিল দেহবিচ্যুত ছোট্ট একখানি পা। শিশুটি কোথায় জানি না, হয়তো বেঁচে নেই। এর আগেও প্রাণহীন

শিশুর বিকৃত দেহ চোখে কম পড়ে নি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন এই পাখানির দৃশ্য মনের মধ্যে যেন সব তোলপাড় করে' দিলে। ছোট্ট পাখানি, তাতে সাদা একটি মোজা আর সাদা এক পাটি জুতো তখনো পরানো রয়েছে।

যে মানুষ ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিল, এবং যে মানুষ তাকে প্রাণপণে ভুলতে চাইছিল, এই দুই ব্যক্তির দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন আবার ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মানুষের সঙ্গলাভে নিজেকে আবার একটু স্বাভাবিক বোধ করবার জন্যে একটি বিশেষ পরিচিতা বৃদ্ধার বাড়ী লক্ষ্য করে' পাড়ী দিলাম। তাঁর বাড়ী আমাদের ওখান থেকে বেশ একটু দূরে। অতখানি পথ হেঁটে, কী করে' যে চোখের নিমেষে বৃদ্ধার ফ্ল্যাটের ঘণ্টার বোতাম টিপলাম, তাতে আমার নিজেরই ভারী আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। সেরাত্রে বেশ উপলব্ধি করলাম, যুদ্ধের সময়ে একা যদি আমার ঐ আ-স্রা-মা-টিতে থাকতে হয় এবং নিহত বা আহত যদি নাও হই, তাহ'লেও ক্রমে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটা বিচিত্র নয়।

বৃদ্ধাটি দিদির মা, এবং আমাকে যেরকম স্নেহ করতেন, তাতে আমারও তিনি মাতৃস্থানিয়া ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়ে ক'টি বড় হয়েছে। কাজেই নির্ঝঞ্ঝাটে একটি ফ্ল্যাট্ নিয়ে শান্তিতে দিনপাত করেন। কাজের তাঁর অভাব নেই, কারণ পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-পরিচিতদের যেকোনো প্রকারে সাহায্য করা তাঁর একটা ব্যসন। বয়েস খুব বেশী না হ'লেও পঞ্চান্নর কাছাকাছি। ওদেশের স্বাস্থ্যের অনুপাতে এবয়সের মানুষ নিষ্কর্ম হয়ে যীশু-নামের মালা জপে না, বা পরপারে যাবার তোড়জোড়ও করে না। এই বয়েসেই ওদের দেশের মানুষের হঠাৎ মনে পড়ে, সংসার-ধর্ম পালন করা গেল, যৌবন ও পৌঢ়াবস্থাকে যথারীতি উপভোগ করা গেল,

এখন পরোপকারধর্ম পালন করবার সময় হ'লো। কাজেই ইনি বসে' বসে' সরকারী পেন্সন ভোগ না করে' যুদ্ধের সময়ে নার্স্ হ'লেন। তাছাড়া তাঁর স্বামী ছিলেন দেশপ্রাণ, আদর্শবাদী চিকিৎসক। সুতরাং স্বামীর সঙ্গে আর্তের নিঃস্বার্থ সেবায় তাঁর জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত হয়েছে। এই "বৃদ্ধ" বয়সেও তিনি আর্তের সেবাই জীবনের ব্রত করলেন।

আজ রাত দুপুরে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের যে আর্তটি এসে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলে তার সেবাটা হ'লো অবশ্য অন্য ধরণের। বৃদ্ধার খাবারের আলমারীর যত কিছু উপাদেয় সামগ্রী সব একে একে এই অধমের থালায় এসে হাজির হ'তে লাগলো। রোগীর নিষেধ অমান্য করে' ডাক্তরে যেমন তার উপর অস্ত্রোপচার করে, ডাক্তার-পত্নীও তেমনি করে' আমার শত বাধা অগ্রাহ্য করে' আমায় খাইয়ে চললেন। আজ ক'দিন ধরে' অগোচরে অল্পে অল্পে খাদ্যসামগ্রীর ওপর যে বিতৃষ্ণা জন্মে' আসছিল, তা যেন এই ভদ্রমহিলার স্নেহস্পর্শে পূত হয়ে বুভুক্ষার আকার ধারণ করলে। এবং সে কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মানুষের মনে যেসব বিকার জন্মায় তার বেশীর ভাগেরই কারণ যে পারিপার্শ্বিক বা আভ্যন্তরীণ নিঃসঙ্গতা তা সেদিন স্পষ্ট অনুভব করলাম। যে দৃশ্যটা ভোলবার জন্যে আজ সারাদিন ধরে' নিজের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছিলাম, তা এখন বারে বারে স্মরণ হওয়াতেও আমার মনে কোনো বিকার ঘটাতে পারলে না।

রাদিও থেকে তখনো নানা খবর আস্ছে, এবং রোজকার মত গান বাজনা চলেছে। পোল সুর-শিল্পী শোপ্যাঁ-র রাত্রির বিষাদ-ভরা nocturnes যখন নগরবাসীদের তন্দ্রা-মুগ্ধ করে' ফেলেছে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ বাজনা বন্ধ হ'লো, এবং একটু পরেই সেনা বিভাগ থেকে

কর্ণেল উমিয়াস্তভ্স্কি নামধারী একটি ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল। তিনি ৬ই সেপ্টেম্বর রাত দুপুরে প্রথম দুঃখের সহিত জানালেন, জার্মানরা একেবারে সহরের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে, এবং এখন প্রত্যেক নগরবাসীর একমাত্র কর্তব্য আত্মরক্ষা ও শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ। ভাষার আড়ম্বরে, কথার মার-প্যাঁচে অনেকক্ষণ ধরে' ভদ্রলোক তাঁর কল্পিত, শোকে-মুহ্যমান নগরবাসীদের সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পেলেন। তার সার মর্ম এই যে, যুদ্ধ একটা খেলার সামিল, এতে হার জিত আছেই। জার্মানরা কাছে এসে পড়েছে, তাতে আর করা যাবে কী? এখন সহরে যা আছে তাই দিয়েই ওদের ঠেকাতে হবে। তার পর যা হয় হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর সহসা সুর বদলে নাটকি ভঙ্গীতে বললেন,—"Panowie, do barykad!" মোটামুটি তাৎপর্য্য: সহরের পুরুষরা বয়স ও স্বাস্থ্য নির্বিশেষে যে যেখানে আছে সেইদিকের সহরতলী লক্ষ্য করে' এখনি বেরিয়ে পড়ুক, কোদাল খোন্তা নিয়ে। এবং সেখানে পৌঁছে মাটি খুঁড়ে বড় বড় গর্ত ও খানা তৈরী করুক। উদ্দেশ্য শত্রুদের বাধা দেবার জন্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা।—"Panowie, do barykad!" পুরুষরা, বানাও বেড়া, বানাও বারিকাদ্! এই সঙ্গে আরো বলা হ'লো, সহরে বালির বস্তা, লোহার রেলিং, কাঁটা তার, ইটপাটকেল, যা পাওয়া যায়, তাই যেন সাধ্যমত সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ খানা খোঁড়ার পর এই সব জিনিষ দিয়ে এমন পাকা রকমের বারিকাদ্ বানানো হবে যে, তার ভেতর দিয়ে জার্মানরা কোন্ ছার, ভূতেও মাথা গলাতে পারবে না!

বারিকাদ্ বানানোর আহ্বান শুনে যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন রাত প্রায় একটা। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে' যে, হাতিয়ার ধরা যখন ভাগ্যে হ'লোই না (সুধু আমার নয়, অনেক পোল-বাচ্চারও ঐ

একই আফ্‌শোষ) তখন কোদাল-খোন্তা নিয়ে না হয় স্যাপার-গিরিই করা যাবে। তবে অঙ্গে বণ্ড্ স্ট্রীটের স্যুট্ এবং চরণে এ্যাবটের বুট নিয়ে কলম বা ছড়ি ধরা যায় বটে, কোদাল ধরা যায় না। তাই স্থির করলাম, পথে বাড়ীতে পোষাক বদ্‌লে একেবারে সহরের উত্তর সীমানায় গিয়ে হাজির হওয়া যাবে। বাড়ীতে কোদাল-জাতীয় কোনো হাতিয়ার অবশ্য নেই; যতদূর স্মরণ হয়, কয়লা তোলবার জন্যে একখানা বড় গোছের শভেল আছে। যাই হোক্, তা অন্ততঃ নখের চেয়ে ভালো। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি। বারিকাদ্ বানানোর আহ্বান পেয়ে সহর সুদ্ধ লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তায় দলে দলে মেয়ে, পুরুষ, এমন কি বাচ্চারা পর্য্যন্ত, যে যা পেয়েছে মাটি খোড়ার উপযোগী যন্ত্রপাতি নিয়ে চলেছে। গভীর রাতের চাঁদের আলোয় সহরের রাস্তা-ঘাট বেশ স্পষ্ট চেনা যায়। সে বছর হেমন্তকালে ওদেশে আকাশ এত পরিষ্কার এবং জ্যোৎস্নার আলো এত স্বচ্ছ, যে হঠাৎ বসন্ত বলে' ভুল হয়। অবশ্য চাঁদের আলো নিয়ে যাদের কারবার তারা সহজেই ধরে' ফেলে, এ জ্যোৎস্নায় মিলনের পূর্বরাগ নেই, আছে পরিণতির পূর্বাভাস। বেশ অনুভব করা যায়, এবার প্রকৃতির ঋতুচক্র পূর্ণ হ'লো, দু'এক দিনের মধ্যেই বনে বনে পাতা-ঝরা সুরু হবে।

সহরের মাঝখানে লোকের ভিড়ে পথচলা যায় না। সবাই কোনো না কোনো সীমানা লক্ষ্য করে' চলেছে। জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা বাড়ীর ভগ্নস্তূপ, তাদের তলায় তলায় হয়তো এখনও কত মানুষ বাঁচবার আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারে নি। এখনও তারা প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে। এদের এখন আর বাঁচাবার উপায়ও নেই, সময়ও নেই। আজ রাত্রি আর কাল সারাদিনের মধ্যে বারিকাদ্ না বানিয়ে ফেলতে পারলে শত্রুর আক্রমণে সহরের চিহ্ন থাকবে না। সুতরাং হয়তো জীবন

সংগ্রামের নিয়ম অনুসারে, যারা বেঁচে আছে, আধ-মরাদের চেয়ে বাঁচবার অধিকার তাদেরই বেশী। এই অসামরিক স্যাপার্-দের সঙ্গে দলে দলে সৈন্যও চলেছে, কামান, বন্দুক নিয়ে। বোঝা গেল, কাল থেকে সহর ঘিরে চারিদিকে কামান, বন্দুক এবং হাতাহাতির লড়াই আরম্ভ হবে। অর্থাৎ জার্মানরা এবার হয়তো ভারশৌএর অবরোধ সুরু করলে।

পথে যেতে যেতে নজরে পড়লো, একখানা প্রকাণ্ড বাড়ীর কালো কাগজ-ঢাকা শার্শী ভেদ করেও যেন আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। বাড়ীখানি নানান্ রকম আফিসের সমষ্টি, এবং এখানে আমার যাওয়া-আসা খুব বিরল ছিল না। অর্থাৎ এখানে একটি আফিসে কাজ করতেন আমার বাগ্‌দত্তা। লক্ষ্য করলাম, সেই আফিসটিরই জান্‌লায় সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে দরজায় ঘা দিলাম। দরজা খুলতেই সামনে দেখলাম তাঁকে যাঁর দর্শনের আশায় দিনান্তে প্রায়ই একবার এদিকে আসতে হ'তো।

তুমি এখানে, এত রাত্তিরে ?

ভেতরে এসো, অনেক কথা আছে।

আর কে আছে ?

স্বধু আমি, দারোয়ান আর বেয়ারা।

করা হ'চ্ছে কী ?

কাজ করছি, দেখতেই পচ্ছো।—বলে' সে দু'খানা ভুষো-মাখানো হাত আমার সামনে মেলে ধরলে। স্বধু হাত নয়, মুখ, পোষাক, সর্বাঙ্গ ধোঁয়ায়, ভুষোয় একেবারে কালো হয়ে গেছে। ভেতরে গিয়ে দেখলাম, মেঝের ওপর গাদা প্রমাণ আফিসের বইপত্র আর জায়গায় জায়গায় খুচরো কাগজের ঢিপি। সব ক'টি ঘরের অগ্নি-কুণ্ডে দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলছে। একে দোর-জান্‌লা সব বন্ধ আর ওপর এই আগুন,

ভেতরে টেঁকা দায়। শুন্‌লাম বাজে কথা বলবার একটুও সময় নেই, আজ রাতের মধ্যেই আফিসের যাবতীয় কাগজ পুড়িয়ে শেষ করতে হবে, যেন একটু কাগজের টুক্‌রো পর্য্যন্ত কোথাও না পড়ে' থাকে। আফিসের কর্তাদের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া গেছে।

সারারাত ধরে' ছ'টা অগ্নি-কুণ্ডে আমরা চারজনে রাশ রাশ কাগজ পুড়িয়ে ছাই করতে লাগলাম। সকাল প্রায় সাতটার সময় যখন আমরা দাহ-কার্য্য শেষ করলাম, তখন ঘুমে আমাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। টলতে টলতে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম, একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে। তখন আর সহরের সীমানায় ধাওয়া করে' মাটি খোঁড়বার উৎসাহ নেই। পথে চলতে চলতে যা কথা হ'লো তা এই :

হঠাৎ এ অগ্নিকাণ্ড!

বুঝতে পারছো না? জার্মানরা সহরের খুব কাছে এসে পড়েছে।

কর্তারা গেলেন কোথায়?

জানি না, ও সব কথা তোমার জিজ্ঞেস করাও উচিৎ নয়। তবে শুনে সুখী হবে, পোল সরকার রাজধানী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।

আমরা তাহ'লে অবরুদ্ধ? বেরুবার আর উপায় নেই?

জানিনা, কতকটা বোধ হয় তাই। যাই হোক এখন গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও, বেলা দশটা এগারোটা আন্দাজ সময়ে দিদিকে নিয়ে আসবো। অনেক কথা আছে।

দ ভিদ্‌জেনিয়া।

দ ভিদ্‌জেনিয়া।

জার্মানরা ভোর থেকে বোমা ফেলতে সুরু করছে। কিন্তু শরীর সারারাতের অনিদ্রায় এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে, তখন তাকে আর আতঙ্কেও চাঙ্গা করা যায় না। বোমার গর্জনকে হাইয়ের তুড়ীতে নস্যাৎ করে' দিয়ে স-স্যুট্ এবং স-বুট্ বিছানার ওপর সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

৭ই সেপ্টেম্বর।

ঘুম ভাঙ্‌লো ভগিনীদ্বয়ের অপ্রতিহত ঘন্টাধ্বনিতে। বেলা তখন এগারোটা। দিদি আর তাঁর ছোট বোনটি বাইরে অপেক্ষা করছেন। দিন দুই হ'লো বোমা-বর্ষণের চোটে ঝি বেচারী কাজ করতে আসতে পারে নি, এবং সে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের নার্স্‌-পরিচারিকা হ'তে চাওয়ায় তাকে একরকম বলেই দিয়েছি, তার আর কাজ করতে আসবার প্রয়োজন নেই; একলার মত কাজ নিজেই চালিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। বাড়ীতে ভদ্রমহিলাদের ঢুকতে দিতে দস্তুরমত লজ্জা বোধ করলাম। অবিবাহিত পুরুষের অগোছালো ঘরদোর স্ত্রীজাতির যেমন সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে, ঠিক তেমনি তা তাদের মনে উক্ত পুরুষের প্রতি বিপ্রকর্ষণেরও যে সৃষ্টি করতে পারে, সে কথা নানা নভেল-নাটক পড়ে' আমার জানা ছিল। সুতরাং ভগিনীদ্বয়কে বাইরেই দাঁড় করিয়ে রেখে ক্ষৌরকার্য্য সেরে নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেরুলাম। শুনলাম, যে খবর তাঁরা আমায় জানাতে এসেছেন, তা রাস্তায় বলা চলে না। সুতরাং ছোট বোনটির আফিসে গিয়ে বসা গেল। তাছাড়া তাঁর আফিসের কাজ তখনো শেষ হয় নি। কাজেই রথ দেখা এবং কলা বেচা দুই-ই হবে।

যে জায়গাটাতে আগে প্রকাণ্ড একটা আফিস ছিল আজ সেখানে

শূন্য টেবিল, চেয়ার আর আলমারী ছাড়া আর কিছুই নেই। গত রাতের দাহ-কার্য্যের পরিচায়করূপে স্থানে স্থানে ছাইয়ের গাদা জমা হয়ে রয়েছে, এবং অগ্নিকুণ্ডে এখনো গুমে গুমে আগুন জ্বলছে। ভগ্নিদ্বয়ের কাছে যা শুনলাম তা সংক্ষেপে এই ঃ

কাল রাত দু'টো আন্দাজ সময়ে নাকি কর্ণেল উমিয়াস্তভ্স্কি রাদিও-যোগে খবর দেন, জার্মানরা সহরের এত কাছে এসে পড়েছে যে, তাদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা, বলা শক্ত। জার্মানরা সহরে প্রবেশ করলে যে তারা অন্ততঃ পুরুষদের ছেড়ে কথা কইবে না, তা সহজেই অনুমেয়। সেদিক দিয়ে পুরুষদের পক্ষে ভয়ের কারণ দু'টো। এক—শত্রুরা তাদের কচুকাটা করবে, দুই—তাদের ধরে' নিয়ে গিয়ে ইংরেজ আর ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগাবে। তিন—এও হ'তে পারে যে, তাদের দিয়ে মেথরগিরি, ঝাড়ুদারগিরি, অথবা কুলীগিরি প্রভৃতি করানো হবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই পোলদের বেশ একটু বিচলিত করে' ফেললে। শত্রুর পক্ষে যোগ দিয়ে মিত্রদের বুকে ছুরী চালানো, এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো। অনেক ভেবে চিন্তে নাকি পোল সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্ততঃ পুরুষদের সহর থেকে সরানো দরকার। সুতরাং কর্ণেল সাহেব রাদিও-যোগে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সহর ছেড়ে চলে' যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, তোমার আর দেরী করা চলবে না—দিদি বললেন। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে-গাছিয়ে নাও—তাঁর ছোট বোনটি প্রতিধ্বনি করলেন।

তোমাকে জার্মানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ?

দেশের দুর্দিনে পোলদেশের মেয়েরা কখনো পালায় নি, আমি দেশ

ছাড়বো কী করে'? তাছাড়া কর্তাদের কাছ থেকে আফিস ছেড়ে যাবার এখনো হুকুম পাই নি।

তাঁরা কোথায়?

সরকারের সঙ্গে তাঁরা সহর ছেড়ে চলে' গেছেন।

সুতরাং তুমিই বা সহর ছাড়বে না কেন?

সহরে সুধু একজন এখনো আছেন, নানা কারণে যেতে পারেন নি। তাঁর নির্দেশক্রমেই ক'দিন ধরে' দিন-রাত্রি খেটে আফিসের যতকিছু কাগজ পুড়িয়ে ছাই করেছি। যাই হোক্, বাজে কথার সময় নেই, চট্‌পট্ তোমার কন্‌সুলাতে টেলিফোন্ করে' খবর নাও, তাঁরা তোমায় কী করতে বলেন।—দিদির ছোট বোনটি হুকুম করলেন।

হঠাৎ কন্‌সুলাতের অস্তিত্বের কথা ক'দিন পরে মনে পড়লো। সত্যিই ত ব্রিতানী-প্রজা হিসেবে তাঁদের কাছে ছাড়া আর আমার যাবার জায়গা কোথায়? টেলিফোন্ করলাম, কিন্তু সাড়া পেলাম না। বহুবার টেলিফোন্ করার পর কন্‌সুলাতের একজন পোল বেয়ারার গলা এলো।

কী চাই?

কন্‌সুল্ সাহেবকে চাই।

হো হো, কন্‌সুল্ সাহেব? এখানে কোনো সাহেবই নেই। কন্‌সুলাৎ ফাঁকা।

তার মানে?

মানে, তাঁরা সবাই পরশু দিন সহর ছেড়ে চলে গেছেন।

এখানের কোনো ইংরেজ ভদ্রলোকের ঠিকানা দিতে পারো?

সহরে ইংরেজ কেউ নেই, সবাই কন্‌সুলাতের সঙ্গে সহর ছেড়ে চলে' গেছেন।

আচ্ছা, শোন, আমার নাম অমুক, আমি একজন ব্রিতানী-প্রজা;

আমার সম্বন্ধে কোনো কথা কি তোমায় বলে' গেছেন কন্‌সুল্ সাহেব?

আজ্ঞে না, প্রশেঁ পানা।—বলে' সে টেলিফোন্ ছেড়ে দিলে। বুঝলাম, এবার নিজেই নিজের কন্‌সুল্-গিরি করতে হবে। কনিষ্ঠা পরামর্শ দিলেন, একবার ফরাসী-কন্‌সুলাতে খবর নেওয়া দরকার। আবার টেলিফোন করলাম। সেখানেও অনেক ডাকাডাকি করে' একজন বেয়ারাকে পাওয়া গেল, এবং তাকে আমার সম্বন্ধে কোনো খবর আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সুধু উত্তর পাওয়া গেল পোল উচ্চারণের ফরাসীভাষায়, "নঁ ম্‌সিয়ে, রিয়ঁ্যা, রিয়ঁ্যা, রিয়ঁ্যা দ্যু তু—না মশায় কিছু নেই।" বলে' সে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে লাইন কেটে দিলে। বোঝা গেল, মস্যো ল্য কঁসুল্-এর অবর্তমানে নিজেই সে শূন্য কন্‌সুল্-খানার একমাত্র অধীশ্বর হয়ে বসেছে। এবং এ ধরণের ভিস্তার বাদ্‌শা-গিরিতে তার মেজাজ রীতিমত গরম। তারপর একে একে প্রায় সবক'টি কন্‌সুলাতেই টেলিফোন্ করে' প্রায় ঐ ধরণেরই জবাব পাওয়া গেল। প্রায় সব কন্‌সুলাৎ-ই সহর ছেড়ে চলে' গেছে। যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে ব্রিতানী কন্‌সুলাৎ আমার সম্বন্ধে কোনো রকম নির্দেশই দিয়ে যান নি। শেষে জ্যেষ্ঠা প্রস্তাব করলেন, মার্কিনী কন্‌সুলাৎ। আশ্চর্য্য, ইংরেজদেরই স্ব-ভাষাভাষী মার্কিনীদের কথা এতক্ষণ মনে পড়ে নি। টেলিফোন্ করা মাত্রই ভদ্ররকমের অনুরোধ এল, যেন অচিরে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

ট্রাম, বাস্, কিছুই সহরে নেই। ট্রামগুলোকে সহরের বাইরের সীমানায় নিয়ে গিয়ে বারিকাদ্-রূপে উল্‌টে উল্‌টে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এতটা পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে এবং সকাল থেকে চারিদিকে অবিরত বোমা পড়ছে। সুতরাং ভগিনীদ্বয় আমায় একলা ছেড়ে দিতে রাজী হ'লেন না। বললেন, "মার্কিনী কন্‌সুলাতের দোর অবধি তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি। তারপর যদি সেখানে কোনো ব্যবস্থা না হয়, ত অন্য

বন্দোবস্ত করতে হবে।” তাঁদের একান্ত অনুরোধ এড়াতে পারা গেল না। তিন জনে আবার পথে বেরুলাম। বেচারা দিদির বাড়ীতে রুগ্ন স্বামী আর এই অবিরাম বোমা-বর্ষণ। তাঁর মন পড়ে' আছে তাঁর স্বামীর দিকে অথচ এই বিদেশী ভাইটির মায়া কাটানোও তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। পথে চলতে চলতে বারে বারে বলতে লাগলেন— “হিরণ তুমি যে ভাই ব্রিতানী-প্রজা, জার্মানরা এলে কি তোমায় আস্ত রাখবে? তাছাড়া তুমি বিদেশী, দেখ ত তোমার কী দু'র্ভোগ এদেশে এসে! তোমায় ভালোয় ভালোয় সহরের বাইরে পাঠাতে পারলে বাঁচি।” হেসে বললাম, “জানি, আমায় বিদেয় করতে পারলে, তোমরা দু'জনেই শান্তি পাও।” বাঙ্গালী-হৃদয় দিদির চোখ জলে ভারী হয়ে আসে, তাঁর কনিষ্ঠা অন্যদিকে মুখ ফেরান।

পথে এত ভিড় যে চলা মুস্কিল। দলে দলে, পালে পালে মানুষ মোট-ঘাট মাথায় নিয়ে সহরের বাইরে যাবার পথ ধরেছে। সকালেও লক্ষ্য করেছিলাম, এই ধরণের জনতা ক্রমাগত রাস্তা দিয়ে চলেছে। তখন মনে হয়েছিল, তারা হয়তো সীমানায় বারিকাদ্ বানাতে চলেছে। রাত্রিতেই যে সরকারী নির্দেশের পরিবর্তন হয়েছিল, সে খবর আমি রাখতাম না। এখন বোঝা গেল, এরা ভোর থেকে সুরু করে' সারা সকাল ধরে' সহর ছেড়ে চলেছে। সবাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে, জার্মানরা এসে পড়লো বুঝি! যারা নানা কারণে নিরুপায় হয়ে সহরে থাকবার মনস্থ করেছে, তাদের চোখে-মুখে সে কী আতঙ্ক!

লক্ষ্য করলাম, বড় রাস্তার অনেক দূর থেকে সুরু করে' দুর্গ পর্য্যন্ত সারি সারি পুলিস্ দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গীন খাড়া করে'। তাৎপর্য্যটা ঠিক বোঝা গেল না। তাদের আকৃতিতে এমন কিছু চোখে পড়ে না, যাকে “মার-মুখো” বলা চলে। অথচ সঙ্গীন খাড়া রয়েছে। ভাবে অনুমান

করা গেল, জার্মানরা নগর-প্রবেশ করবার সময়ে যদি উত্তেজিত জনতা রাগের বশে কিছু একটা করে' ফেলে তাতে শত্রুরা হয়তো সহরের সমূহ ক্ষতি করবে। তাই "আইন ও বন্দোবস্ত" ঠিক রাখবার জন্যে এই মন্থর প্রতিনিধিগুলি সঙ্গীন খাড়া করে' দাঁড়িয়ে আছেন, কখন কী হয়। দুঃখের সহিত উপলব্ধি করলাম, যেকোনো দেশের পুলিস্‌রা অপরকে আইন মানিয়ে মানিয়ে একেবারে প্রাণহীন, স্নায়ু-হীন, অনুভূতি-হীন যন্ত্র হয়ে ওঠে। তাদের কাছে দেশপ্রাণতা দ্বিতীয় স্তরের জিনিষ, লোককে আইন মানানো ছাড়া তারা কিছু বোঝে না। জার্মানরা সহরে ঢোকবার সময়ে তাদের বুক লক্ষ্য করে' গুলি চালানো বা তাদের কল্‌জের ভেতর একহাত করে' সঙ্গীন বসিয়ে দেওয়া তাদের পেশা নয়। সেসব সৈনিক-সাধারণের কর্ত্তব্য। তাদের কর্ত্তব্য, সুধু চাকরী বজায় রেখে দেশের লোককে আইন মানানো। পুলিস্‌দের দেশ বলে' হয়তো কিছু নেই। তারা যেদেশে যেযুগে যে সরকারের তাঁবেয় কাজ করে, তারই খিদ্‌মদ্‌গার।

খানিকদূর যেতে না যেতেই জার্মানরা এমন ভীষণভাবে সহরের ওপর চড়াও হ'লো যে, সহরের যেখানে যেক'টা সাইরেন্ ছিল, সবক'টা একসঙ্গে আর্তনাদ করে' উঠলো। ওরকম বিকট, আতঙ্কিত আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তির আর্তনাদ এর আগে শুনি নি। আমরা তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্বের প্রাসাদের কাছে এসে পড়েছি। রাস্তাটার নাম উলীৎসা ভ্যেঝ্‌বভা। সহরে এমন সুন্দর রাস্তা খুব বেশী ছিল না। এ পাড়াটা কতকটা লন্দনের পিকা-দিল্লী বা মে ফেয়ার ধরণের ছিল। সুতরাং তার ওপর যে জার্মানদের নজর পড়বে তা আর বিচিত্র কী? এখানে আক্রমণের সময়ে জনসাধারণের মাথা গোঁজবার জন্যে একটি প্রসস্ত আশ্রয় ছিল। সেটি ছিল, হোতেল আঙ্গ্যেল্‌স্কি বা ইংরেজী পান্থশালার ভিত-কামরা। আমরা তখন তিনজন, কাজেই বোমাবর্ষণের সময়ে পথে পথে বিচরণ করা হয়ে উঠলো না।

কারণ জার্মানরা তিনজন মানুষকে একত্র দেখে তাদের কল-বন্দুকের গুলিতে কচুকাটা করবার লোভ সামলাতে পারবে না। কাজেই ঐ আশ্রয়টিতে ঢুকতে হ'লো।

সেদিনকার আধঘণ্টার অভিজ্ঞতা হয়তো চিরকাল মনে থাকবে। পুরাণো বাড়ী, শক্ত গাঁথুনির দেওয়াল বটে, তবে ঘরের ছাদ যেন মাথায় ঠেকছে। বনেদী আমলে এখানে বড় মানুষদের জন্যে পিপে-ভরা মদ জমানো থাকতো বোধ হয়। কারণ এখানে জান্‌লার বা কোনোরকম ফুটোফাটার বালাই ছিল না। তাছাড়া ভিতটি অনেকগুলি কামরায় বিভক্ত, সুতরাং অন্ধকারে যারা জায়গা আছে মনে করে' দেওয়ালের কাছে সরে' গিয়েছিল, বাইরের ভিড়ের চাপে তাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। যতদূর মনে পড়ে, দমবন্ধ হয়ে সেখানে যেন কারো মৃত্যু ঘটেছিল। এই অন্ধকূপে আমরা আশ্রয় নিয়েছি। মাথার ওপর চলেছে অবিরাম বোমারুর গর্জন আর খুব কাছেই বোমা পড়ার শব্দ। আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য পররাষ্ট্র-মন্ত্রিত্বটার ওপর হাম্‌লা করে' ভেতরের সব ক'টি মানুষকে বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া। কারণ সারা আঙ্গিনায় আফিসের যাবতীয় কাগজপত্র জড়ো করে' দারোয়ান-বেয়ারারা তাতে অগ্নিসংযোগ করছিল। এবং জার্মানরা এই অমূল্য কাগজগুলি যাতে নষ্ট হ'তে না পারে, সেই চেষ্টায় রত ছিল। বাড়ীটার ওপর বোমারু-শিকারী কামান মোতায়েন থাকায় জার্মানরা তার খুব কাছে ঘেঁসতে পারছিল না। সুতরাং বোমা-গুলো পড়ছিল আশে-পাশে যত্রতত্র। এবং আমাদের এই পান্থশালাটির ওপর যে একটি অচিরেই অবতরণ করতে পারে, তা নিয়ে অনেকেই কানাঘুষো করছিল। কারণ সুস্পষ্ট। আমাদের হোটেলটার নামই যেকোনো জার্মানের বিদ্বেষ উদ্রেক কয়তে পারতো এবং তা এমন বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল যে, তা বোমারু-বিমানের পেরিস্কোপ্-গোচর হওয়া

কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। যাই হোক্, আধঘণ্টা ধরে' মূর্তিমান মৃত্যুর সঙ্গে হাতাহাতি করে', যখন আমরা এই আলো-হাওয়ার সম্পর্কহীন আশ্রয় থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন আমাদের মুখ দেখে হঠাৎ চেনা যায় না।

একটু দূরেই সেনা-বিভাগের মুখ্য কেন্দ্র। পথে যখন পড়ছেই, তখন দিদির প্রস্তাবে, আমার কী করা উচিৎ, সে বিষয়ে সেখানে পরামর্শ নেওয়া সঙ্গত মনে হ'লো। ভিড় ঠেলে ভেতরে যাবার উপায় নেই। ফটকের সামনে একজন কাপ্তেন উপদেশ-প্রার্থীদের যথাযত পরামর্শ দিচ্ছেন। আমার বক্তব্য শুনে জিজ্ঞেস করলেন—হাতিয়ার আছে?

না।

উর্দি?

না।

তা'ও নেই! লড়তে জানেন?

আজ্ঞে না, আমি ভারতবাসী।

বলেন কী, ভারতবাসীরা লড়তে জানেনা?

না, সবাইকে লড়তে সেখানো হয় না।

শিক্ষিত লোকদের নিশ্চয়ই নয়, বুঝেছি। তা কী করা যায় বলুন আপনাকে নিয়ে, পানিয়ে প্রফেসঝে, আমাদের এখান থেকে সুধু লড়িয়ে লোকদের নানা ঘাঁটিতে পাঠানো হ'চ্ছে।

সহৃদয় দুঃখের সঙ্গে আমায় সাহায্যদানে অসামর্থ্য জানিয়ে কাপ্তেন সাহেব চারিপাশের জনতাকে ঐ একই প্রশ্ন করে' চললেন—"হাতিয়ার আছে? উর্দি আছে?" দেখলাম লড়তে চায় এমন লোক জমা হয়েছে হাজারে হাজারে। প্রকাণ্ড খোলা জায়গা, প্লাৎস্ পিল্‌সুদ্‌স্কিয়েগো, লোকে ভরে' গেছে। বেশীর ভাগ লোকেরই, দেখা গেল, হাতিয়ারও নেই উর্দিও

নেই। অথচ এদের অনেকেই নীল-কার্ড্-ওয়ালা, প্রথম শ্রেণীর লড়াকু, যাদের এতদিন ধরে' জিইয়ে রাখা হয়েছিল। লক্ষ্য করলাম, পোল-সরকারের ভাণ্ডারে দেশের যুদ্ধক্ষম সকল পুরুষের হাতে হাতিয়ার বা অঙ্গে উর্দি যোগাবারও সামর্থ্য নেই। নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হ'লেও এই ক্ষত্রিয়ের বাচ্চা পোলদের লড়তে না পাওয়ার দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। এখন ভাবি, ইংরেজরা যুদ্ধের আগে কর্জের হারটা যদি একটু বাড়িয়ে দিত, এবং তা দিয়ে যদি পোলরা ঝট্‌পট্ হাতিয়ার সংগ্রহ করতে পারতো, তা হ'লে এই মহত্তর যুদ্ধটা হয়তো এতদূর গড়াতো না। যারা লড়তে যাবার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল তাদের হাতিয়ার নেই বলে' বিদায় করে' দেওয়া হ'লো। তারা মুখ চূণ করে' পায়ে হেঁটে, সহর ছেড়ে, বেরিয়ে গেল দেশ থেকে পালাবার জন্যে—যদি কখনো ভবিষ্যতে ইংরেজ বা ফরাসী সেনায় যোগ দিতে পারে এই আশায়। যাদের নিজেদের হাতিয়ার ছিল, তারা রাস্তা ভরে' কুচকাওয়াজ করতে করতে চললো ভারশোএর বাইরে গার্ভলিন্ সহরে সৈন্যের ঘাঁটি লক্ষ্য করে'। আমিও দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি মার্কিনী কন্‌সুলাৎ-মুখো ধাওয়া করলাম, ভগিনীদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে।

মার্কিনী কন্‌সুলাতে জনসমাগম কম হয় নি। সবই য়াঙ্কী। ব্রিতানী উচ্চারণে ইংরেজী শুনে তারা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। একটি কর্মচারী এগিয়ে এসে বললে—"ইয়ু স্পীক্ কিঙ্স্ এঙ্লিশ্, ব্রিটিশ্, আর্ ইয়ু?"

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ব্রিতানি প্রজা, ভারতবাসী।

কী করতে পারি আপনার জন্যে?

সেই কথাই ত জানতে এলাম, আপনাদের কাছে।

কথপোকথন শুনে আরো দু'টি একটি কর্মচারী সেখানে এসে হাজির

হ'লো। এবং সকলে মিলে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং কন্‌সুল্ মহোদয়ের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'লো। তিনি কোনো তকল্লুফ্ না করে' আমায় জানিয়ে দিলেন, আমি ট্রেন ফেল করেছি, অর্থাৎ ব্রিতানীরা সহর ছাড়বার সময়ে তাদের দলে এসে জুটতে পারি নি, সুতরাং তাঁর আর কিছু করবার নেই। পরে যোগ করলেন—

এতক্ষণ করছিলেন কী?

আপনারাও যা করছিলেন, আমিও তাই, যুদ্ধের মজা দেখছিলাম।

তবে বাড়ী বসে' সেই মজাই দেখুন।

এ পরামর্শ ব্যতীত বোধ হয় আপনাদের কাছে অন্য কোনো সাহায্য আশা করা যেতে পারে না?

আজ্ঞে না।

ব্রিতানীরা কোন্ পথে গেছেন, বাৎলে দিতেও পারবেন না বোধ হয়?

দেওয়া উচিৎ নয়। তাছাড়া তাঁরা দু'দিন হ'লো সবাই মোটারে করে' চলে' গেছেন। সুতরাং আপনার অটোমোবীল্ থাকলেও তাঁদের ধরতে পারবেন না।

কথা শেষ করে' কন্‌সুল্ মহোদয় আমার ঠিকানা, পেশা প্রভৃতি টুকে নিলেন। এবং আমিও তাঁকে বিনা তকল্লুফে দু'চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে কন্‌সুলাৎ ছাড়তে উদ্যত হ'লাম। এমন সময়ে আবার আকাশ ফাটিয়ে আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তি। মনে পড়লো ভগিনীদ্বয় বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে এসে সব কথা বললাম।

কেমন হ'লো, ত? তোমরা যতই আমায় বিদেয় করতে চেষ্টা করো না কেন, বিধির বিধান কে খণ্ডাবে? জার্মানরা এসে তোমাদের যা অবস্থা করবে, আমারও না হয় তাই হ'লো।

না ঠাট্টা নয়, হিরণ। আজই তোমায় সহর ছাড়তে হবে।

আক্রমণ অগ্রাহ্য করে' আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কাছেই একটা চা-খানায় গিয়ে বসলাম, মাথা ঠাণ্ডা করে' কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করবার জন্যে। চা-খানা থেকে শেষবার, কোনো সাহায্য পাবার আশায় টেলিফোন্ করলাম চৈনিক কন্সুলাতে। কারণ স্বয়ং কন্সুল্ ছিলেন আমারই বিশেষ পরিচিত একটি ভদ্রলোক। সেখান থেকেও খবর পাওয়া গেল, তাঁরা সপরিবার দু'দিন আগে সহর ছেড়ে চলে' গেছেন। যাই হোক, ব্রিতানীরা যে চলে' গেছেন আমায় না জানিয়ে শুনিয়ে, তাতে কোনো দুঃখ হ'লো না; সুধু ক্ষোভ হ'লো এইজন্যে যে, তাঁরা অন্যান্য ব্রিতানীদের মত আমার পকেটে ব্রিতানী পাস্পর্ত্ থাকা সত্বেও ঘোর বিপদের সময়েও আমার উৎপত্তিটাকে হয়তো ভুলতে পারলেন না। তাছাড়া বহুবৎসর ইঙ্গস্থান-প্রবাসে অন্ততঃ এটুকুতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, ব্রিতানী ভদ্রলোক কথার খিলাফ্ করেন না। যাই হোক, এখন সে সব কথা তুলে লাভ নেই। কারণ যুদ্ধের সময়ে ওদেশে থাকাতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেল, তা জুজুর ভয়ে মানুষ হওয়া অনেক চব্বিশ-পরগণাবাসী বাঙ্গালী-সন্তানের ভাগ্যে ন ভূতা, এবং ভগবান্ করুন, ন ভবিষ্যতি।

চা-খানায় আমার সহর ছাড়া সম্বন্ধে সকল কথা বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে ভগিনীদ্বয়ের মনে বারে বারে এই প্রশ্ন উঠতে লাগলো, যে ঘোর দুর্দিনে বিদেশে বিভুঁয়ে এই বাঙ্গালী পুঙ্গবকে একা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা কী করে' নিশ্চিন্ত হন? আসল কথা, তাঁরা প্রায় স্থির ধরে' নিয়েছিলেন, সহরের চারিদিকে যখন যুদ্ধ চলেছে, তখন সশরীরে দেশ ছাড়া প্রায় অসম্ভব। এবং মাঠে-বাটে যে এই অধমের আত্মাহীন, মর-দেহ অজ্ঞাত এবং অ-সঙ্কীর্তিতভাবে মাটিতে লয় হ'চ্ছে, এদৃশ্য কল্পনা করা তাঁদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলো। দিদির কনিষ্ঠা আরো একটা কথা

তুললেন, তা এই : আমি যে বিদেশী তা যদি হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহ'লে পোলরাই হয়তো তৎক্ষণাৎ আমায় গুপ্তচর সন্দেহ করে' গুলিতে ধরাশায়ী করবে। আমি যদি একা একা বিচরণ করি, তা হ'লে এ সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অবং শান্তির সময়ে যা আমায় এদেশে সর্বত্র সাহায্য করেছে, যুদ্ধের সময়ে ঠিক তা-ই আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। অর্থাৎ আমার পোলভাষার জ্ঞান। সুতরাং আমায় একা ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।

এতক্ষণ চুপ করে' ছিলাম। এইবার ভরসা করে' জিজ্ঞেস করলাম—

যাবে আমার সঙ্গে ?

কোথায় ?

দেশ ছেড়ে, পায়ে হেঁটে যতদুর যাওয়া যায়, হিন্দুস্থান লক্ষ্য করে'।

এই অবস্থায় ? লোকে বলবে কী ?

যাদের "লোক" বলচ, তাদের মতামতের কি খুব বেশী দাম আছে ? এই ক'দিন যুদ্ধ দেখেও বুঝতে পারলে না ? ঐ দেখ।—

রাস্তায় বোমার টুকরো লেগে সদ্য মৃতা একটি মেয়েকে ধরাধরি করে' নিয়ে যাচ্ছিল। সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

না আমি সেকথা বলচি না। তুমি আমি খাঁটি থাকলেই হ'লো। তবে দেশের এই দুর্দিনে দেশের মাটি ছেড়ে যেতে মন সরে না।

যুদ্ধ না বাধলে এই বছরই ত আমাদের যাবার কথা ছিল। তাছাড়া জার্মানী সৈনিকদের যথেচ্ছ ব্যবহারের সম্ভাবনা জেনে তোমাকে ছেড়ে আমি যাই কী করে' ? মোপাসাঁর Boule de suif-এর গল্প জানো ত ? সে প্রুশ্-ফরাসী যুদ্ধের সময়কার কথা। এখন তারা আরো সভ্য হয়েছে।

ওসব নভেল-নাটকের কথা। তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার

দরকার নেই। এখন তোমায় কী করে' একা ছেড়ে দিই, তাই ভাবছি। জার্মান-অধিকৃত পোলদেশে তোমার ।থাকা অসম্ভব। অথচ তোমায় একা ছেড়ে দিতে মন সরছে না। চলো মাকে জিজ্ঞেস করা যাক।

কনিষ্ঠার কথা শুনে জ্যেষ্ঠা মুখ টিপে হাসতে হাসতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। চোখ-মুখের প্রকাশে বেশ বোঝা যায়, দিদির একরকম স্থির বিশ্বাস, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি আমাদের দু'জনকে সহরের সীমানা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরবেন। লক্ষ্য করলাম, চিন্তাটাতে যেমনি তাঁর আনন্দ তেমনি তাঁর বুকটা হাহাকার করে' উঠছে।

তিনজনে একসঙ্গেই গতরাত্রের বৃদ্ধাটির ফ্ল্যাটে ঘন্টার বোতাম টিপলাম। বৃদ্ধা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তোরা?"

আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে তাঁর মতামতের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বৃদ্ধাও অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—"তোর সঙ্গে ছেড়ে দিতে ভাবনা কী?" তারপর সস্নেহে আমাদের শিরশ্চুম্বন করে' চোখের জল চেপে বললেন—"যা, আর দেরি করিস নে, জার্মানরা এসে পড়লো বলে'।"

তখন বেলা বেশ গড়িয়ে এসেছে—বিকেল প্রায় তিনটে। রাস্তায় চলা যায় না। যত রকমের, যত আকারের যানবাহন কল্পনা করা যায়—মোটার, লরী, ফিটন, মালবাহী ঘোড়ার গাড়ী, মোটার-বাইক্, ঠেলা-গাড়ী সমেত সাইক্ল্, সাইক্ল্—সব মোট-ঘাট আর মানুষ নিয়ে হু হু করে' রাস্তা দিয়ে চলেছে মাইলের পর মাইল জুড়ে। ফুটপাথ দিয়ে চলেছে সারি সারি মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো, হাতে পিঠে মোট নিয়ে। সবাই বারে বারে পেছন দিকে তাকাচ্ছে, জার্মানরা এসে পড়লো বুঝি!

শুন্‌লাম, আর সময় নেই, আজই বিকেলে জার্মানদের আটকাবার জন্যে ভারশৌএর দু'টো পুলই দিনামিত্‌ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং পরে আর সহরের বাইরে যাওয়া যাবে না।

জিনিষপত্র গোছাবার সময় নেই। এবং সঙ্গে বা কীই নেওয়া যেতে পারে? পায়ে হেঁটে পূব দিক লক্ষ্য করে' চলতে হবে—পোলদেশ থেকে বেরুবার পথ, হয় রুশিয়া না হয় রোমানিয়া। কতদিনে সীমান্তে গিয়ে পৌছন যাবে তারও স্থিরতা নেই। সুতরাং সঙ্গে নেওয়া যাবে সুধু দু'টি পোষাক, কয়েকটা শার্ট ইত্যাদি, রুমাল, তোয়ালে, ক্ষৌরকার্য্যের সরঞ্জাম, দাঁতের বুরুশ্‌ ও মাজন, কিছু খাবার, খান দুই বই, ম্যাপ্‌, দু'একখানা খাতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেখতে দেখতে যা জিনিষ মেঝের ওপর জড়ো হ'লে তা বইতে অন্ততঃ একজন মুটে চাই। তাছাড়া জিনিষগুলো বইতে হ'লে চাই শক্তগোছের রুক্‌সাক্‌ বা পিঠে বইবার হাইকারদের থলে, যাতে অবশ্য অনায়াসে একটা গোটা সংসারকে সংসার বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ভারশৌএর বড় বড় দু'একটা স্পোর্টস্‌-এর দোকানে খোঁজ করা গেল, রুক্‌সাক্‌ সহরের যেখানে যা ছিল, সব কিছুক্ষণ আগেই বিক্রী হয়ে গেছে। অগত্যা জিনিষ-পত্র যা কিছু, ছোট সুট্‌কেসে ভরতে হ'লো, এবং কাগজপত্র, ম্যাপ্‌ ও বই ভরলাম পেট-মোটা ডকুমেন্ট্‌-কেসে। তখনো ভারশৌএ বেশ গরম চলেছে, বণ্ড্‌ স্ট্রীটের হাল্‌কা সুট্‌ পরেই গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠতে লাগলাম। পায়ে গরম-কালের হাল্‌কা জুতো। আশা করা গেল, শীত পড়বার আগেই সীমান্ত অতিক্রম করা যাবে; সুতরাং বেশী পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তাতে পথ চলার রীতিমত অসুবিধা হবে, পালিয়ে প্রাণ বাচানোর পক্ষে ত নিশ্চয়ই।

আমার বাগ্‌দত্তাও একটি ছোট সুট্‌-কেসে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষ-

পত্র গুছিয়ে নিয়ে এসে হাজির হ'লেন। রুটি, সসেজ্, কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্কের টিন, ছুরী, কাঁটা, গেলাস প্রভৃতি খাদ্যের সরঞ্জামে পরিপূর্ণ একটি থলীর ভার তাঁকেই নিতে হ'লো। আমরা বেরুবার জন্যে তৈরী হ'লাম। পায়ে হেঁটে যেতে হবে কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট সীমান্ত লক্ষ্য করে', কথাটা মনে হওয়াতে বেশ একটু আনন্দ হ'লো। হাজার দুই টাকা দিয়ে একখানা ফিটন্ হয়তো কেনা চলতো; কিন্তু শোনা গেল, পথে দরকার হ'লে সৈনিকরা নাকি তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে। তাছাড়া ঘোড়া ত কল নয়, পথে তাকে খেতে দিতে হবে, এবং যুদ্ধের হিড়িকে পশুর খাদ্যের অনটন পড়েছে দেশে। তখন আমাদের সম্বলও ঐ ক'টি টাকা যা হাতে ছিল। বাদবাকী টাকা ব্যাঙ্কে, এবং কয়েকদিন আগেই ব্যাঙ্ক্‌সমুদয় বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক, নানাদিক ভেবে হাতের টাকা ক'টি সীমান্ত পার হওয়া অবধি পুঁজী করে' রাখাই স্থির করা গেল, সুতরাং পায়ে হেঁটে যাওয়াই সুবিবেচনার কাজ হবে, মনে করলাম।

ইতিমধ্যে সহরময় ছুটোছুটি করে' দিদি এনে হাজির করলেন তাঁর এক বিশেষ পরিচিত বন্ধুকে। দেশপ্রাণ ভদ্রলোক স্থির করেছিলেন, তাঁর কপালে যা-ই লেখা থাক্ তিনি জার্মানদের ভয়ে সহর ছাড়বেন না। সহর একেবারে নিষ্পুরুষ হয়ে গেলে জার্মানদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাবে কে?—এই রকম তাঁর যুক্তি ছিল। দিদি হেসে অভয় দিলেন, পোল মেয়েদের সম্মান তারা নিজেই রক্ষা করতে পারবে, তার জন্যে ভাবনা নেই। শেষপর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করবার জন্যে আত্মহত্যা ত আছেই। কিন্তু যুদ্ধক্ষম পুরুষ হিসেবে ভদ্রলোকের জীবনান্ত সুনিশ্চিত। সুতরাং সহরে থেকে তিনি বিশেষ কিছুই সাহায্য করতে পারবেন না। পরন্তু যদি দেশ ছাড়তে পারেন ত পরে ইংরেজ ও ফরাসী সেনায় ভর্তী হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে পাবারও সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে সহরে

থাকলে হয়তো তাঁকে মিত্রদের বিপক্ষেই অস্ত্রধারণ করতে হবে। এইসব অকাট্য যুক্তিতে পান্ ম—সহর ছাড়তে স্বীকৃত হ'লেন। যুক্তিগুলো অকাট্য হ'লেও, বেশ বোঝা গেল, দিদি আমাদের সঙ্গে আর একজনকে দিতে চান্। পথে বিপদ পদে পদে। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি সঙ্গে থাকলে সব দিক দিয়েই সুবিধা।

আমরা তিনজনে বেরুবার উপক্রম করছি, এমন সময়ে দিদি তাঁর হাতের ছাইরঙের হাল্কা ওভারকোটটা কনিষ্ঠাকে দিয়ে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন—"এটা নিতে ভুলে গিয়েছিলি! নে সঙ্গে, অনেক কাজে আসবে।" আমাকেও তিনি ঐ ধরণের ওভারকোট সঙ্গে নিতে বললেন। তখন তা সঙ্গে নেবার সময়ে অনেক ওজর আপত্তি করেছিলাম বটে, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা না থাকলে হয়তো যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া সম্ভব হ'তো না। যাই হোক, দিদির ওপর আমার আ-স্রা-মাটি এবং বাক্সে রাখা কাঞ্চনের ভার ন্যস্ত করে' বেরিয়ে পড়লাম।

প্রাচীন পল্লী থেকে মস্ত্ ক্যের্বেজ্যা বা উপনগরী প্রাগার যাবার পুল দু'পা মাত্র। মোট-ঘাট নিয়ে আমরা তিনজনে চললাম পুল লক্ষ্য করে'। সঙ্গে দিদিও রইলেন পুলের কাছে শেষ বিদায় দেবার জন্যে। পথে ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের চায়ের দোকান পড়লো। বাঁ দিকে দুর্গ, আর সামনে ভীস্‌লা, তার ওপারে উপনগরী প্রাগার সৌধাবলীর অপ্রতিহত বিস্তার। নিত্য-দেখা এ দৃশ্য আজ চোখ ভরে' দেখে নিলাম। হয়তো দৃশ্যটির সব ক'টি অংশ ভবিষ্যতে অখণ্ডভাবে দেখবার সুযোগ ঘটে' উঠবে না। পাঁচ বছরের নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ আত্মীয়-প্রতিম ভারশৌ সহর এবার পেছনে পড়লো। পুলের একেবারে কাছে এসে পড়েছি।

দিদি তাঁর কনিষ্ঠাকে আলিঙ্গন করে' আমার শিরশ্চুম্বন করলেন।

১২

দ ভিদ্‌জেনিয়া !

দ ভিদ্‌জেনিয়া !—আবার দেখা হবে।

এবার আর তাঁর চোখের পাতা ভিজলো না। দূর থেকে দু'একবার হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। তারপর ভিড়ের মাঝে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

দু'টি মানুষের জীবনের পথ এখন থেকে এক হ'লো।

কোনো রকমে ভিড় ঠেলে পুলের মাঝামাঝি এসে পড়েছি এমন সময়ে আবার আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তি। সঙ্গে সঙ্গেই দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু পুল লক্ষ্য করে' উড়ে আসছে, চোখে পড়লো। এতদিন ধরে' পুলের ওপরই বেশীরভাগ লড়াই হ'চ্ছিল। আজ তার একটা হেস্ত-নেস্ত করবার জন্যে জার্মানরা একেবারে উঠে পড়ে' লেগেছে সকাল থেকে। তাছাড়া শীঘ্রই নগর রক্ষা করবার জন্যে বিরাট পোলবাহিনী ভারশৌএ পৌছবে, গুজব শুনলাম। তা যাতে না আসতে পারে সেইজন্যে পোলরা পুল উড়িয়ে দেবার আগেই তাকে ভেঙ্গে দেবার জন্যে জার্মানরা বদ্ধপরিকর হয়েছে। সুতরাং জার্মানরা কোনো রকম মায়াদয়া না করেই পুল লক্ষ্য করে' বোমাবর্ষণ সুরু করবে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বোমারু-শিকারী কামান বিপুল বিক্রমে গোলা দাগতে সুরু করলে, এবং বোমারুরাও একেবারে বেপরোয়া হয়ে ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো।

পুলের আধাআধি যারা আসতে পারে নি, তারা ফিরে গেল। আর আমরা, যারা অর্দ্ধেক ছাড়িয়ে এসেছি তারা ঠেলাঠেলি করে', অপর পারে পৌছবার জন্যে রীতিমত জীবনসংগ্রাম সুরু করলাম। পুলের দু'পাশ দিয়ে লোক চলাচল করবার অপরিসর পথ। তার ওপর একদিককার

পথ ব্যবহারোপযোগী নয়। সুতরাং সামনের ভিড় ঠেলে এগুনো সহজ নয়। এবং আতঙ্কে বিশৃঙ্খল জনতার বুদ্ধিভ্রংশ হতে সুরু করেছে। একদল পুল ছেড়ে এগিয়ে যেতে চায়, অপর দল সামনে বোমারু দেখে এগুতে সাহস পায় না, ফিরে যেতে চায়। অথচ তাড়াতাড়ি মতিস্থির করে' যে পুল ছেড়ে যেকোনো দিকেরই হোক তীরে না পৌছলে পুল-সুদ্ধ ভীস্‌লা-গর্ভে জল-সমাধি লাভ করতে হবে, এই স্পষ্ট কথাটা কেউ বুঝতে পারছে না; ঠেলাঠেলি, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-তক্‌রারে সময় নষ্ট করছে। অবশেষে আমাদের জয় হ'লো। ভিড়কে সামনে ঠেলতে ঠেলতে এবং সাহস দিতে দিতে পেছনের লোকরা ওপারে গিয়ে পৌছলাম। তখন আর কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই। যে যেদিকে পারলে বড় রাস্তা ছেড়ে ছু'পাশের ঢালু জমি দিয়ে মরি কি বাঁচি করে' নীচে নেমে গেল। আমরা ক'জনও নদীর কাছাকাছি একটা গড়েন জমির আড়ালে গা ঢাকা দিলাম। ছু'একটা ছোট ছোট ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, মাথার ওপর ভীষণ যুদ্ধ চলেছে।

পুলের একেবারে কাছেই ভীষণ জোরে বোমা পড়ছে। নদীর তীরের মাটি থরথরিয়ে কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, ধারে-কাছে বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হুস্ হুস্ করে' মাটির ফোয়ারা উঠছে তিন চার তলার সমান। তাতে যে সুধু মাটি নেই, নরদেহের বিচ্ছিন্ন অংশও আছে, তা আগেকার অভিজ্ঞতা থেকেই অনুমান করা যায়। আক্রমণ বেশীক্ষণ চললো না, মিনিট পনেরো। বোমারু-শিকারী কামানের হুম্‌কিতে জার্মানরা ফিরে গেল। আমরাও তাড়াতাড়ি রাস্তার ওপর উঠে এলাম। ভারশৌ ছেড়েছি বটে, কিন্তু উপনগরী প্রাগা পার না হওয়া পর্য্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। সুতরাং যতদূর সম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে বেপরোয়াভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? তাছাড়া সন্ধ্যার

আগেই সহর ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে
রাত কাটাবার আশা নেই।

বড় রাস্তায় উঠে এসে দেখি, পথের ঠি
শেষ হয়েছে সেখানে একটি বেশ বড় রক
গর্ত, তার ভেতর থেকে কয়েক মিনিটে
এসেছে। এবং সেই জলের ওপর ভাসছে
কাঠের টুক্‌রো, ঘোড়ার বিচ্ছিন্ন দেহের অ
চাষীদের তৈরী পাঁউরুটি। অনুমানে
হয়তো নিজে ছুটে প্রাণ বাঁচিয়েছে, কিন্তু
দেবারও অবকাশ পায় নি।

রাস্তার চারিপাশের যা অবস্থা তাকে
না। দু'পাশের বাড়ী ভেঙ্গে চূরমার ত
মোটা লোহার ল্যাম্প্-পোষ্ট্‌গুলো বো
গেছে। যে লোহাকে হয়তো কারখানা
করা হয়েছিল, সে যে অমন এক নিমে
পারে, তা বিশ্বাস করাও দুরূহ। সুধু
লাইনগুলো দুমড়ে খাড়া হয়ে শূন্যে উঠে
বোমার গৌণ প্রতিক্রিয়ার ফল। সু
ধরণের হয়ে থাকে তা সহজেই অ
এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে ফুটো হয়ে গেছে,
এগুলো নাকি, বোমার উদরস্থ গ্রেনেডে
ভিড়ের মধ্যে সারি সারি কত লোক
পারে, তাও চেষ্টা করে' উপলব্ধি করতে

যাই হোক্, তাড়াতাড়ি প্রাগা ছেড়ে

না গেলে ধীরেসুস্থে কোথাও

ঠিক মাঝখানে যেখানে পুল এসে
মের ডোবা হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড
র মধ্যেই হু হু করে' জল উঠে
ছ একখানা ভাঙ্গা গাড়ীর চাকা,
ংশ আর খান দুই তিন বড় বড়
বোঝা গেল, বেচারা গাড়ীওয়ান
গাড়ী থেকে ঘোড়াটাকে খুলে

চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায়
হয়েছেই, তাছাড়া রাস্তার উঁচু উঁচু
মার প্রতিক্রিয়ায় একেবারে দুমড়ে
য় গলিয়ে অনেক পিটে সোজা
ষ মুচড়ে, তুবড়ে, নুইয়ে পড়তে
তাই নয়, বোমার চোটে ট্রামের
গেছে। বলা বাহুল্য, এসব মাত্র
তরাং বোমার আসল চোটটা কী
নুমেয়। তাছাড়া মোটা লোহা
তাও আখছার চোখে পড়লো।
র চোট। সুতরাং একটা গ্রেনেড্
কর শরীর ফুঁড়ে তবে ক্ষান্ত হ'তে
হয় না।
ড় গ্রামে পৌছবার জন্যে আমরা

যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে চলতে লাগলাম। ঠিক কোন্ দিকে যাবো তার এখনো কোনো স্থিরতা নেই। তবে সেনাবিভাগে সৈনিকদের গার্ডলিন্-এ যেতে বলাতে এইটুকু অনুমান করা গেল, অন্ততঃ ও অঞ্চলটা এখনো জার্মানদের হাতে আসে নি, এবং সে পথ দিয়ে পূর্ব দিক লক্ষ্য করে' চলতে হয়তো কোনো বাধা পাওয়া যাবে না। কারণ পারতপক্ষে পূব দিক দিয়ে জার্মানদের আসার সম্ভাবনা কম ; তারা উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে সহরের দিকে এগিয়ে আসছে। দেখা গেল, অনুমানটা ভুল হয় নি। কারণ সব মানুষই ঐদিকে চলেছে। আতঙ্কিত জনতা এবং বিশৃঙ্খল, বিক্ষিপ্ত, লক্ষ্যহীন সৈন্যের দল পথ চলা দস্তুরমত আয়াসসাধ্য করে' তুলেছে।

প্রাগা দিয়ে যাবার সময়ে একটি ঘটনার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন চাষা বা মজুর গোছের বুড়ো লোক। বয়েস পঁচাত্তর আন্দাজ হবে, আশীও হ'তে পারে। দীর্ঘাকার পুরুষ, প্রকাণ্ড একজোড়া সাদা গোঁফ, রঙটা আর একটু তামাটে হ'লে হঠাৎ রাজপুত বলে' ভুল করা যেত। একটা ইটের টুক্‌রো দিয়ে বড় বড় সামান্য-শিক্ষিতের হরফে ভাঙ্গা দেওয়ালের ওপর লেখা—"যারা সহর ছাড়ছো, তাদের মনে থাকে যেন এ দৃশ্য!" আমরা কাছ দিয়ে যাবার সময় লোকটি আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে তার আজানুবিলম্বিত হাত ঊর্দ্ধে তুলে সুধু বললে—"সহর ছাড়ছো তোমরা কোন্ মুখে? মনে থাকে যেন!" লক্ষ্য করলাম, তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে, মুখে স্পষ্ট উন্মত্ততার ছায়া। তার একটু দূরেই একটি লোক দাঁড়িয়েছিল, আমাদের চোখ ঠেরে এগিয়ে যেতে বললে। পরে আমাদের কাছে এসে চুপি চুপি বললে—"বেচারীর মাথার ঠিক নেই, পালিয়ে, স্ত্রী, ছেলে-পুলে, নাতী-নাত্‌নী, প্রায় জন কুড়ি মানুষের

পরিবার ঐ বাড়ীখানার নীচে চাপা পড়েছে ক'দিন হ'লো। বুড়ো বাড়ী ছিলনা, ফিরে এসে সে দৃশ্য দেখে তখনি সে পাগল হয়ে যায়। বেচারী একেবারে একলা।" শত ইচ্ছা থাকলেও এই নিরাত্মীয়, নিঃসঙ্গ, অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দু'টো সান্ত্বনার কথা বলারও সময় নেই। বেলা পড়ে' এলো, সহর ছেড়ে গাঁয়ে পৌছতে এখনও অনেকটা পথ।

প্রাগার সীমানার কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড রেলের স্টেশন। জার্মানরা ক'দিন ধরে' তাকে অল্প অল্প করে' ভাঙ্ছে। সামনে একটু দুরে ওভার-ব্রিজ্ দেখতে পাচ্ছি, তলা দিয়ে পথ। এ অঞ্চলের বাড়ী-ঘর বোমার চোটে অধিকাংশই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আক্রমণ যে অহরহ হয়ে থাকে, তা বোঝা গেল। তাই আমরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি চলেছি, ব্রিজ্টা পার হয়ে শ' পাঁচেক গজ যেতে পারলেই একটু নিরাপদ, আশেপাশে একটু খোলা জায়গা, দু' চারটে ঝোপ-ঝাড় আছে যেখানে আক্রমণের সময়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা যেতে পারে। কিন্তু ব্রিজ্টার যতই কাছে আসতে লাগলাম, স্বপ্নে যেমন হঠাৎ নিজেকে একেবারে শক্তিহীন বলে' মনে হয় এবং অতি সহজ কাজও অসাধ্য হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ঐ রেলের পুলটার কাছে যাওয়া ততই দুরূহ হয়ে উঠতে লাগলো। এবং জার্মানদের কৃপায় আর এগুনোও অসম্ভব হ'লো। আবার আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তি! ধারে-কাছে আশ্রয় নেবার জায়গা বিশেষ নেই। পথের মাঝখানে একটু ঘাস-জমীর ভেতর দু' চারটে খানা-কাটা "আশ্রয়" দেখা গেল। ছুটে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, সে ক'টি লোকে ভরা, ঢোকবার উপায় নেই। তাছাড়া ভেতর থেকে শোনা গেল, আশপাশের কয়েকটি পরিবার নাকি দিনের পর দিন পরিশ্রম করে' এই গুহাক'টি বানিয়েছে, সুতরাং তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত

সেখানে একটুও স্থান নেই। এই বিপদের সময় বেচারীদের ওপর আতিথ্যের ভার না চাপিয়ে অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে হ'লো। কাছেই যে ছ' একখানা আস্ত বাড়ী দেখা গেল, তারই একটিতে ঢুকে পড়লাম।

বাড়ীখানা বেশ পুরাণো হ'লেও পাকা গাঁথুনির দেওয়াল, তাতে যে বোমার প্রতিক্রিয়ার বিশেষ কোনো ফারাক হয়, তা নয়। তবে ওটুকু দিয়ে মনকে চোখ ঠারা চলে, এই যা। ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকে ছ' পাশের ফ্ল্যাট্‌গুলোতে যাবার পথ। ছ' পাশের অল্প-পরিসর পথ-ছ'টিতে রাস্তার চলতি লোক এসে আশ্রয় নিয়েছে। দেখতে দেখতে ভীষণ বোমা-বর্ষণ সুরু হ'লো। এত কাছে এরকম আক্রমণের চোট এর আগে অনুভব করা যায়নি। মনে হয়, বুঝি সমস্ত বাড়ীখানা হুড়মুড়িয়ে মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ে, এক এক বার বাড়ীখানা ভূমিকম্পে দোলানির মত দুলে উঠছে। বোমাগুলো হু হু শব্দে বর্ষিত হ'চ্ছে বেশীরভাগই স্টেশন এবং তারই পারিপার্শ্বিক বাড়ী-ঘর-দোরের ওপর। স্টেশনের দূরত্ব সেখান থেকে প্রায় পাঁচশ গজ। কিন্তু এই দূরত্ব অতিক্রম করেও বোমার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের বাড়ীখানা দুলছে। রাস্তা থেকে একটি মহিলা তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন, বোমার টুক্‌রো লেগে ভদ্রমহিলার মাথা কেটে গিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। তাঁরই পেছনে একটি ঝি গোছের মেয়ে একটা চক্‌চকে কাচের মালা হাতে করে' হাসতে হাসতে এসে ঢুকলো। পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। জার্মানদের ফেলা বিষ-মাখানো মালা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং সবাই মিলে হৈ হৈ রৈ রৈ করে' তার হাত থেকে মালাটা লাঠি দিয়ে এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে। পরে মেয়েটির কী হয়েছিল জানিনা। মালাটা জার্মানদের ফেলা বিষ-মাখানো না হ'তেও পারে। কিন্তু অমন চক্‌চকে হারছড়াটা ফেলে দিতে বেচারী মেয়েটির যেন বুক ফেটে যাচ্ছিল।

ভাবলাম, এ ধরণের মালা গ্রামে গ্রামে যদি সত্যিই ছড়ানো হয়ে থাকে ত তা কত অবোধ চাষার মেয়েরই সর্বনাশ করেছে।

আক্রমণ যখন বেশ একটু চেপে এলো তখন "আশ্রিত" ব্যক্তিগণ সারি সারি নতজানু হয়ে পাতের্-নস্তের্ জপতে বসলো। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত জনতার দৃশ্য অসহ্য হয়ে উঠলো। বাড়ীটির সামনের দিকে একটা চায়ের দোকান ছিল। ভেতর থেকে তার পেছনদিককার দোর দিয়ে আমরা তিনজনে তার ভেতর গিয়ে হাজির হ'লাম, এবং তিন পেয়ালা কড়া চা ও কিছু খাবার চেয়ে দোকানের অধিকারিণীকে অবাক্ করে' দিলাম। সুধু তাই নয়, পথে দরকার হ'তে পারে এমন দু'টো একটা জিনিষ কিনে আমরা নিতান্ত সহজভাবে সুট্-কেসে ভরতে লাগলাম। মরণকালে হরিনাম বা যীশু-নাম না করে' আমরা যে এ কাজটি করেছিলাম তাতে পরে দেখা গেল, আমরা বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলাম। কারণ, পরে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

ঘন্টাখানেক আক্রমণের পর বিমান-বাহিনী ঘর মুখো ধাওয়া করলে। এবং আমরাও আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু করলাম। পথে বেরিয়ে দেখা গেল, অনেকগুলি বাড়ী ধরাশায়ী হয়েছে। যেতে যেতে শুনলাম, স্টেশনটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। স্টেশনের গায়েই একখানা একতলা ঘরে আহত সৈনিকদের সেবা করবার জন্যে গার্ল্-গাইড্রা একটা পরিচর্য্যা-কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। ষাটজন মেয়ে, বয়েস চোদ্দ থেকে আঠারো পর্য্যন্ত। একটা প্রকাণ্ড এক টনের বোমা ঘরখানাকে ঐ ষাটটি মেয়ে সুদ্ধ একেবারে মাটির ভেতর বসিয়ে দিয়েছে। ঘরখানার বিশেষ কোনো প্রকট চিহ্ন চোখে পড়ে না। দৃশ্যটা চোখে না দেখলেও, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ঐ ধরণের ঘটনা আর ষাটটি নিঃস্বার্থ, সেবাব্রতা গার্ল্-গাইডের,

মৃত্যুর সংবাদ শুনে মনে আপনাআপনি যে ছবিটা ফুটে উঠলো তাকে অনেকক্ষণ কল্পনা থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করা গেলনা।

উপনগরী প্রাগা ছাড়িয়ে ভারশৌএর সহরতলী গ্রহুফ্। এখান থেকে গ্রামের পথ আরম্ভ হ'লো। প্রস্থে আমদের চৌরঙ্গীর প্রায় দু'গুণ হবে, কিন্তু একসঙ্গে এত মানুষ, গাড়ী আর সৈন্যের দল এসে জুটেছে, যে কারো পক্ষেই একপা এগুনো সম্ভব নয়। সৈনিকদের আগে ছেড়ে দিতে হবে, কারণ তারা চলেছে গার্ভলিন লক্ষ্য করে', লড়তে। মোটারের দাবী তাদের পরেই। কারণ অন্যকোনো গাড়ীকে ধাক্কা দিয়ে বা পথে চলা মানুষকে চাপা দিয়ে এগিয়ে যাবার হিম্মৎ তাদের আছে, আরোহীদের ব্যক্তিগত কিম্মৎ যাই থাকুক। ফিটন বা অন্যকোনো গাড়ীর দাবী পায়ে হাঁটা লোকদের আগে, কারণ পূর্বোক্তদের পরোক্তগণের হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে, পোষাক ছিঁড়ে, গায়ে কাদা ছিটিয়ে এগিয়ে যাবারও ক্ষমতা আছে। হেঁটে-চলা মানুষদের সুবিধা এই যে, তারা অনায়াসে আশ কাটিয়ে পাশ কাটিয়ে, খানা টপকে, বেড়া ডিঙিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে, যতক্ষণ না আবার দু'পাশের বাড়ীর বাধা পেয়ে তাদের রাস্তায় নেমে আসতে না হয়।

ফলে এই তিন প্রকারের গতিশীল মানুষ পথ চলা অসম্ভব করে' তুলেছে। এ অঞ্চলে যদি সমস্ত ভারশৌ সহরের ট্রাফিক্ পুলিসকেও এনে হাজির করা যেত, ত তারাও এই বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে কোনোরকম শৃঙ্খলা স্থাপনা করতে পারতো কিনা সন্দেহ। শেষকালে এই ধরণের জীবন-সংগ্রামে সৈনিকদেরই জয় হ'লো। কারণ তারা সঙ্গীন উঁচিয়ে অসামরিক মোটার, ফিটন্, ছ্যাকড়া গাড়ী, সাইক্ল্, পদব্রজী, অশ্বারোহী, ঘোড়া, গরু, কুকুর, বেড়াল, সবাইকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখলে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে আমরা তিনজন তিনটি সূক্ষ্ম-দেহের মত তিন দিক দিয়ে,

ভিড় ছাড়িয়ে সহরতলীর মাঝখানে এসে পুনর্মিলিত হ'লাম। একাজে অবশ্য বিপদ ছিল সমূহ। কারণ একে ত বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত সৈনিকদের সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করার সম্ভাবনা ছিল, তাছাড়া পরস্পরের পুনর্দর্শনের সম্ভাব্য তার চেয়ে ঢের কম ছিল। কিন্তু এছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না।

গ্রহফ্ বলে' ভারশৌএর যে সহরতলী ছিল, তার অধিকাংশ ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে দেখলাম। তাদের বিধ্বস্ত দেহে কল-বন্দুকের ক্ষতচিহ্ন, সর্বাঙ্গে যেন বসন্তের দাগ, এত কাছাকাছি গুলিগুলোর চোট পড়েছে। স্থতরাং সেসব জায়গায় মানুষ যে কত মরেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

সামনে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে পলাতকের দল চলেছে। অনেকেই ছোট ছোট সংসার নিয়ে চলেছে পিঠে, মাথায়। কেউ ঘোড়া বা গরু সঙ্গে নিয়েছে, কেউ বা কুকুর, কেউ বা বেড়াল, কারো হাতে পাখীর খাঁচা। তাদের সঙ্গে মিশে চলেছে উর্দি-পরা, পায়ে-চলা সৈনিক, বিশৃঙ্খলভাবে, এবং তারা যারা সৈনিক হ'তে চায়। কারোই বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই; আপাততঃ গার্ভলিন্, পরে কোথায় যাবে তা আমরা যেমন জানি না, তেমনি তারাও না। তখনো বেশ গরম চলেছে। পথিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে পথের ধারে জায়গায় জায়গায় চাষার মেয়েরা জল বয়ে এনে লোককে জল বিতরণ করছে। আমরা তখন সহর ছাড়িয়ে বেশ অনেকখানি চলে' এসেছি, এবং সন্ধ্যার আবছায়া চারিদিক ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু গার্ভলিন সেখানে অনেকদূর, যতদুর মনে পড়ে, মাইল কুড়ি হবে। স্থতরাং সেখানে নিরাপদে পৌছতে হ'লে সারা রাত ধরে' চলতে হবে, এবং পরের দিনও বেশ বেলা হবার আগে পৌছন যাবে না। যাই হোক্, আমরা দাঁতে দাঁত চেপে অন্ধকারে পা চালিয়ে চলতে লাগলাম যতটা পারা যায়। একটু পরেই ভাগ্য সদয় হ'লো।

ঘন্টাদুই এইভাবে চলার পর শুনতে পাওয়া গেল, অন্ধকার তোলপাড় করে' অনেকগুলো সামরিক মালবাহী ঘোড়ার গাড়ী পথের মাঝখান দিয়ে ভিড় ঠেলে চলেছে। ঘোড়ার গাড়ী বলতে বিশেষ কিছু নয়, সুধু চাষাদের ক্ষেতখামারের ব্যবহারের জন্যে অতি সাধারণ গাড়ী। চাকায় লোহার বেড়, আর খানকয়েক তক্তা দিয়ে তৈরী গাড়ীর অন্যান্য অবয়ব। তারই ওপর,আন্দাজে বোঝা গেল, বন্দুক আর গুলির বাক্স তিরপল দিয়ে ঢাকা। গাড়ীগুলির আরোহী দু'চার জন করে' সৈনিক মাত্র। শেষ গাড়ীখানি আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় পান্ ম—হাস্যচ্ছলে জিজ্ঞেস করলেন —"হেই পানভিয়ে, আমাদের তুলে নিয়ে দু'পা এগিয়ে দেবে?" ভাবা গিয়েছিল, এধরণের হাল্কা প্রস্তাব তারা হাসির তোড়ে ভাসিয়ে দিয়ে পথের ধূলো উড়িয়ে চলে' যাবে। কিন্তু দেখা গেল, তারা গাড়ী রুকে দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে লাগলো। আমরা যখন কাছে এসে পড়লাম তখন একজন নেমে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—"ক'জন আপনারা? তিন জন?" তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ইসারায় আমাদের গাড়ীতে উঠতে আহ্বান করলে।

গাড়োয়ান নেমে পড়ে ঘোড়াকে খাওয়াবার ভান করতে করতে বললে—"ওব্যাটারা একটু এগিয়ে যাক্। না হ'লে হয়তো গোলমাল করবে। সিগারেট আছে পানিয়ে?" পান্ ম—তাঁর কেস্-ভরা সিগারেট তাদের সামনে মেলে ধরলেন। ধূমপান করতে করতে তারা আমাদের সঙ্গে নানা গল্প জুড়ে দিলে। শুনলাম তারা পশ্চিম অঞ্চল কাতোভীৎসে থেকে আসছে। জার্মানরা তিন চার দিন হ'লো সে অঞ্চল দখল করাতে তারা ক্রমাগত পূব মুখো চলেছে, কোথায় জানে না, তবে আপাততঃ মিন্স্ক্ (পোলদেশের)। জার্মানরা কি ভাবে পশ্চিম অঞ্চল দখল করেছে তারও মোটামুটি বিবরণ পাওয়া গেল। শুনলাম, তারা

ওদিক থেকে সমস্ত পোলদের অল্পক্ষণের নোটিস্ দিয়ে পূব দিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। লাখে লাখে লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাওয়া দাওয়া নেই, আশ্রয় নেই। এরাও ক্রমাগত চার দিন গাড়ী চালিয়ে, জার্মানদের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এসে পড়েছে। পথে আমাদের মত ক্লান্ত পথিকদেরও তারা রাতে ভিতে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে তাদের শ্রান্তির লাঘব করেছে। না দিয়েই বা পারা যায় কী করে'? সৈনিকের উর্দি পরা থাকলেও আমরাও ত মানুষ, পানিয়ে! ঐ দেখুন না, আমাদের আর একটী সাথী! এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, গাড়ীর ওপর মুড়িসুড়ি দিয়ে কে একজন নিদ্রা দিচ্ছিল, আমাদের কথার আওয়াজে উঠে বসে' একটা সিগারেট চাইলে। লোকটা গরীব বেচারী সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চোখে মুখে যে প্রকাশভঙ্গী তাতে তার সঙ্গে একযাত্রায় পৃথক ফল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই অন্ধকারেও তাকে দেখে বোঝা যায়, শ্রীঘরে ঘন ঘন যাতায়াত করা তার অভ্যাস আছে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা সবাই গাড়ীতে উঠে বসলাম। শক্ত, উঁচুনীচু বাক্সগুলোর ওপর প্রথম যখন উঠে বসলাম, তখন যে আরাম পাওয়া গেল তাকে স্বর্গসুখের সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু গাড়ী কিছুদূর চলবার পর সুরু হ'লো নরক-যন্ত্রণা। পাথুরে রাস্তার ওপর লোহার বেড়-ওয়ালা অবর্তুল চাকার গতিতে আমরা পুনঃ পুনঃ দন্ কিহোতের সতরঞ্চি-লীলার মত শূন্যে নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগলাম। অস্মৎপক্ষে অবশ্য সতরঞ্চির পরিবর্তে তিরপল-ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো কোণ-ওয়ালা বাক্সের স্তূপ।

যাই হোক্ ওটুকু কষ্ট সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ পায়ে হেঁটে হয়তো এরচেয়ে আরামে যাওয়া যেত, কিন্তু পরের দিন বিকেলের

আগে মিন্‌স্ক্‌-এ পৌছন যেত না। আরো মুস্কিল হ'লো এই যে, গাড়ীর ঝাকানিতে আমাদের তিনজনেরই যেন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে একসঙ্গে ঘুমে চোখ ঢুলে এলো। ঘুমোবার পক্ষে আমাদের যোগাসনগুলি ঠিক প্রশস্ত না হ'লেও, আমাদের চোখের পাতা হাজার চেষ্টা উপেক্ষা করে' জড়িয়ে ক্রমে বুজে আসতে লাগলো। তিনজনই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে, আমাদের সহযাত্রীটি যে স্বধর্ম পালনে উদ্যত হবেন, সে কথা আমাদের অজানা ছিল না। কাজেই আমরা পালা ক'রে জেগে রইলাম। তখন কৃষ্ণপক্ষ সুরু হয়েছে, অনেক রাত্রে চাঁদ ওঠে। চারিদিকে যেন গাঢ় আলকাতরার মত অন্ধকার চুঁইয়ে পড়ছে। দু'পাশে অবিরাম পায়ে চলা আর গাড়ীর চাকার শব্দ। লক্ষ লক্ষ নরনারী এমনি ক'রে সারারাত ধরে' চলবে অনির্দিষ্ট নিরাপত্তার সন্ধানে। যারা দেশাত্মবোধ ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে দেশ ছাড়ছে, মিত্রদের সেনায় ভর্তী হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়বার আশায়, তারাও যে এভাবে পথ চলে' কতদিনে সীমান্ত পার হবে, তারও কোনো স্থিরতা নেই। অথচ এই শতসহস্র মানুষ শত্রুদের সংস্পর্শ থেকে আপনাদের অপসৃত করবার জন্যে নিদারুণ পথক্লান্তি ও মৃত্যুকে বরণ করে নিলে।

খানিকদূর গিয়ে আমরা একটা রেলের ওভার-ব্রিজের তলায় এসে পড়লাম। অন্ধকারে এঞ্জিনের আওয়াজে অনুমান করা গেল, কোনো ষ্টেশন হবে। ব্রিজের কাছেই একটা লম্বা ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, মনে হ'লো; কামরাগুলোর জানালা দিয়ে জোনাকীর স্ফুলিঙ্গের মত মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে। ট্রেনখানা কোন্‌মুখো যাবে তার স্থিরতা নেই বোধ হয়, তবে হয়তো সীমান্ত লক্ষ্য করে' পূবে কি দক্ষিণে। দু'একবার মনে হ'লো, এই অশ্বযান ছেড়ে ট্রেনে উঠে পড়লেও হয়। তাতে কাল-পরশু নাগাদ সীমান্ত বা সীমান্তের কাছাকাছি পৌছন যেতে পারবে।

কিন্তু হঠাৎ আমার ঝির সখীর বিবরণ মনে পড়ায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম, এবং এতে যে বিলক্ষণ সুবুদ্ধির কাজ করেছিলাম, তাও দু'একদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম। যাই হোক্, সঙ্গীদের জাগালাম না। কিছু পরেই লক্ষ্য করলাম, আমাদের অজ্ঞাত সহযাত্রীটি হঠাৎ উঠে বসে' গভীর মনযোগ সহকারে কী দেখতে লাগলো, তার পর প্রকাণ্ড নিশাচর পাখীর মত দাঁড়িয়ে উঠে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে' অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরে তার কোনো হদিস্ পেলাম না। হয়তো অন্ধকার রাতে শিকারে বেরুলো, হয়তো বা ট্রেনে করে' তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে সেই দিকেই গেল। মনে পড়লো, যুদ্ধের হিড়িকে পোলদেশের সমস্ত জেলখানা থেকে চোর, ডাকাত এবং খুনেদের খালাস করে' দেওয়া হয়েছে। হাজারে হাজারে এই ধরণের নিশাচর পক্ষী যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে এক হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে, এ চিন্তাটা এখন নিতান্ত সাধারণ মনে হ'লেও, সেদিনকার ঐ অন্ধকার রাত্রে বিশেষ প্রীতিপ্রদ বলে' বোধ হ'লো না।

ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এলো। কিছুক্ষণ ধরে' দিক্‌চক্রবালে যেন অল্প অল্প আলো দেখা যাচ্ছিল। আমরা যতই এগিয়ে চলেছি, সে আলো ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এইবার সে আলো অরুণোদয়ের ভ্রম ঘটালে। হঠাৎ মনে হয়, যেন সূর্য্য উঠলো বলে'। অথচ ঘড়িতে রাত বারোটা। সূর্য্যোদয়ের আলো যদিও হয় তাহলে তা যে দিকচক্রবালের সমস্ত বেষ্টনী ঘিরে ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, এটা সম্ভব হত'না। এ ধরণের আলো আমার আগে দেখা ছিল না। মনে হ'লো, গত বছর ওদেশে যেমন অরোরা বরেয়ালিস্ দেখা গিয়েছিল, হয়তো এও ঐরকম কিছু একটা হবে। কিন্তু সৈনিকদের কাছে তার অন্য পরিচয় পাওয়া গেল। দূরে দূরে চারিদিকে বড় বড় গণ্ডগ্রাম আর ছোট খাটো সহর

জার্মানরা সন্ধ্যার কিছু আগে অগ্নিবর্ষী বোমা দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। তারই এই আলো সারারাত ধরে' অরুণোদয়ের ভ্রম উৎপাদন করছে। এ ধরণের আলো পথে আসতে আসতে সৈনিকদের রোজই চোখে পড়ছে, সুতরাং তারা এতে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত।

রাত দু'টো আন্দাজ সময়ে পথের ধারে ছোট একটা বাড়ীতে মিট্ মিট্ করে' আলো জ্বলছে দেখে সৈনিকরা গাড়ী থামিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে। জল চাই, ঘোড়া তিনটিকে খাওয়াতে হবে। এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, গাড়ীর সঙ্গে বাঁধা আর একটা ঘোড়া সমানে আমাদের সঙ্গে আসছে। সৈনিকদেরই একজন তার মালিক। চাষ-বাস ছেড়ে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে আসবার সময় অনুগত ঘোড়াটি কুকুরের মত তার অনুসরণ করে। সুতরাং সেটিকে সঙ্গে নিতে সে বাধ্য হয়। মাটি, ক্ষেত-খামারের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ পোল চাষাদের পক্ষে হঠাৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করে', অঙ্গে খাকি চড়িয়ে, নিজের গ্রাম ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়া যে কত দুরূহ, তা উপলব্ধি করলাম। যাই হোক্, জল পাওয়া গেল না, ঘোড়াদের জন্যেও নয়, মানুষদের জন্যেও নয়। সারাদিন ধরে' পথ-চলা পথিকরা গৃহস্থের কুয়া একেবারে শুষে নিয়েছে। কাল সকাল পর্য্যন্ত এক ফোঁটাও জল পাওয়া যাবে না।

আমরা আবার চলতে লাগলাম। এবার পান্ ম—র রাত জাগবার পালা। আমি কোনরকমে এবড়ো-খেবড়ো কোণ-ওয়ালা বাক্সের স্তূপের ওপর নিজের শর-শয্যা রচনা করে' নির্বিবাদে তার ওপর শুয়ে পড়লাম। সারা রাত ধরে' ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পাই পথ-চলা মানুষের অস্ফুট আলোচনা আর পাশ দিয়ে চলে'-যাওয়া গাড়ীর চাকার শব্দ। আব্ছা অন্ধকারে দেখতে পাই, আগের দিনের জন-স্রোতে একটুও ভাঁটা পড়ে নি। সেই রকমই হাজারে হাজারে মানুষ চলেছে পায়ে হেঁটে,

অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানেরা (যদিচ এ ভাগ্য তাদের বেশীদিন ভোগ করা ঘটে' ওঠেনি) কেউ মোটারে, কেউ চাষাদের মালবাহী ঘোড়ার গাড়ীতে, কেউ কেউ সাইক্লে। আমাদের সহযাত্রী সৈনিকরা চাপা গলায় নিজের নিজের ঘর-বাড়ী ক্ষেত-খামারের গল্প করছে। কারো যব গম কেটে ঘরে তোলা হয় নি এখনো ; কারো সামনের রবিবার ভাইয়ের বিয়ের দিন ছিল, যুদ্ধের হিড়িকে হলো না, পাদ্রীদের পাওনা টাকাকড়ি সব আগাম দেওয়া আছে, অথচ সব পণ্ড হয়ে গেল ; কারো বা স্ত্রীকে কে একজন প্রতিবেশী ভুলিয়ে নিয়ে গেছে—ভেতরে ভেতরে তাদের পূর্বরাগ চলছিল, যুদ্ধের হুজুকে তারা একসঙ্গে জোট বেঁধে পালিয়েছে। "পালিয়ে, তাদের আমি খুঁজে বের করবোই, যেখানেই থাক্ তারা। মা মারীয়র নামে শপথ করে' বলচি!" শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

৮ই সেপ্টেম্বর।

ভোর পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙলো দূরে বোমারুর গজরানিতে। রোজ-কার মত নিয়মিতরূপে জার্মানরা তাদের স্পোর্ট্ সুরু করেছে। আমরা তখন মিন্স্ক্ সহরের* খুব কাছে এসে পড়েছি। যে কারণেই হোক, বোমারুগুলো আমাদের দিকে এলো না, এবং আমরাও নির্বিবাদে সটান সহরে ঢুকে একটা পার্কের কাছে নেমে পড়লাম। সৈনিকদের কিছু কিছু বখ্‌শিস্ দিতে যাওয়াতে তারা সামরিক সেলাম ঠুকে অর্থ গ্রহণে অসামর্থ্য জানালে। সুতরাং তাদের প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা তিনজনে রাত্রের শর-শয্যা-জনিত শরীরের বেদনার উপশম করবার জন্যে পার্কের একটা বেঞ্চীতে হাত পা ছড়িয়ে বসলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ বসা গেল না, কারণ সহরের সবক'টি ডাকিনী-যোগিনী সমস্বরে চীৎকার করে' জানিয়ে দিলে, জার্মানরা সহরের ওপর এসে পড়েছে।

পার্কের ভেতরই আঙুল-আঁকা "আশ্রয়ের" পথ-নির্দেশ ছিল। সুতরাং কোনোদিকে না তাকিয়েই আমরা আঙুল লক্ষ্য করে' চলতে চলতে

* শ্বেত রুশ-দেশে যে মিন্স্ক্ সহর আছে, এ তা নয়। পোলদেশের মিন্স্ক্ সহর ভারশৌ থেকে মাইল কুড়ি দূরে অবস্থিত।

"আশ্রয়ে" এসে ঢুকলাম। এটি স্থধু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নয়, নিরন্নের অন্নসত্রও বটে। বিঘে পঞ্চাশ-ষাট জুড়ে প্রকাণ্ড একটি আপেল ও নেস্পাতির বাগান। বোমার হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এখানে কোনো গুহা বা ঐ জাতীয় কিছুই নেই। তার বদলে আছে সারি সারি ছোট ছোট আপেল আর নেস্পাতির গাছ। আত্মরক্ষা সম্বন্ধে কোনো প্রকট নির্দেশ কোথাও টাঙানো না থাকলেও মানুষ নিজে থেকেই প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হয়ে ঐ গাছগুলির তলায় এসে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে মানুষের শেষ আশ্রয় যে গাছের তলা, তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। আমরা তিনটি আপেল গাছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আম্র-শাখী-সংলগ্ন মাধবী-বল্লরীর ভ্রম ঘটালাম কি না জানি না, তবে জার্মানরা আমাদের নেহাৎ আপেল-নেস্পাতির গাছ মনে করে' আমাদের লক্ষ্য করে' একটা ছর্‌রা-গুলিও খরচ করা প্রয়োজন মনে করলে না। একটা নূতন জিনিষ শেখা গেল। মাঠে-বাটে আত্মরক্ষা করতে হ'লে ঝোপ-ঝাড়ের তলায় ঘুপ্‌টি মেরে বসে' থাকা বা ছোট ছোট গাছকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে' নিঃসাড়ে পড়ে' থাকা। কারণ বড় বড় গাছ নজরে এলেই জর্মান বৈমানিকরা ওপরওয়ালাদের নির্দেশমত তাদের ওপর একেবারে টিপ্ করে' বোমা ফেলে যায়, দেখা গেছে।

আক্রমণ শেষ হ'লে উক্ত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে সের দুই করে' আপেল সঙ্গে নেওয়া গেল। ফলগুলো সব না পাকলেও এখনি খাওয়া চলে, এবং তৃষ্ণা-নিবারণের পক্ষে তা একেবারে অব্যর্থ। তাড়াতাড়ি পথ খুঁজে নিয়ে মিন্‌স্ক্ ছেড়ে চলে' যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌দিকে যাবো, তা এখনো ঠিক নেই। মিন্‌স্ক্ থেকে গার্ভলিন্ যাবার যে রাস্তা তা একেবারে ফাঁকা, অথচ অন্য রাস্তা দিয়ে কালকের মতই অব্যাহত জনস্রোত চলেছে। কারণ অনুসন্ধান করে' জানা গেল, গার্ভলিনে কাল

সারাদিন ধরে' প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণ হয়েছে, সহরের বিশেষ কিছু বাকী নেই। সুতরাং লোকে সোজা পূবমুখো চলেছে শ্মোদ্‌লৎসে লক্ষ্য করে'; জার্মানরা হয়তো এখনো ওদিকে পৌছয় নি। মিন্‌স্ক্‌-এর পরবর্তী সহর কালুশিন্, যতদূর মনে পড়ে, সেখান থেকে প্রায় দশ বারো মাইল। আমরা আপাততঃ কালুশিন্ লক্ষ্য করে' চলতে লাগলাম। মাঠের বুক চিরে সোজা পথ চলে' গেছে, প্রস্থে প্রায় পঞ্চাশ গজ। দু'পাশে একটু দূরে দূরে গ্রাম, আর বড় বড় ভুর্জ, পাইন প্রভৃতির বন। মাঠে ছোট ছোট আলুর চারা, বা অন্য কোন ঝোপ-ঝাড়। এইবার সত্যিই গ্রামে এসে পড়েছি, জার্মানরা আক্রমণ করলে আর আশঙ্কা-বিজ্ঞপ্তি শোনবার উপায় নেই। বোমারুর গজরানির দিকে সতর্ক কান রেখে এই হাজারে হাজারে যাযাবর নরনারী, বৃদ্ধ, শিশু এগিয়ে চলেছে, আতঙ্কে দিক্‌-বিদিক্‌-জ্ঞান-শূন্য হয়ে।

একটু যেতে যেতেই হুহু করে' জর্মান বোমারুরা জনতার ওপর এসে পড়লো। আমরা আজ সকালে যেভাবে আত্মরক্ষা করেছি, সেকথা এই অসংখ্য, বিক্ষিপ্ত মানুষকে জানিয়ে দেবে কে? তবুও আমরা পাগলের মত চীৎকার করে' বলতে লাগলাম—"পথ ছেড়ে মাঠে গিয়ে আলুর ক্ষেতে শুয়ে পড়ো! পথ ছেড়ে মাঠে গিয়ে শুয়ে পড়ো! ঝোপের তলায় লুকোও!" তাতে বিশেষ ফল হ'লো বলে' মনে হ'লো না। বিশৃঙ্খল জনতা স্বপ্নাবিষ্টের মত ক্রমাগত পথ দিয়ে এগিয়ে চললো। আমরা নিরুপায় হয়ে ছুটতে ছুটতে আলুর ক্ষেতে শুয়ে পড়লাম, আপাদ-মস্তক ছাইরঙের রেন-কোট ঢাকা দিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই আতঙ্কিত জনতার ওপর জার্মানরা নির্মমভাবে বোমা ফেলতে সুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে কল-বন্দুকের গুলির শিলা-বৃষ্টিও চললো সমানে। আলুর ক্ষেতে শুয়ে শুয়ে আক্রমণের দূরাগত প্রতিক্রিয়া আমরা স্পষ্টরূপে অনুভব করতে লাগলাম। ধারে-

কাছে বড় বড় বনগুলোর ওপরও অনেকগুলো বোমা পড়লো, এবং গুলির চোট লেগে মাটি ছিটকে পড়ছে খুব কাছেই, শুনতে পেলাম।

আক্রমণ বেশীক্ষণ চললো না, চলবার দরকারও ছিল না। আধুনিক যন্ত্রকৌশলে নিরস্ত্র জনতাকে ধ্বংস করবার জন্যে পনেরো মিনিটই যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি রাস্তায় ফিরে এসে দেখলাম, জায়গায় জায়গায় বড় বড় ডোবার মত গর্ত হয়ে গেছে, আর নরনারীর মৃতদেহে পথ আকীর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বপ্নাবিষ্ট জনতা ঠিক আগের মতই সামনের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। যারা পড়ে রইল, তাদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই। যে অবস্থায় এসে পড়া গেল, তার চেয়ে সহরে বসে' থাকা হয়তো সহস্রগুণে ভালো ছিল। কারণ এ যেন বন্ধ থলের ভেতর পড়ে' পড়ে' মার খাওয়া। এগোবারও উপায় নেই পেছবারও উপায় নেই। তবুও যদি কোনরকমে সীমান্তে গিয়ে পৌছন যায়, এই ক্ষীণ আশায় আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটা সুরু করে' দিলাম।

এবার বড় রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। রাস্তাটা ঘুর হ'লেও তাতে বিপদ অপেক্ষাকৃত কম, কারণ এপথে ভিড় নেই বললেই হয়। কিন্তু খানিকদূর গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো, তা জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ। খানার ধারে পড়ে' আছে একটি মেয়ের শব; কল-বন্দুকের গুলিতে হিট্‌লারযুগেন্দ্ মেয়েটির শরীর কোমরের কাছে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে' দিয়ে গেছে। বয়েস মেয়েটির বেশী হয় নি, বছর বাইশ। কোলে একটি বছরখানেকের শিশু ছিল, সে তখনও নির্বিকারভাবে স্তন্যপান করছে। একটি চাষী বুড়ী ছেলেটিকে তুলে নিয়ে গেল।

গাঁয়ের পথ ধরে' আমরা বোমারুদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু ঘন্টা তিনেক চলবার পর গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস

করে' জানা গেল, আমরা সুধু একবার মিন্‌স্ক্‌ সহরকে প্রদক্ষিণ করেছি মাত্র। তখন বেলা চড়তে আরম্ভ করছে, এবং রৌদ্রের তেজ ক্রমে এত বেড়ে চললো যে, কিছুক্ষণ পরেই একটু বিশ্রাম করা দরকার হয়ে পড়লো। আমরা তখন গ্রাম ছাড়িয়ে খোলা মাঠে এসে পড়েছি। ধারে-কাছে সুধু ছোট বড় বন, চাষাভূষোদের কুটীর অনেকদূর পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। পথে একজনকে জিজ্ঞেস করে' জানা গেল, দূরে ঐ বনটার ভেতর একটি বেশ স্বচ্ছল অবস্থার কিষাণ পরিবার বাস করে। সেখানে আশ্রয় এবং আহার্য্য দুই মিলতে পারে। বনটা সেখান থেকে খুব কাছে নয়, মাঠের ব্যবধান অতিক্রম করতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে যাবে। তবুও সেই-মুখোই ধাওয়া করলাম। কিন্তু আসলে মাঠ পার হতে' প্রায় এক ঘন্টার ওপর লেগে গেল, কারণ বেশীর ভাগ সময়ই জার্মানদের প্রসাদে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, বা আলুরক্ষেতে শুয়ে কাটাতে হ'লো।

বনের ভেতর ঢুকে দেখা গেল, এতটা পরিশ্রম পণ্ড। সেখানে বা তার ধারে-কাছেও কোথাও থাকা নিরাপদ নয়। কারণ বনটির ভেতর আশ্রয় নিয়েছে সমগ্র একটি পোল অশ্বারোহী বাহিনী। বাদামী ও সাদারঙের ঘোড়ায় বনতল ছেয়ে গেছে। তবুও তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে চাষার বাড়ীতে ঢুকতেই হ'লো। দেখে মনে হয়, এ পরিবারটি বেশ অবস্থাপন্ন, বনের ভেতরও বাড়ীর চারিদিকে আপেল ও নেস্‌পাতির বাগান, আঙ্গিনায় হাঁস-মুর্গী অসংখ্য, প্রকাণ্ড শস্যাগার, গোয়ালে গরু ধরে না। সুধু তাই নয়, স্বয়ংগতিশীল কল দিয়ে এখানে শস্যকে শীষ থেকে পৃথক্‌ করা হ'চ্ছে। সুতরাং সাহস করে' এদের কাছে কিঞ্চিৎ আহার্য্য খরিদ করবার প্রস্তাব করা গেল। কিন্তু গৃহস্বামিনী আফ্‌শোষের সহিত জানালেন, তাঁদের বাড়ীতে যা আছে তা দিয়ে বুভুক্ষু সৈন্যদেরই খাওয়ানো হয়ে উঠবে না। মেজর সাহেবের নিজেরই ত একটি আস্ত পেরু না হ'লে

চলবে না। সৈনিকদের পাতেও আধখানা করে' মুর্গী বা হাঁস না পড়লে তারা লড়বে কী তাকুৎ নিয়ে? যাই হোক্, এখানে দু'তিন গেলাস করে' দই ছাড়া আর কিছু মিললো না।

দাম?

দাম আবার কী! ওটুকু-দইয়ের আবার দাম আছে নাকি?

গৃহস্বামিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বনটারই ধারে গাছের তলায় একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে সেইদিকে যাত্রা করলাম। মাথার ওপর অবিরত বোমারুর গজরানি শুনতে পাচ্ছি, এবং দূরে মাঠের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনের ছায়ার মত ছায়া দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। কাজেই আপাততঃ এ বন ছাড়া অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। বেলা তখন প্রায় বারোটা। বনের ধারে, অশ্বারোহী বাহিনীর একটু দূরে গাছের তলায় বসে' আমাদের সঙ্গে-আনা ব্রাউন ব্রেড্ আর মাখন দিয়ে প্রাতঃরাশ ও মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নেওয়া গেল। মাঝে মাঝে চাষার বাড়ীতে সাঙ্গোপাঙ্গ মেজর দেবের ভোগের জন্যে পক্ষিকুল বলি দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাওয়াতে শুকনো রুটি গলাধঃকরণ করতে রীতিমত কষ্ট হ'তে লাগলো বটে, তবে আহারের পর শরীরটা একটু সুস্থ ও সজীব হ'লো। গাছের তলায় ওভারকোট বিছিয়ে সুট্-কেস্ মাথায় দিয়ে আমরা একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিন্তু বোমারু-উত্যক্ত এই বনভূমিতে নিদ্রাদেবীর কাছে আমাদের আবেদন অরণ্যে রোদন হ'লো মাত্র। বোমার আওয়াজে ও উড়ো-জাহাজের ঘড়ঘড়ানিতে চোখে পাতায় করা গেল না। বেলা দু'টো আন্দাজ থেকে সুরু করে' আক্রমণ পর্দায় পর্দায় চড়ে' চললো। আমাদের বনটা থেকে মাইল খানেক দূরে বড় রাস্তা, আর চারিপাশে ছোট বড় বন। জর্মান বোমারুরা সারাদিন ধরে' রাস্তা আর এই বনগুলির ওপর

পেট খোলসা করে' ডিম পাড়তে লাগলো। আর তার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের বনটা থর থর করে' কাঁপতে লাগলো। এইখানে একটি অলৌকিক (দৈবও হ'তে পারে) ঘটনার উল্লেখ করি। জার্মানরা খবর পেয়েছিল, এই অঞ্চলে কোথাও একটা বনের ভেতর একটি পোল বাহিনী এসে আত্মগোপন করেছে। এবং তাদের ধ্বংস করবার জন্যে জার্মানরা কেবলই বনগুলোর ওপর হুদ্দাড় করে' বোমা ফেলছিল। সৈনিকদের কাছে শোনা গেল, সে বাহিনীটি অন্য কোনো বাহিনী নয়, আমাদেরই বনে আত্মগুপ্ত অশ্বারোহী সেনা। ধারে কাছে এত বন যে ঠিক কোনটির ভেতর তারা এসে লুকিয়েছে তা জার্মানরা ভেবে পাচ্ছে না, এবং যেখানে সেখানে এলোপাতাড়িভাবে বোমা ফেলচে। এই বাহিনীটিকে নিয়েই যে এই লুকোচুরির খেলা তা জানতে পারায় আমাদের এই তিনটি অসামরিক প্রাণীর মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অথচ, সৈনিকরা উর্দি পরেছে বলেই যে তাদের মরা উচিৎ এবং আমরা উর্দি পরি নি বলে' যে আমাদের মরা উচিৎ নয়, এধরণের কুসংস্কারকে তখনো আমরা জয় করতে পারি নি। যাই হোক্ তখনকার যে মনের অবস্থা, তাতে বন ছেড়ে পালানোর প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। এবং পালানোটাই অসম্ভব হয়ে উঠলো। ঘটনাটাকে অলৌকিক বলছি এইজন্যে যে, প্রায় অন্য সমস্ত বনে যেখানে সৈন্য ছিল না, সেখানে বোমা ফেলে জার্মানরা শত শত নিতান্ত নিরীহ মহীরুহদের প্রাণ সংহার করে' গেল, অথচ যেখানে সৈন্য ছিল, তারা তার ধারে-কাছেও এলো না।

সন্ধ্যার একটু আগে, অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে আলুমিনিয়ুমের ধাতব জোলুশে চোখ ঝলসে বিরাট জর্মান বিমান-বাহিনী সেই যে সটান উত্তর-মুখো চলে' গেল, সেদিন আর তারা ফিরলো না। সেদিনকার আক্রমণে অন্ততঃ এটুকু বোঝা গেল যে, ভারশৌএর ওপর যে ধরণের হাম্‌লা হ'চ্ছে

তার তুলনায় সহরের বাইরের আক্রমণগুলো নেহাৎ তুচ্ছ নয়। এমন কি অনেকাংশে তা দেশবাসীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত বিপজ্জনক এই কারণে যে, এখানে আত্মরক্ষার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত মোতায়েন রাখা সহজসাধ্য নয়। যাই হোক্, কাল-বিলম্ব না করে' রাতের মত আশ্রয় খোঁজ করবার জন্যে বন ছেড়ে বেরুলাম।

আশেপাশে কোনো আশ্রয় নেই, কাজেই আবার সারাদিন পরে মিন্স্ক্-এ ফিরতে হ'লো। সহরে একটুও আলো নেই, মানুষও বিশেষ নেই, হাতের টর্চ্ জ্বালিয়ে যে বাড়ীটার ওপরই ধরি, সেই বাড়ীটাই, দেখা যায়, ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেছে। সহরের মাঝখানে এসে শোনা গেল, লোকজন সমেত একটি সিনেমা, এবং রোগী-সমেত একটি হাসপাতালের অনেকখানি চূর্ণ হয়েছে। এসংবাদে বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই, যেহেতু আমরাও যদি আজ অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে সশরীরে স্বর্গে যেতাম ত সে খবর শুনে নিশ্চয়ই ও অঞ্চলের কেউ বিচলিত হ'তো না। এখন রাত্রির জন্যে আশ্রয় খোঁজা সর্বাগ্রে কর্তব্য। "আশ্রয় ?! আশ্রয় এখানে পাওয়া যাবে না, পানিয়ে। সবাই ত সহর ছেড়ে চলে' যেতে সুরু করেছে।"—একটি বুড়ো গোছের লোক উত্তর দিলে। তবুও এদিক ওদিক দু'একটা বাড়ীতে চেষ্টা করে' দেখা গেল। তাদের বাড়ীর কেউ না কেউ আজই প্রাণ হারিয়েছে। কাজেই সে আশা ত্যাগ করতে হ'লো। সবাই পরামর্শ দিলে, কালুশিন্ লক্ষ্য করে' চলতে। গার্ভলিন্ বিধ্বস্ত হয়েছে, সুতরাং একমাত্র কালুশিনের পথ দিয়েই জার্মানদের এড়িয়ে পূব দিকে চলা যেতে পারে। ঘোড়ার গাড়ীর খোঁজ করা গেল, কিন্তু সহরে ঘোড়াও নেই গাড়ীও নেই। কাজেই পায়ে হেঁটে কালুশিনের দিকে আমরা যাত্রা করলাম।

সহরের বড় রাস্তা দিয়ে পলাতকের দল চলেছে, আগের দিনের

মতই হাজারে হাজারে। যতদূর মনে হ'লো, এদের বেশীর ভাগই পশ্চিম অঞ্চল থেকে বিতাড়িত পোল পরিবার। কেউ কেউ মালবাহী ঘোড়ার গাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, হাঁস-মুর্গী, বালিশ্-তোষক্ প্রভৃতি গোটা একটা সংসার নিয়ে চলেছে। অধিকাংশই অবশ্য পদব্রজে, পিঠে-মাথায় মাল-পত্র নিয়ে, আমাদের মত। সহর ছেড়ে আবার গ্রামে এসে পড়লাম। গতরাত্রের স্বল্পনিদ্রায় এবং আজকের সারাদিনব্যাপী মৃত্যুর সম্ভাবনাজনিত উত্তেজনায় বারো মাইল পথ অতিক্রম করে' কালুশিনে যাবার মত আমাদের আর শক্তি নেই। তাছাড়া আমাদের সহযাত্রিনীটি বীরাঙ্গনার মত মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করলেও তাঁর কষ্টের লাঘব করা অন্ততঃ পুরুষ মানুষের কর্তব্য মনে করে' পান্ ম—এবং আমি, কী করা যায় ভাবতে লাগলাম। অবশেষে স্থির করা গেল, কাল রাতের মত একটা গাড়ী পাকড়াও করা যেতে পারে।

কিছুক্ষণ পরেই একটি অসামরিক ঘোড়ার গাড়ী চোখে পড়লো। আরোহী মাত্র দু'টি পুরুষ, এবং দু'টি স্ত্রী। দিব্যি আরামে হাওয়া খেতে খেতে চলেছেন। তাঁদের অনুরোধ করা গেল, আমাদের না হয় অন্ততঃ আমাদের সঙ্গিনীটিকে তাঁদের গাড়ীতে তুলে নিতে; আমরা সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাবো, কারণ সামনের ভিড় ঠেলে কোনো গাড়ীর পক্ষেই বেশী এগিয়ে যাবার উপায় নেই। আমাদের প্রস্তাবে তাঁরা রাজী হ'লেন না, এবং এমনভাবে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেন যে, গাড়ীর একটা কাঠ সজোরে এসে লাগলো আমার বাগ্দত্তার পিঠের ওপর। জ্ঞানশূন্য হয়ে চালক-ভদ্রলোকের হাতের ছপ্টি কেড়ে নিয়ে তাঁকে গাড়ীর ভেতরেই খানিকটা ঘোড়-দৌড় করানো গেল। তারপর তাঁর হাতে ছপ্টি ফিরিয়ে দেওয়ামাত্র তাঁরা গাড়ীখানাকে তাড়াতাড়ি মাঠের পথে নামিয়ে সবেগে উধাও হ'লেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের এ আচরণের অর্থ বোঝা গেল না।

পান্ ম—অনুমান করলেন, ব্যাটাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই বস্তা বস্তা টাকা ছিল, তাই আমাদের চোর ডাকাত ভেবে এইভাবে পিট্টান দিলে।

যাই হোক্, দেখা গেল বীরাঙ্গনার অঙ্গের চোটটি নেহাৎ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবার মত নয়। সুতরাং তাঁকে নিয়ে একটু বিশ্রাম করবার জন্যে আমরা পথের ধারে মাঠের ওপর গিয়ে বসলাম। এইখানে বসেই চক্র-যোগে পথ অতিক্রম করবার আর একটি সম্ভাবনা চোখে পড়লো। পান্ ম—পায়ে হাঁটবার বিশেষ পক্ষপাতী নন্। তদুপরি তিনি ইংরেজ বা ফরাসী সেনায় ভর্তী হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে অসিধারণ করবার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠছেন যে, আজ-কালের মধ্যেই সীমান্ত অতিক্রম না করতে পারলে তাঁর মনে শান্তি নেই। একটু দূরেই দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড পোষ্ট-আফিসের লরী দাঁড়িয়ে আছে, এবং তার কাছেই একটা জখম-হওয়া, পোলীয় আর্মার্ড্-কার। আর্মার্ড্-কারখানার সর্বত্র কল-বন্দুকের গুলি-লাগা ছিদ্র। আরোহীরা হয় প্রাণ হারিয়েছে, না হয় পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। যাই হোক্ এই যুদ্ধ-রথখানির পদার্থ কিছুই নেই, স্বধু আছে তার দু'দিকের দুনো চাকা অর্থাৎ চারখানি টায়ার এবং চারখানি টিউব। পক্ষান্তরে, পোষ্ট-আফিসের লরীখানির একটা টায়ার ও টিউব ফেটে গাড়ীখানাকে অচল করে' ফেলেছে। শোনা গেল, লরীখানিতে আসছিলেন পিওনদের পরিবারবর্গ; পথে এই দুর্ঘটনা ঘটায় তাঁরা কাছের একটা গ্রামে অপেক্ষা করছিলেন। পিওনরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে' আর্মার্ড্-কারের অন্ততঃ একখানা চাকার টায়ার ও টিউব খুলে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। তাদের সঙ্গেই দেখলাম, একটি ছোকরা কর্পোরাল, আমিরী চালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা হুকুম দিচ্ছিল। বোঝা গেল, সরকারের দুই বিভাগের দু'খানি যান যখন একত্র যুক্ত হ'তে চলেছে, তখন সুবিধা দেখে হয়তো কোনো অফিসারও এই

পিওনদের পরিবারদের সঙ্গে আপন সংসারকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

যাই হোক্, আমরাও এসে আমাদের আবেদন জানালাম। অধিকার আমাদের নেই বটে, তবে অতবড় লরীখানা, যদি ছাদের ওপরও আমাদের তুলে নেওয়া হয় ত আমরা বিশেষ উপকৃত হবো। প্রথমে তারা কিছুতেই রাজী হয় না, পরে অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর বললে, "আচ্ছা যদি পরে জায়গা কুলোয় ত দেখা যাবে।" আশা হ'লো, দু'একদিনের মধ্যেই মোটারে চড়ে' প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে রুশিয়া বা রোমানিয়ায় পৌঁছন যাবে। আমার বাগ্‌দত্তার শরীর তখন রীতিমত কাহিল। কাজেই তিনি মাঠের ওপর খানার ধারে অচিরে নিদ্রা গেলেন। এবং আমরা দু'জন, পিওনদের এটা, ওটা, সেটা এগিয়ে দিয়ে তাদের মন যোগাবার জন্যে সাধ্যমত সাহায্য করতে লাগলাম। ক্রমে পিওনদের কাছে এমন কি আশ্বাসও পাওয়া গেল যে, বারোটা-একটা পর্য্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে রাজী থাকি ত আমাদের গাড়ীতে তুলে নেওয়া যেতে পারে।

ঘণ্টা দুই তিন এইভাবে তোষামদ করার পর পিওনদের মন যখন বেশ গলে' এলো, তখন পান্ ম—সিগারেট ও আপেল দিয়ে এবং নানারকম কথোপকথনে কর্পোরাল সাহেবের মনস্তুষ্টি করতে প্রবৃত্ত হ'লেন। কাল রাতে কীভাবে একটা সামরিক মালবাহী গাড়ীতে চড়ে' মিন্স্ক্-এ পৌঁছলাম তার মনোগ্রাহী বিবরণ সুরু করলেন এবং আমি নিদ্রালু বীরাঙ্গনাটির তদ্বির করবার জন্যে তাঁর কাছে এসে বসলাম। রাত ক্রমে গভীর হয়ে এলো, ঘড়িতে দেখলাম প্রায় বারোটা। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি পান্ ম—কর্পোরাল সাহেবের সঙ্গে ব্যাঘ্র-পরিক্রমায় ইতস্ততঃ পদচারণা করছেন, এবং হাতমুখ নেড়ে কী একটা নতুন গল্প ফেঁদেছেন।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল —"রেন্‌ৎসে দ গূর‍্যী !"—অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তিকে উর্দ্ধবাহু হ'তে বলা হ'চ্ছে। গলাটা পরিষ্কার কর্পোরাল সাহেবের! তার পরের সব কথা বোঝা গেল না, তবে এটুকু বোঝা গেল যে, কী একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শোনা গেল, কর্পোরাল সাহেব চীৎকার করে' হুকুম করলেন—"ডেকে নিয়ে আয় এর সঙ্গীদের, দেখিস্ পালায় না যেন!" তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছ'টি সৈনিক আমাদের মোটঘাট নিয়ে তাদের অনুগামী হ'তে বললে। আমরা কর্পোরালের সম্মুখীন হওয়া মাত্রই উর্দ্ধবাহু হ'তে আদিষ্ট হ'লাম—"রেন্‌ৎসে দ গূর‍্যী !" আব্‌ছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলাম কর্পোরাল ছ'হাতে ছ'টি ব্যাঘ্র-শিকার-উপযোগী রিভল্‌ভার আমাদের মাথা লক্ষ্য করে' ধরেছেন। ব্যাপারটা কী জিজ্ঞাসা করতে যাওয়াতে তিনি আমায় এক দাব্‌ড়িতে মুখবন্ধ করতে আদেশ দিলেন, এবং জানিয়ে দিলেন, একটু নড়েছি কি তিনি গুলি ছাড়বেন! সুতরাং আমার বাগ্‌দত্তা ও আমি ছ'জনে ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের মত উর্দ্ধবাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে কর্পোরালের আদেশে ছ'জন সৈনিক এসে আমাদের জিনিষপত্র ও পকেটাদি অনুসন্ধান করতে লাগলো। আপত্তি-জনক কিছু যখন পাওয়া গেল না, তখন কর্পোরাল আমাদের সামরিক কায়দায় এ্যাবাউট্ টার্ন্ করতে বললেন। এ্যাবাউট টার্ন্ করবার সময়ে পান্ ম—র অবস্থা চোখে পড়লো। বেচারাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। বোঝা গেল, বহু-বাক্ পান্ ম—কে গুপ্তচর ভ্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অর্থাৎ ভারশৌ ছাড়বার আগে দিদির কনিষ্ঠা আমার সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করেছিলেন, দৈব-বিপাকে পান্ ম—র ভাগ্যে ঠিক তাই ঘটেছে। সেই অন্ধকারেও আমাদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-বিনিময় হ'লো, অথচ কথা বলবার উপায় নেই। যাই হোক্, আমরা

এ্যাবাউট্ টার্ন্ করে' দাঁড়ালাম। সামনে পড়লো কালূশিন্ যাবার পথ। কর্পোরাল শূন্যে গুলি ছুড়ে নাটকি কায়দায় পেছন থেকে আমাদের হুকুম করলেন, যেন আমরা আমাদের জিনিষপত্র তুলে নিয়ে সটান সামনের দিকে চলতে সুরু করি।

পান্ ম—কে বিদায় জানাবার অবকাশ হ'লো না, এমন কি তাঁকে কোনরূপ সাহায্য করবারও উপায় দেখা গেল না। আমরা যন্ত্রচালিতবৎ উট-মুখো হয়ে, আদেশমত সটান সামনে চলতে সুরু করলাম। এবং সত্যি কথা বলতে, ঘণ্টাখানেক এভাবে চলার পরেও আমাদের মনে হ'তে লাগলো, কে যেন বরাবর পিস্তল উঁচিয়ে আমাদের অনুসরণ করছে।

যাই হোক্ অনেকক্ষণ এভাবে পথ চলার পর যখন আমরা মরিয়া হয়ে পেছন দিকে তাকালাম, তখন দেখে আশ্বস্ত হ'লাম, আমরা দু'টি ছাড়া বহুদূর পর্য্যন্ত ধারে-কাছে জনমানব নেই। পান্ ম—কেও যদি ছেড়ে দিয়ে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে চলবার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, এই আশায় আমরা তাঁর অপেক্ষায় রাস্তার ধারে মাঠের ওপর বসলাম। ঠিক এই সময়ে আস্তে আস্তে চাঁদ উঠলো এবং অন্ধকার কেটে গিয়ে ম্লান জ্যোৎস্নায় চারিপাশের বস্তুর ছায়া-রেখাকে স্পষ্টতর করে' তুললে। এইবার চোখে পড়লো, যেখানে আমরা বসে আছি, সেখানে আমরা একলা নই। সমস্ত মাঠ জুড়ে মানুষ ও ঘোড়ার শবদেহ। যাদের শরীর অবিচ্ছিন্ন তাদের দেখলে মনে হয় তারা যেন পথ-ক্লান্তি দূর করার জন্যে মাঠের ওপর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বেশীর ভাগ দেহই বিধ্বস্ত, বিকলিত, বিকৃত। তাছাড়া ঘোড়াগুলো যেভাবে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে' আছে, তাতে তাদের দিকে ভরসা করে' তাকানো যায় না। ঘোর শাক্ত বংশের সন্তান হ'লেও শ্মশান-কালীর এধরণের লীলাভূমির দৃশ্য বেশীক্ষণ

বরদাস্ত করা গেল না। জ্যোৎস্নার আলোয় কালুশিন্ লক্ষ্য করে' আমরা দু'জনে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

সে রাত্রের বিশেষ কোনো ঘটনা মনে নেই। সুধু মনে আছে, আমরা দু'জন কেবল ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিক্রম করে' চলেছি। রাস্তায় লোক বেশী নেই। মাঝে মাঝে মোটার ও ঘোড়ার গাড়ী ধুলো উড়িয়ে পূব দিক লক্ষ্য করে' চলে' যায়। কখনো কখনো দু'একটি চাষার পরিবার আশপাশের গ্রাম থেকে মাল-পত্র মাথায় নিয়ে, স্ত্রী-পুত্র-গরু-ঘোড়া সমেত আমাদের মতই এক অনির্দিষ্ট সীমান্তের দিকে চলেছে। পথ চলবার সময় চোখে পড়ে দু'পাশের মাঠ জুড়ে নরনারীর বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ আর রাস্তার মাঝে মাঝে কয়েক শ গজ অন্তর বড় বড় ডোবার মত গর্ত। জনাকীর্ণ পথে বোমা পড়ায় কত মানুষেরই যে প্রাণনাশ হয়েছে, তা এই গর্তগুলি দেখেই সহজে অনুমান করা যায়। দু'পাশের মাঠে যেসব শবদেহ, তারা যে পালাবার সময়ে কল-বন্দুকের গুলিতে মারা পড়েছে, তাও অনুমান করা আয়াসসাধ্য নয়।

কয়েক ঘণ্টা পরে জ্যোৎস্না ডুবে গেল এবং পূব দিক ফিকে হয়ে আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটে এলো। এইবার আমাদের চেহারা পরস্পরের চোখে পড়লো। সারা রাত পথের ধুলোয় মাথার চুল, ভ্রু, চোখের পাতা সব সাদা হয়ে গেছে। এবং গভীর পর্য্যবেক্ষণেও আমাদের বয়েস ষাট সত্তরের কম বলে' মনে হয় না। ভোর তখন পাঁচটা এবং কালুশিন্ সেখান থেকে তখনও ক্রোশখানেক পথ। হঠাৎ একজন অশ্বারোহী সৈনিক চীৎকারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে—"প্রশেঁ পান্স্ত্ভা, সামলৎ!"—শুনছেন মশাই, উড়োজাহাজ!—খুব দূরে, যেখানে অরুণের আলো ফুটে উঠছিল, সেই দিক থেকে একখানা

উড়োজাহাজ এই দিকে এগিয়ে আসছে। জার্মানরা একেবারে ঘড়ি ধরে' দিনের কাজ সুরু করেছে।

অশ্বারোহী সৈনিকটির নির্দেশ মত বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা একটি সরু মেঠো পথ ধরে', ক্ষেত-খামার ছাড়িয়ে প্রায় শ তিন গজ দূরের একটি চাষার কুটীরে এসে পৌছলাম। চাষা কূয়ো থেকে জল তুলে ঘোড়াটাকে খাওয়াচ্ছে।

খ্রীষ্টের জয় হোক্। *

যুগে যুগে। *

আশ্রয় পাওয়া যাবে ?

নিশ্চয়ই ! ভেতরে গিয়ে বুড়ীরে বলো।—তারপর নিজেই কুটীর লক্ষ্য করে' ডাকতে লাগলো—"এ বুড়িয়া, বুড়িয়া, অতিথ এয়েচে।" মোট-ঘাট নিয়ে আমরা আঙ্গিনার পশু-পক্ষিদের চকিত করে' কুটীরের দ্বারে এসে হাজির হ'লাম।

* গ্রামবাসী পোলদের অভিবাদন।

৯ই সেপ্টেম্বর।

কুটীরের দোর খুলে যে বৃদ্ধাটি আমাদের সামনে দাঁড়ালো তাকে দেখে মনে হয়, এ ব্যক্তির পেশা দিদিমা বা ঠাকুরমা-গিরি করা। বয়েস ষাটের কম নয়, কিন্তু তার মুখে যে ধর্মের প্রসক্তিটুকু প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে তাতে তার মনকে এখনো সজীব করে' রেখেছে। বুড়ীর চোখ-মুখ হাসিতে ভরা। সে হাসিও অপরূপ। তাতে ঠিক যে পরিমাণে মানুষটির ভেতরকার পারত্রিক দূরত্ব প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণে চোখে পড়ে তার জীবনের প্রত্যেকটি খুটিনাটি বোঝবার ক্ষমতা এবং ভারী প্রীতিপ্রদ এবং নেহাৎ ঐহিক একটি রস-বোধ। এক কথায়, দিদিমা ঠাকুরমারা যেমন হয়ে থাকেন, বুড়ীও তাই।

আমাদের দেখেই দু-চোখ হাসিতে ভরে' ভেতরে আহ্বান করে' নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালে। দেখলাম এই অপরিসর কুটীরখানির ভেতর ঘরখানি বুড়ীর নিজের। প্রত্যেকটি জিনিষ ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক করছে। আসবাবের মধ্যে খানচারেক চেয়ার, একটা টেবিল, এবং একটা বড় সিন্দুকের ওপর বুড়ীর বিছানা একখানা হাতে-বোনা, রঙিন সতরঞ্চি দিয়ে ঢাকা। দেওয়াল-ভরা যীশু, মারীয়া এবং নানা সন্ত-বৃন্দের পট। পটগুলির

মাঝখানেরটি চেঁস্তোহোভার মারীয়া-মূর্ত্তি, তলায় বড় বড় অক্ষরে পোলভাষায় লেখা—"টেনে নে মা শরণে তোর।" বুড়ী হয়তো জানেও না, জার্মানরা তার আরাধ্যা এই মাতৃমূর্তিকে ধ্বংস করে' দিয়েছে। যাই হোক্, লক্ষ্য করলাম, বুড়ীর বাড়ীতে জনসমাগম কম হয় নি। জান্‌লা দিয়ে চোখে পড়লো, দু'খানা বড় বড় লরী আঙ্গিনার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ী চোখ টিপে বললে—"তোমরা ব'সো বাপু এই ঘরে। সারা রাত ধরে' লোক এয়েচে গেচে, একটু চোকে পাতায় ক'ত্তে পারি নি। তারপর এই দ্যাকো না দু'কোন দুকোন গাড়ী-ভরা ইস্ত্রী-পুরুষ এ্যাণ্ডা-বাচ্চা! সব ঘরবাড়ী ছেড়ে চলেচে, আহা বেচারীরা, দুক্কুও হয়। কিন্তু আমার নিজের বলে, নাতিপুতিগুনো সব ডাগর হয়ে গেচে, ঘরে বাচ্চাকাচ্চার পাট আর নেই। তাই বাপু, আমি আর হেলাগোচা, দুপোদুপি সইতে পারি নে। তোমরা বাছা, এই ঘরটায় বসো, নইলে ছেলেপুলেগুনো এসে আমার সব্বস্ব তচ্‌নচ্ করে' দেবে।"

মেঝের ওপর মোট-ঘাট রেখে আমরা চেয়ারের ওপর বসে' বসে' ঢুলতে লাগলাম এবং জার্মানরা সুরু করলে তাদের দৈনন্দিন ধ্বংসলীলা। জান্‌লা দিয়ে বড় রাস্তা চোখে পড়ে। দেখি, ঠিক কালকের মতই পথ ভরে' দলে দলে মানুষ, গাড়ী-ঘোড়া চলেছে। জার্মানরা সেই অসহায়, নিরস্ত্র জনতার ওপর কালকের মতই নির্বিবেক, নির্দয়ভাবে বোমা বর্ষণ করে' চলেছে। মৃত্যুর সঙ্গে মন এমন বোঝাপড়া করে' ফেলেছে যে, এসব দৃশ্য তার ওপর স্থায়ী ছায়া ফেলতে পারে না। দর্পণের ছায়ার মত বস্তু অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয়ে যায়; তবে যেটুকু সময় ছায়া দর্পণের ওপর টিকে থাকে, ততক্ষণ দৃশ্যের কদর্য্যতা ও নিষ্ঠুরতা মনকে প্রায় বিকল করে' ফেলে। জান্‌লা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার আমরা ঢুলতে বসি। উপায় নেই, আবার হয়তো

আজ সারা দিন ও সারা রাত ঘুম হবে না। তার ওপর পথ চলতে হবে ক্রোশের পর ক্রোশ।

বোমাগুলো পড়ছে তিন চার শ গজের মধ্যেই রাস্তার ওপর। সুতরাং তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া আমরা ঘরে বসে' অনুভব করছি। সমস্ত বাড়ীখানা যেন মাটি ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে। প্রাকৃতিক নিয়মে তা অসম্ভব হ'লেও বাড়ীর ভেতরে বসে' তাই মনে হয়। কারণ দেখতে পাচ্ছি, বোমার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুট্‌কেস্‌গুলো অবধি ক্ষণে ক্ষণে হঠযোগীর মত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অমান্য করে' শূন্যে বিচরণ করছে। দেওয়ালের খানকয়েক সন্তবৃন্দের ছবি এক লাফে মাটীতে নেমে পড়ে' ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেল।

সমানে ঘড়ি ধরে', ঠিক রোজ যেমন চলে, বারোটা পর্য্যন্ত বোমাবর্ষণ ও কল-বন্দুকের গুলি চালানোর কাজ চললো। এবং আমরাও মরিয়া হয়ে বসে' বসে' ঢুলতে লাগলাম। সুধু মাঝে মাঝে ঘুম জড়ানো চোখে দেখি, বুড়ী এক একবার ঘরে ঢুকে যীশু, মারীয়া প্রভৃতির কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে' যাচ্ছে এবং যাবার সময়ে আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বিড় বিড় করে' আশীর্বচন দিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্র-শক্তি বলে' কোনো শক্তি আছে কিনা জানি না। তবে বুড়ীর প্রার্থনার জোরেই হোক্‌ বা জার্মানদের করুণাতেই হোক্‌, বুড়ীর বাড়ী দু'এক জায়গায় চিড় খেয়েও ঠিক দাঁড়িয়ে রইল, যদিচ রাস্তার এত কাছে হওয়াতেও একটা বোমাও পথ ভুলে তার ছাদে এসে অবতরণ করলে না। চেয়ারে বসে' টেবিলে মাথা রেখে যে অতক্ষণ ঘুমনো যায়, তা জানতাম না। জেগে দেখি বেলা প্রায় পাঁচটা, রোদ পড়ে' আসছে। এইবার স্নানাহারের কথা মনে পড়লো।

স্নানের আগে বীরাঙ্গনার কাছ থেকে অনুরোধ এলো, তাঁর চুলগুলি

কেটে দিতে হবে। ভদ্রমহিলার চুলের প্রশংসা কিছু কিছু শুনেছিলাম। তাছাড়া কালো লম্বা তরঙ্গায়িত চুল যে তাঁর একটা নিজস্ব সম্পদ ছিল, তা সবাই স্বীকার করতো। সুতরাং ভাবী স্বামীরূপে তাঁর প্রস্তাবের আপত্তি করতেই হ'লো। কিন্তু তাঁর যুক্তির কাছে আমার কোনো যুক্তিই খাটলো না। তিনি বললেন—কতদিন এইভাবে পায়ে হেঁটে, ধূলো-কাদা মেখে টহল দিতে হবে তার স্থিরতা নেই। সুতরাং দু'একদিনের মধ্যেই পথের ধুলোয় চুলে জটা বাঁধতে সুরু করবে, এবং অচিরেই তাতে উকুন-কুল বাসা বাঁধবে। তখন মস্তক-মুণ্ডন ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না। ছোট চুল হ'লে তাকে প্রায়ই সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা চলতে পারে, এবং বড় চুল হ'লে তা অসম্ভব। চুল শুকতেই দিন ফুরবে, পথ চলা হবে না।—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর চুলের যে বহর, তাতে তাঁর যুক্তিগুলো অকাট্য বলেই মনে হ'লো। তাছাড়া চুলগুলো যখন তাঁরই তখন এ সম্বন্ধে কোনো আপত্তি তোলা সাজে না। ভেড়ার রোম-ছাঁটা প্রমাণ একজোড়া কাঁচি বুড়ীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নাপিতগিরি করতে বেরুতে হ'লো।

বাড়ীর পাশেই একটা ছোট ছাউনি, তার ভেতর কাঠ-কাটরা, লোহা-লক্কড় জমা করা ছিল। সেইখানেই ভদ্রমহিলা একটা ভাঙ্গা টুলের ওপর বসে' পাউডার-কেসের আয়না সামনে খুলে ধরলেন, এবং এই ব্রাহ্মণ-সন্তান স্বয়ং মাদাম দ্যু বারীর খাস্ প্রামাণিকের মত সুনিপুণভাবে হাত চালিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মেঘ-বরণ চুলের রাশ একেবারে অতি-আধুনিক স্পোর্ট্স্-উওম্যান্-সুলভ বব্-এ পরিণত করলে।

তার পর স্নানাহার শেষ করে' জিরোবার অবসর হ'লো না। কারণ বেশ কিছুক্ষণ জার্মানদের উড়োজাহাজের দেখা পাওয়া গেল না। আমরা মাল-পত্র নিয়ে আবার পথে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হ'লাম। বুড়ীর

বাড়ীর দই, আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ, তোমাতো, শসা, সালাদ্ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ধ্বংস করে' দাম দিতে গিয়ে বিফলমনোরথ হ'লাম, কারণ অতিথি-সৎকারের কোনো প্রতিদান ধর্মভীরু বৃদ্ধা কিছুতেই নিতে রাজী হ'লো না। এবং যাবার সময়েও আমাদের খাবারের থলীটাকে রুটি ও তোমাতো দিয়ে এমন ভাবে পরিপূর্ণ করে' দিলে যে, তাকে বইবার ভার আমায় নিজেই নিতে হ'লো। যাবার সময়ে বুড়ী সজল চোখে আমাদের আন্তরিক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে, এবং যতদূর দেখা গেল, বারে বারে হাত নেড়ে বিদায় জানালে।

তারপর সন্ধ্যার আব্‌ছায়ায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে' আমরা যখন কালূশিনে পৌছলাম, তখন তাকে সহর বলে' মনে হয় না। গত দু'দিন ধরে' সমানে বোমা ফেলে কালূশিন্‌কে প্রায় বিধ্বস্ত করে' ফেলেছে। অথচ সহরের পথেঘাটে এত ভিড় যে চলা মুস্কিল। অনুমানে বোঝা গেল, বেশীর ভাগ লোকই আমাদের মত মুসাফির। সহরের ভেতর দিয়ে চলেছে মাত্র। পথে দু'একটা সওদাও করছে অনেকে। দেখলাম সবাই মোজা আর জুতো কিনতে চায়, এবং সহরে এ দু'টি জিনিষ একেবারেই নেই। যাই হোক্, এখন কালুশিনে পৌছন গেল বটে, তবে পরে কোথায় যাওয়া যাবে তার কোনো স্থিরতা নেই। শুনলাম, সহরের মাঝখানে বড় থানাটা এখনও ঠিক আছে। ব্রিতানী প্রজা হিসেবে পুলিসের পরামর্শ নেওয়া উচিত হবে মনে করে,' সেখানে উপস্থিত হ'লাম। কিন্তু সেখানে কমিশানার থেকে ইন্‌স্পেক্‌টর, জমাদার, কনেষ্টবল কেউই বলতে পারলে না, ইংরেজরা কোন্‌মুখো গেছে। পোল সরকার যে কোথায়, তাও কেউ জানে না। তাছাড়া আর কিছু পুলিসের বলবার সময় নেই। থানায় অসম্ভব ভিড়। তারা পেট্রোল কেনবার জন্যে পুলিসের অনুমতি চাইতে এসেছে। এবং

পুলিস্‌রা রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রোয়াকের ওপর থেকে, বারান্দার ওপর থেকে, জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কেবলই জনতাকে লক্ষ্য করে' বলছে—"প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, বলছি, এক ফোঁটাও পেট্রোল সহরে নেই, তবু আপনারা বিশ্বাস করবেন না ! নেই, নেই, নেই ! পেট্রোল নেই, এক ফোঁটা নেই !"

আমাদের পেট্রোলের বালাই নেই, সুতরাং সহর থেকে তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্যে বড় রাস্তা ধরলাম। অসংখ্য মানুষ পথ দিয়ে চলেছে। তাদের দু'একজনকে গন্তব্যস্থলের কথা জিজ্ঞেস করায় তারা হেসে উত্তর দিলে—"তা কি আমরা জানি, পানিয়ে ! আপাততঃ যেদিকে দু'চোখ যায়।" পথে কালুশিনের রেলের স্টেশন পড়লো। স্টেশন থেকে বেরুবার পথে দেখা গেল একটা মালবাহী ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে কয়েকটি ভদ্রলোক ও মহিলা চলেছেন। গাড়োয়ানকে কিছু পয়সা কবুল করাতে সে আমাদেরও তুলে নিতে রাজী হ'লো ; গন্তব্যস্থল আমরা কেউই জানি না। চাষী গাড়োয়ান্‌ সহর থেকে ফিরতি পথে আমাদের নিয়ে চললো, এই পর্য্যন্ত জানি। তবে এইটুকু ভরসা যে ঠিক সেই দিক লক্ষ্য করেই দলে দলে লোক চলেছে। ঘন্টা দুই এইভাবে চলার পর দেখা গেল, মাঠ ভেঙ্গে একদল লোক পথের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই দেখলাম, বেশ বড় গোছের এক পুলিস বাহিনী। কোন্‌ সহরের জানা গেল না। তারাও দেশ ছেড়ে চলে' যাচ্ছে আমাদের মত। আমাদের থামিয়ে বললে—"হেই পানভিয়ে, উল্টো দিকে ফিরে যান্‌, পানিয়ে, আপনারা যেমুখো যাচ্ছেন, ঠিক সেই দিক দেয়েই ওরা আসছে !" ওরা মানে যে জার্মানরা তাতে সন্দেহ নেই, এবং কথাটা শোনামাত্রই চোখের নিমেষে জনতার গতি অন্যদিকে ফিরলো।

শশব্যস্ত হয়ে আমরা আবার ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে' চললাম। খানিকদূর গিয়ে গাড়োয়ান আর যেতে রাজী হয় না। হাজার

টাকা দিলেও সে যাবে না। তার স্ত্রী-পুত্র জার্মানদের হাতে ফেলে সে যে এতটা এসেছে সেইটাই কি যথেষ্ট নয়? যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নেই। বড় রাস্তা ছেড়ে একদল লোক মাঠ ভেঙ্গে চলেছে, দেখলাম। আমরা তাদেরই সঙ্গ নিলাম এইজন্যে যে, প্রায়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকলে, বুদ্ধিমান লোকে ভিড় ছেড়ে আলাদা হয়ে যায়। মেঠো পথ ধরে' অনেকক্ষণ চলার পর আমরা একটা কুঁড়ের কাছে এসে দেখলাম, ভেতরে মিট্ মিট্ করে' আলো জ্বলছে। জান্‌লা দিয়ে দেখা গেল, ঘরের ভেতর মৃতদেহ শায়িত, এবং তারই মাথার কাছে দু'টো লম্বা লম্বা বাতী জ্বলছে। কুঁড়ের কাছেই গুটি দুই তিন লোক জটলা করছিল। তাদের কাছে শ্রেদ্‌ল্‌ংসে যাবার পথ জিজ্ঞেস করা গেল। তারা স্বধু হাত দিয়ে বাঁদিকে দেখিয়ে দিলে। বোঝা গেল, তারা সবাই শোকার্ত, বেশী কথা বলতে চায় না। তাদের নির্দেশ লক্ষ্য করে' চলতে চলতে আমরা একটা সাঁকো পার হয়ে একটা বড় গোছের গ্রামে এসে ঢুকলাম।

রাত তখন বেশ গভীর হয়ে এসেছে, প্রায় একটা হবে। একটু আগেই চাঁদ উঠেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখা গেল গ্রামের পুরাণো গির্জা আর তার স্বমুখের নদী, পাশেই গাঁয়ের পাঠশালা এবং একটু দূরে স্রোত-চালিত গম-ভাঙ্গা কল—যেন কোনো বিখ্যাত ওলন্দাজ চিত্র-শিল্পীর আঁকা নিখুঁত একখানি ছবি। চাঁদের মায়ায় চিত্রে ও বাস্তবে এই যে প্রতিযোগিতা, এ এক অদ্ভুত দৃশ্য।

আমাদের সহযাত্রীরা সংখ্যায় বেশী নয়, জন দশ বারো স্ত্রী-পুরুষ। কারো সঙ্গে এখনো বিশেষ আলাপ করবার স্বযোগ ঘটে' ওঠে নি। সবাই এক অবস্থায় পড়েছি, এবং সবারই লক্ষ্য সীমান্ত অতিক্রম করা, এ ছাড়া আর তাদের সঙ্গে অন্য কোনো যোগসূত্র নেই। গ্রামের নামটা কি, তাও জানি না, কোন্ পথে এ গ্রাম তাও নিরূপণ করা সেরাত্রে সম্ভব

নয়। তবুও আমরা যে মানুষ, অবস্থার বিপর্য্যয়ে একত্র হয়েছি, এতেই আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে একটু একটু করে' আত্মীয়তা গড়ে' উঠলো। নদীর ধারে বসে' আমরা যে-যার খাবারের থলী, বাক্স বা পুটুলি খুঁলে পরস্পরকে নিজের নিজের খাদ্যাংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করলাম। তার পর সবাই সারি সারি স্যুটকেস্‌, থলী বা বাক্স মাথার দিয়ে, নদীর ধারে ঘাসের ওপর ওভারকোট বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে আছে, স্তিমিত জ্যোৎস্নায় নদী, গম-ভাঙ্গা কল আর পুরাণো গির্জার দৃশ্য অনেকক্ষণ আমাদের জাগিয়ে রাখলে।

১০ই সেপ্টেম্বর।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের গতরাত্রের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের দেখা গেল না। হয়তো তারা ভোর থাকতেই বোমা-বর্ষণের আগেই পা চালিয়ে চলবার জন্যে গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। হয়তো যাওয়ার আগে আমাদের অনেক ডাকাডাকি ঠেলাঠেলিও করেছে, আমাদের ঘুম ভাঙেনি।

গ্রামের নাম কীচ্‌কি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এগ্রামে এখনও বোমা পড়েনি, এবং এর জনসংখ্যা প্রায় হাজার দুই হ'লেও এখানকার একটি মানুষও প্রাণ হারায় নি। এক কথায়, যুদ্ধ জিনিষটা এখনো এদের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হয় নি। বোমার প্রসাদে দিনের বেলা পথ চলা অসম্ভব জেনে আমরা সেইদিনকার মত একটা আশ্রয় খুঁজতে বেরুলাম। এবং সে আশ্রয় দু'পা যেতে না যেতেই পাওয়া গেল। গম-ভাঙা কলের পেছন দিকটায় কলের মালিকের পরিবার বাস করে। তাদেরই সুপ্রশস্ত শস্যাগারে আগে থেকেই দু'একজন বিশ্রাম করছে। সেইখানেই মালিক আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল। এবং আমরাও কালবিলম্ব না করে' মাটির মেঝেয় খড় বিছিয়ে তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ তিন দিন

পরে এই প্রথম সমতল জায়গায় অপেক্ষাকৃত নরম বস্তুর ওপর শোয়া গেল। সুতরাং ঘুম আসতে দেরী হ'লো না। তবে সারা সকাল আর সারা দুপুর ধরে' ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে মাথার ওপর অবিরত বোমারুর ধাতব চীৎকার শুনতে পাচ্ছি, যদিচ বোমা ফাটা বা কল-বন্দুকের গুলির একটি শব্দও কানে এলো না।

বিকেল তিনটে আন্দাজ সময়ে ঘুম ভাঙ্গতেই তাড়াতাড়ি দিদিকে টেলিফোন বা টেলিগ্রাম করে' আমাদের নিরাপত্তার খবর দিতে গিয়ে শুনলাম, ভারশোঁএ এ দু'টি জিনিষই পাঠানো অসম্ভব, কারণ জার্মানী গুপ্তচরবৃন্দ সর্বত্র টেলিফোন্ ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, চিঠি লেখা যাবে কি না। উত্তর এলো, লিখে লাভ নেই, কারণ ওদিকে কোনো ডাকই যাচ্ছে না, যাবে বলে' মনেও হয় না। তাছাড়া অন্য অন্য পুরুষদের সঙ্গে পিওনরাও দেশ ছেড়ে চলে' যাচ্ছে। পোষ্ট আফিস একেবারে অচল!

ক্ষুণ্ণ মনে আমাদের আস্তানায় ফিরে স্নানাহারের ব্যবস্থা করলাম। বাড়ীটার ঠিক পেছনেই সরু আঁকা-বাঁকা নদীটি, পরিষ্কার কাচের মত জল, তলার নুড়িগুলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেইখানেই স্নান সেরে নিলাম। এইবার খাওয়া। মালিক-পত্নী শুধালেন—"কী চাই? হাঁস, পেরু না মুর্গী? বা অন্য কোনো মাংস? বা মাছ?"—বৃদ্ধার লিষ্ট্ ফুরতে চায় না। যেসব আহার্য্যের নাম শোনা গেল, তা রাঁধতে প্রচুর সময় দরকার। সুতরাং বাড়ীর লোকদের জন্যে রাঁধা সাধারণ পক্ষীই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে, স্থির করা গেল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শষ্যাগার আলো করে' হাজির হ'লো দু'টি বৃহদাকার পক্ষী ও দু'গামলা বাষ্পায়মান স্যূপ। তার সঙ্গে এলো একরাশ আনাজ আর রুটি-মাখন। এবং ফলাহারস্বরূপ আপেল ও নেসপাতি যথেচ্ছ পরিমাণে। স্যূপ, মাংস ও ফলে আমাদের

শরীরে নবজীবন সঞ্চার করলে। সব ক'টি পদ পরিপাটিরূপে সমাপ্ত করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। আহার্য্যের যৎসামান্য মূল্য মাথাপিছু এক জ্লতী বা আট আনা চুকিয়ে দিয়ে আমরা রওনা হ'লাম। পোলদেশ ত্যাগ করা পর্য্যন্ত এবং তার বহুদিন পরেও আমাদের পরিব্রাজকের জীবনে এধরণের আহার্য্য আকছার জোটে নি। তাই ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে।

যাই হোক গ্রামে বেরিয়ে কোনোরূপ শকটাদি পাওয়া যায় কি না, খোঁজ করতে হ'লো। গ্রাম ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। যারা যেতে রাজী আছে তারা সামান্য দূর যাবার জন্যে অত্যধিক মজুরী চায়। কাজেই বিরক্ত হয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই স্থির করলাম। গ্রামের একটা মাঠের কাছে এসে দেখলাম দূরে একখানা হাল্কা উড়োজাহাজ খুব নীচু হয়ে আস্তে আস্তে উড়ছে। দেখলেই মনে হয়, তার কল খারাপ হয়ে গেছে, এবং অচিরেই বেচারীকে ভূমি চুম্বন করতে হবে। শুনলাম, ওদিকে বেশ বড়গোছের একটা সহর আছে, নাম লাতভীচে। এমন কি দূর থেকে সহরের গির্জার চূড়াও দেখতে পাওয়া যায়। উড়োজাহাজখানা যেন ঐ সহরের ওপরই নীচু হয়ে আস্তে আস্তে চক্কর দিচ্ছে। তার পর হঠাৎ গাছগুলোর ওপাশে যেন সটান মাঠে নেমে গেল, মনে হ'লো। গ্রামের লোকের সুনিশ্চিত ধারণা হ'লো, জাহাজখানার কল খারাপ হওয়াতে তাকে মাটিতে নামতে হ'লো। সুতরাং গ্রামবাসীরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটলো সেইদিকে। এমন কি গ্রামের পাদ্রীও একহাতে রিভল্বার উঁচিয়ে আর এক হাতে আলখাল্লা তুলে ধরে' সেইমুখো ধাবিত হ'লেন।

কীচ্কি প্রকাণ্ড একটা গণ্ডগ্রাম। তাকে দু'এক মিনিটে ছাড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। আমরা যতই যাই, কীচ্কি আর ফুরোতে চায় না। অনেকক্ষণ চলার পর যখন গ্রাম শেষ হয়ে মাঠ সুরু হয়েছে, সেইখানেই দেখলাম চারটি পুরুষ মোট-ঘাট নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। পথ-

নির্ণয় করার জন্যে তাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'লো। পরিচয়ে জানলাম, একটি ইঞ্জিনিয়ার, একটি অবস্থাপন্ন ব্যবসাদার, একটি ভারশৌএর হাওয়া-বন্দরের কর্ম্মচারী এবং চতুর্থ ব্যক্তি তাঁরই বাড়ীর দারোয়ান। সকলেরই বয়সে ত্রিশ বত্রিশ, সুতরাং এদের সঙ্গলাভ করতে পারলে গল্পগুজবে পথকষ্টের সমূহ লাঘব হবে। প্রস্তাবটি তাঁদের দিক থেকেই এলো। শোনা গেল, তাঁরা একখানি গাড়ী ঠিক করেছেন; আমরা দু'জন তাঁদের সঙ্গে জুটলে ভাড়ার অংশীকরণে সকলেই লাভবান হয়। আমরাও তিল-মাত্র দ্বিধা না করে' তাঁদের সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। তাঁদের গন্তব্য পূব দিকে শ্রেদ্‌ল্‌ংসে লক্ষ্য করে' যতদূর যাওয়া যায়। আমাদেরও তাই। সুতরাং এদের সঙ্গলাভে সব দিক দিয়েই সুবিধা।

গাড়ী করে' আমরা যখন গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের পথ ধরলাম, তখন সামনে বহুদূরে, মিন্‌স্ক্‌-এর পথে গভীর রাতে যেমন অরুণের আলো চোখে পড়েছিল, ঠিক সেইরকম আলো দেখা গেল। আলোটার উৎপত্তি সম্বন্ধে এবার আর সন্দেহ রইল না। চাষী গাড়োয়ান হাতের লাঠি দিয়ে ঐদিকে দেখিয়ে বললে—"হেই পানভিয়ে, লাতভীচে পুড়তেচে।" এইবার বোঝা গেল, সন্ধ্যার কিছু আগে উড়োজাহাজটি অত নীচু হয়ে কী কাজ করছিল। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল, জাহাজখানা বুঝি নামতে বাধ্য হ'লো। কিন্তু আসলে সে খুব নীচে নেমে এসে বাড়ীর ছাদে ছাদে অগ্নি-বর্ষী বোমা ফেলে গিয়েছিল। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত সহরে আগুন লেগে গেল।

এই অগ্নি-বর্ষী বোমার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক্। সারাদিন ধ্বংসকারী বোমা ফেলে সন্ধ্যার কিছু আগে জার্মানরা হাল্‌কা উড়োজাহাজ মার্ফৎ এই বোমাগুলি ছড়িয়ে যায়, সহরে বা গ্রামে। বোমাগুলির চেহারা বেশ মোটা গোছের ফাঁপা মোমবাতীর মত। যখন

পড়ে তখন দূর থেকে মনে হয় একটা সাদা পালক নেমে আসছে। পড়েও প্রায় পালকের মত নিঃশব্দে। পড়েই বোমাটা ফেটে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে অনেকগুলি জ্বলন্ত বাচ্চা-কাচ্চা ঠিক্‌রে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এই বাচ্চাগুলিও অচিরে অন্য বাচ্চার জন্ম দেয়। এমনি করে' আগুনের ফুলকি এত তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, তাকে ঠেকানো শক্ত হয়ে পড়ে। জল দিয়ে সে আগুন নিবোনো যায় না, এবং তার এত উত্তাপ যে, কাঠ-কাটরা বা অন্য কিছু দহনীয় বস্তুতে যদি একটি ফুল্‌কি এসে লাগে ত তৎক্ষণাৎ তাতে আগুন লেগে যায়। এধরণের বোমাকে নিবোতে হ'লে চাই অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও কর্মতৎপরতা। বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তার ওপর বেশ খানিকটা বালি চাপা দেওয়া যায়, ত তার আর ফেটে বংশবৃদ্ধি করবার উপায় থাকে না। ভারশৌএ লোকে বালির বস্তা নিয়ে ছাদে বসে' থাকতো, এবং অনেকক্ষেত্রে অগ্নি-বর্ষী বোমা নেবানোতে তারা কৃতকার্য্য হয়েছিল। কিন্তু গ্রাম বা ছোটখাটো সহরে হয়তো সেরকম সুবন্দোবস্ত ছিল না, গ্রামে ত নয়ই। তা ছাড়া তাড়াতাড়ি যুদ্ধে প্রস্তুত হ'তে বাধ্য হওয়ায় পোলদের এসব খুটিনাটির দিকে মনোযোগ দেবার অবসর হয় নি। এবং সবাই যেমন, পোলরাও তেমনি স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, জার্মানরা এসে তাদের ভিটেমাটি জ্বালিয়ে দেবে।

যাই হোক্‌ লাতভীচে পুড়ছে, এবং আমাদেরও জ্বলন্ত সহরের ভেতর দিয়ে ছাড়া উপায় নেই। কাজেই আমরা সেই-মুখো চলতে লাগলাম। চার পাঁচ মাইল পথ আগুনের আলোয় পরিষ্কার চোখে পড়ে। ক্রমে আমরা সহরের খুব কাছে এসে পড়লাম, এবং গরম হাওয়া আমাদের চোখমুখ ঝলসে দিতে লাগলো। সহরের বড় রাস্তা ধরে' যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, কারণ অন্য সব রাস্তা এত অপরিসর যে সেখান দিয়ে যাবার

সময় জ্বলন্ত বাড়ী ঘরদোর আমাদের ওপর যে হুড়মুড়িয়ে পড়বে না, এমন আশা কম। বড় রাস্তা দিয়ে গেলে সহর পার হ'তে প্রায় হু'মাইল পথ। আগুন দেখে প্রথমে চাষা ও তার ঘোড়া উভয়েই বেঁকে বসলো। সহরে ঢুকবে না। বেচারীদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সেরাত্রে যতদূর সম্ভব পথ অতিক্রম না করলে জার্মানদের সঙ্গে মোলাকাৎ হওয়া অনিবার্য্য। কাজেই গাড়োয়ানকে ভালো কথায় অনেক বুঝিয়ে শেষকালে সহরের ভেতর দিয়ে যেতে রাজী করা গেল। গাড়োয়ান রাজী হয় ত ঘোড়া রাজী হয় না। অবশেষে অনেক করে' তার পিঠ চাপড়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে, তাল তাল চিনি ও চকোলেট খাইয়ে ঘোড়াকেও আস্তে আস্তে রাজী করা গেল।

সহরে ঢুকে আমাদের পক্ষিরাজ গাড়ী ও আরোহীদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চললো। যেতে যেতে হু'পাশের দৃশ্য চোখে পড়লো। সমস্ত সহরটা দাউ দাউ করে' জ্বলছে, যেন প্রকাণ্ড একটা একটানা যতুগৃহ। আগুনের লেলিহান শিখা যেন কোন্ এক উন্মাদ-পারিকল্পিত ড্রাগনের জিভের মত বাড়ী ঘরদোর চেটে চলেছে ক্রমাগত। দেখতে দেখতে লক্ষ লক্ষ আগুনের জিভ সমস্ত সহরটাকে চেটে চেটে নিঃশেষ করে' দিচ্ছে। জীবন্ত পুড়ছে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু—পুড়ছে ঘোড়া, গরু, গৃহস্থের বিশ্বস্ত কুকুর, যাদের গলার দড়ি বা শেকল খুলে দেবার অবকাশ পাওয়া যায় নি। জায়গায় জায়গায় বিশৃঙ্খল জনতা সহরের বাইরে যাবার পথ খুঁজে না পেয়ে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে ছুটোছুটি করছে। চোখে পড়ে গৃহহারা মা একটি শিশুকে বুকে নিয়ে একটির হাত ধরে' উন্মাদিনীর মত ছুটে চলেছে। কিছুদূর যেতে যেতে একটা জ্বলন্ত বাড়ী হুড়মুড়িয়ে পড়ে' তাদের ও আমাদের মাঝে আগুন আর ধোঁয়ার পর্দা টেনে দিলে। ঘোড়াটাও পাগলের মত

আমাদের নিয়ে ছুটে চলেছে ; ভয় হয়, হয়তো বা আতঙ্কে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে সবসুদ্ধ সে পথ ছেড়ে আগুনের ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। গাড়োয়ান চীৎকার করে' আমাদের বারে বারে সাবধান করে' দিচ্ছে—"পানভিয়ে, খুব হুশিয়ার, নজর রাখবেন যেন আপনাদের কাপড়-চোপড়ে আগুন না লাগে, খুব সাবধান! তা হ'লে জলজ্যান্ত পুড়ে মরবো আমরা, খুব হুশিয়ার।"

হু হু করে' জ্বলছে বড় বড় গাছ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশালের মত। চৌমাথার ওপর দীর্ঘ ক্রুশ-কাষ্ঠ ও যীশু-মূর্ত্তির চারিদিকে আগুনের শিখা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন কাকে ক্রুশে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ'চ্ছে। দু'হাজার বছর পরেও বেচারা খ্রীষ্টের আজও নিস্তার নেই। প্রায় দু'হাজার বছর ধরে' প্রচারিত তাঁর অহিংস ধর্ম্মের রূপ দেখে মনে হ'লো, তান্ত্রিকতা ও কাপালিকের দেশ ইউরোপের সবচেয়ে বড় দুভার্গ্য হয়েছিল এই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, যাকে সে কোনদিন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি। যে অহিংসা রক্ত-বিতৃষ্ণ অশোকের মনে শান্তি এনে দিয়েছিল, এবং যে প্রেমধর্ম্ম পতনোন্মুখ য়ুনান ও রোমক সাম্রাজ্যকে আধ্যাত্মিক বিলাসে অনুষিক্ত করেছিল, তা যে উত্থানোন্মুখ যুবক ইউরোপের মনে সত্তা-দ্বৈধের সৃষ্টি করবে, এতে আর আশ্চর্য্য কী? আজ যে এই প্রকাণ্ড ধ্বংসলীলা চলেছে, তার জন্যে ইউরোপীয় চিত্তের অনুপযোগী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে কতখানি দায়ী তা ভেবে দেখা উচিৎ।

দীর্ঘকাল ইউরোপ-প্রবাসে আমার ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণে এইটুকু লক্ষ্য করেছি যে, খ্রীষ্টান ইউরোপী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' আত্ম-প্রবঞ্চনা করে' আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তার পক্ষে একটা প্রলয়ের সৃষ্টি করা নিতান্ত স্বাভাবিক। তার কারণ তার দৈনন্দিন জীবনে যা ধর্ম্মেও তাই, প্রতিপদে অসঙ্গতি। একদিকে

সে কঠোর বস্তুবাদী, পরাক্রান্ত, যৌবনমদমত্ত, স্বপ্নবিলাসী অপর দিকে সে বৈরাগী, আধ্যাত্মিক জরাগ্রস্ত, ধর্মভীরু এবং পাপ-পুণ্য হিসেবের পাকা-পোক্ত খাজাঞ্চী। ইউরোপের অন্ততঃ লোকধর্ম যদি তার প্রাচীন, আর্য্য পাগান-ধর্ম হ'তো এবং সে যদি যাগ ও যজ্ঞে, ডমরু ও তাণ্ডবে অগ্নি, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির অর্চনায় আত্মপ্রকাশ করতে পেত, তাহ'লে হয়তো তাকে সত্তা-দ্বৈধ রোগে ভুগতে হ'তো না, এবং হয়তো সে আজ পাগলের মত খামকা আত্মহারা হয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হ'তো না। লাতভীচের জ্বলন্ত ক্রুশ-কাষ্ঠ দেখে মনে হ'লো, হয়তো বেচারা যীশু আজ দু'হাজার বছর পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিচ্ছেন।

যাই হোক্, দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম, লাতভীচের বিশাল গির্জা চারিপাশের লেলিহান অগ্নিশিখার মাঝখানে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি বাগানের গাছগুলোয় অবধি আগুন লেগেছে, মাটির ঘাস পর্য্যন্ত গুমে গুমে জ্বলছে, অথচ আগুন গির্জাকে স্পর্শ করে নি। এই লাতভীচের বিশাল গির্জার কোনো স্থান-মাহাত্ম্য আছে কিনা জানি না; হয়তো যদি সে আত্মরক্ষা করতে পারে ত আশপাশের চাষারা একদিন এটিকে তীর্থস্থান বলে' গণ্য করবে। দেখলাম, আমাদের গাড়োয়ান ভক্তিভরে বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে লাতভীচের স্থান-মাহাত্ম্যের সূচনা সেই রাত্রেই করে' রাখলে।

আমরা সহরতলীতে এসে পড়লাম। এখানে এখনো আগুন লাগে নি। তবে পাড়াকে পাড়া একেবারে জনমানবশূন্য। আগুনের ভয়ে সবাই সহর ছেড়ে পালিয়েছে। আগুন যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে সন্দেহ রইল না যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এ পাড়াতেও আগুন লাগবে। সহর ছাড়িয়ে আমরা মাঠের পথ ধরলাম। পেছন দিকে আগুন আর

আলোর তেজ আস্তে আস্তে কমে' আসে। পাঁচ সাত মাইল পরে জলন্ত লাতভীচের অরুণের আলো আকাশ থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল। অন্ধকারে মাঝে মাঝে ঘুমন্ত কুটীরের অস্পষ্ট রেখা-মূর্তি চোখে পড়ে, আবার মাঠ আর বন।

খানিক দূর গিয়ে একটা চৌমাথায় গাড়ী থামলো। অন্যদিক দিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী চলেছে, সুতরাং এদিকের লোক চলাচল বন্ধ। একটি অফিসারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ব্রিতানী রাষ্ট্রদূত বা কন্‌সুল্ কোন্ দিকে গেছেন, বলতে পারেন কিনা। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে লুব্‌লিন সহরের দিকে পোল সরকারের সঙ্গে গেছেন। অন্ততঃ অফিসার ভদ্রলোকের তাই ধারণা।

লুব্‌লিন্? কেন, শুনেছিলাম যে তাঁরা খ্রেদ্‌ল্‌ৎসে-র দিকে গেছেন!

খ্রেদ্‌ল্‌ৎসে! পানিয়ে কোহান্‌ী* খ্রেদ্‌ল্‌ৎসে-র দিকে কি এগুবার জো আছে? পূব দিকের খ্রেদ্‌ল্‌ৎসে, ভ্রেশ্চ্, দু'টো সহরকেই জার্মানরা একেবারে ভেঙ্গে-চূরে, পুড়িয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

তাহ'লে, আপনার মনে হয়, আমাদের লুব্‌লিনের দিকেই যাওয়া উচিৎ?

হ্যাঁ, প্রশেঁ পানা, পানিয়ে প্রফেসঝে, আমি হ'লে ত তাই করতাম। বিশেষতঃ এখনও ওদিকে যাবার পথটা অন্ততঃ খোলা আছে।

আমাদের সঙ্গীদের এ সুসংবাদটা দেওয়া গেল। আশা হয়েছিল, পূব দিক দিয়ে বেরিয়ে রুশিয়া হয়ে চলে' যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন

* প্রিয় মহাশয়।

১৫

সে আশা কতকটা ত্যাগ করতে হ'লো। এবার হয়তো সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রোমানিয়ার সীমান্ত লক্ষ্য করে' চলতে হবে। তবুও পূব দিকের আশা একেবারে না ছেড়ে আমরা পূব দিক ঘেঁসে দক্ষিণ দিকে চলতে সুরু করবো, স্থির করলাম। তাতে পথ অনেকটা ঘুর হবে বটে, তবে অবস্থা বুঝে শেষকালে হয় সটান পূব দিকে না হয় দক্ষিণ-পূবে চলা যাবে।

চৌমাথা ছাড়িয়ে খানিক দূর গিয়ে গাড়োয়ানকে গতিপরিবর্তনের কথা বলায় সে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে রাজী হ'লো না। রাত দু'টো আন্দাজ সময়ে অনেক অনুরোধ-উপরোধ ও ধস্তা-ধস্তি করেও এবং টাকার লোভ দেখিয়েও যখন তাকে যেতে রাজী করা গেল না, তখন অগত্যা গাড়ী থেকে নেমে, গাড়োয়ানের প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা পয়দল চলা সুরু করলাম।

আপাততঃ লক্ষ্য হ'লো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে লুকুফ্ সহর।

পথে একটা প্রকাণ্ড বন পড়লো, সেই বনের ধার দিয়ে আমরা ছ'জনে মোট-ঘাট পিঠে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলাম।

এখন থেকে সুরু হ'লো আমাদের সত্যিকার যাযাবরের জীবন।

১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই যে মাসাধিক কাল আমরা ছ'জনে প্রায় সাড়ে তিন শ চার শ মাইল পদব্রজে, লক্ষ্যহীনভাবে, পাগলের মত জার্মানদের বোমা-বুমী এবং গোলা-গুলি এড়িয়ে মাঠে-বাটে টহল দিয়ে বেড়ালাম, তার প্রতিদিনের সম্যক্ বিবৃতি দিতে গেলে উপস্থিত গ্রন্থের বিষয়-বস্তুকে অতিক্রম করে' যাওয়া হবে। এবং বইখানা যুদ্ধের ইতিবৃত্ত না হয়ে, হয়ে দাঁড়াবে এক বিরাট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কাজেই ভ্রাম্যমান জীবনের খুটিনাটিতে পুঁথির কলেবরবৃদ্ধি না করে' প্রতিপাদ্য কাহিনীকে যুদ্ধ-বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখলাম। তাছাড়া এখন থেকে ক্রমাগত পথ চলে' আমরা পঞ্জিকার দিন-পারম্পর্য্য একেবারে হারিয়ে ফেললাম। কোথায়, কতদূরে, কবে গিয়ে পৌছলাম, তার সঠিক হিসেব রাখাও যুদ্ধের সময় গুপ্তচররূপে ধৃত হবার ভয়ে নিতান্ত বিপজ্জনক ছিল। সুতরাং মোটা-মুটি যেসব ঘটনা স্পষ্টরূপে এখনো স্মরণ আছে, সেগুলোই এখানে লিপিবদ্ধ করছি। ঘটনাগুলি বাস্তবে যেভাবে একটার পর একটা ঘটেছিল, বইয়েও যে তারা ঠিক সেইভাবে পূর্বাপর বিবেচনা করে' ঘটবে, সে বিষয়ে কোনো মুচল্‌কা দিতে লেখক রাজী নন্।

লূকুভের পথে।

রাত দু'টো থেকে সুরু করে' আমরা সারাক্ষণ বনের ভেতর দিয়ে কখনো বা ধার দিয়ে একটা সুপরিসর মাটির পথ ধরে' চলেছি। কিন্তু সকাল ছ'টার সময়েও সে বনের শেষ হ'লো না। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে, বড় বড় ভুর্জ, পাইন, ওক্ প্রভৃতির উত্তুঙ্গ বিস্তার গিরি-শ্রেণীর ভ্রম উৎপাদন করে। যেখান দিয়ে চলেছি, সেখান থেকে নিকটবর্তী রেলের স্টেশন অন্ততঃ সাত আট মাইল, জনপদ বলে' কোনো কিছুই ধারে-কাছে কোথাও চোখে পড়ে না। তবুও ভোর থেকেই শুনতে পাচ্ছি, মাথার ওপর দিয়ে বড় বড় বোমারু গর্জনে বনভূমি কাঁপিয়ে হু হু করে' উড়ে চলেছে। খানিকদূর গিয়ে একটা আগাছার বনের ভেতর বসে' ক্লান্তিদূর ও প্রাতরাশ এক সঙ্গেই সেরে নেওয়া গেল।

সামনে গাছের ফাঁকে একটু খোলা আকাশ চোখে পড়ে। সেইটুকু আকাশেই ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ধব্‌ধবে আলমিনিয়ুমের তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোমারু উড়ে চলেছে, দেখতে পাচ্ছি। হাওয়া-বন্দরে যে ভদ্রলোক কাজ করতেন তাঁর নামও পান্ ম—। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত রকমের উড়োজাহাজ জন্মলাভ করেছে তাদের কুলজী তাঁর একেবারে নখদর্পণে। তাঁর কাছেই শোনা গেল, আজ পর্য্যন্ত পোলদেশের ওপর জার্মানরা যে বোমারু বিমান ব্যবহার করেছে, তা চেক্‌দের কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া স্কডা-মার্কা উৎকৃষ্ট বোমারু। পান্ ম—আরও বললেন, টেক্‌নিকের পরাকাষ্ঠায় এ জাহাজগুলির চেয়ে ভালো লড়াকু বিমানপোত তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এবং সেই জন্যেই চেক্-দেশ অধিকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এজাতীয় বিমানের গঠন-কার্য্য বিষয়ক যাবতীয় নক্সা-সমেত স্কডা-কারখানার কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার সঠান লন্দনে গিয়ে হাজির হন্, যাতে জার্মানরা এই নক্সাগুলি হাতাতে না পারে। যাই হোক্, স্লাভ চেক্‌দের শিল-নোড়া

দিয়ে স্লাভ পোলদের দাঁত ভাঙ্গানোতে যে কৃতিত্ব হিট্‌লার সাহেব দেখালেন, তার তারিফ্ না করে' থাকা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, পান্ ম—র অনুমান যদি সত্যি হয়, ত পোল-জর্মান যুদ্ধে জার্মানরা চেক্ বোমারু ছাড়া অন্য কোনো বোমারু ব্যবহার করে নি। করাণ যুদ্ধের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই একই ধরণের আলুমিনিয়ুমের তৈরী সাদা ঝক্‌ঝকে উড়োজাহাজ পোলদেশের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, লক্ষ্য করেছি।

বনটা লোকালয় থেকে বেশ একটু দূর হ'লেও তা আজ জন-বিরল নয়। সব জায়গায় যেমন, এখানেও তেমনি দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ মালপত্র পিঠে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছে। কারো কারো কাছে শোনা গেল, এখান থেকে জার্মানরা খুব দূরে নেই, সুতরাং বসে' দাঁড়িয়ে পথ চলা বিপজ্জনক। আমরা ভেবেছিলাম, দিনের বেলা বোমারুর তাড়নায় বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যখন অসম্ভব, তখন মিছে সে চেষ্টা না করে' দিনের বেলা কোনো চাষার গোলাঘরে ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে, এবং সারা রাত ধরে' পথ চলা যেতে পারে। কিন্তু তা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, শোনা গেল। কারণ আমরা চলেছি পায়ে হেঁটে এবং জার্মানরা আসছে মোটারে চড়ে'। সুতরাং দিনরাত্রি না চললে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করবার আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তাছাড়া এপথে বরাবরই প্রায় বন-জঙ্গল পাওয়া যাবে, প্রায় মাইল পঞ্চাশেক ধরে'। কাজেই বিশ্রামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আবার পথ ধরা গেল।

খানিক পরে একটা গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে প্রথম উপলব্ধি করলাম, পথে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া দুরূহ হবে। আমরা ক'জনে বাড়ী বাড়ী খুঁজেও একটুক্‌রো রুটি বা অন্য কোনো আহার্য্য যোগাড় করতে পারলাম না। সুধু একটি চাষার বাড়ীতে খানিকটা দই আর একটু মাখন পাওয়া গেল। গ্রামের কোথাও মাংস, রুটি, ফল-পাকড় কিছুই নেই।

শুনলাম, গত ক'দিন ধরে' এ অঞ্চল দিয়ে দিনরাত এত লোক গেছে যে, তাদের আহার যোগাতে গ্রামকে গ্রাম ফতুর হয়ে গেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে একটা মাঠ, তার পর আবার বনের পথ। মাঠটা প্রস্থে তিন চার শ গজের বেশী হবে না, তবে সেখানে শসা, লাউ বা অন্য কোনো সব্জী ছাড়া একটিও বড় বা মাঝারি গাছ কিংবা ঝোপ-ঝাড়ও নেই। আকাশ ছেয়ে ঘন ঘন এত উড়োজাহাজ যাতায়াত করছে যে, এই তিন চার শ গজের মাঠটি পার হ'তেও আমাদের সাহসে কুলালো না। গ্রামের প্রান্তে গোটা কয়েক ছোট ছোট আপেল বা নেসপাতি গাছের সঙ্গে লিপ্ত অবস্থায় আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম।

অবশেষে উড়োজাহাজের গতায়াতে একটু যখন ভাঁটা পড়ে' এলো, তখন আমরা মাঠের ভেতর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে সুরু করলাম। কিন্তু মাঝপথে এক ঝাঁক বোমারু বিমানের প্রসাদে মাঠ পার হাওয়া হয়ে উঠলো না। নিরুপায় হয়ে আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে' সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে' সুটকেসে এবং গায়ে মাথায় ছাই রঙের ওভারকোটটা ঢেকে দিলাম। তাতে ওপর থেকে আমাদের কদু বা অন্য কোনো সব্জীর মত দেখাতে লাগলো কি না জানি না, তবে জার্মানরা আমাদের এক রকম লক্ষ্য না করেই চলে' গেল। মাঠের ওপারে আবার বন সুরু হ'লো। এবার অনেকখানি পথ নির্বিবাদে চলা গেল বটে, কিন্তু লোকালয় ছেড়ে আমরা যতই বনের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলাম ততই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এবং সঙ্গে যা সামান্য আহার্য্য ছিল তা ক্রমে কর্পূরের মত উবে যেতে লাগলো।

বিকেলের দিকে আবার আমরা লোকালয়ের ভেতরে এসে পড়লাম। গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে' চললাম, কিন্তু একটুকরো রুটিও সেদিন আমাদের ভাগ্যে জুটলো না। সুধু আহার্য্য নয়, তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত নেই।

সবার কাছে সেই একই কথা শুনি, এ অঞ্চল দিয়ে গত ক'দিন ধরে' যে লক্ষ লক্ষ পথিক চলেছে তারাই পঙ্গপালের মত সব খাবার খতম করে' দিয়ে যাচ্ছে। এমন কি কূয়ার জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। এক জায়গায় দেখা গেল, সামান্য জল আছে। কিন্তু বাল্‌তি ভরে' ওপরে তুলে দেখা গেল তা অপেক্ষাকৃত তরল পলিমাটি মাত্র। নিরুপায় হয়ে তাই আমরা আঁজলা ভরে আকণ্ঠ পান করলাম।

আবার চললাম ক্রোশের পর ক্রোশ, গ্রাম, প্রান্তর বন-জঙ্গল পার হয়ে। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা বসতি পাওয়া গেল। সারাদিনের পর এখানে প্রথম সুধু পানীয় জল নয় স্নান করবার জল পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। সুতরাং স্নান করে' দু'এক টুক্‌রো শুক্‌নো রুটি যা সুট্‌কেস্ বা থলীর ভেতর ক'দিন ধরে' গড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, এবং যা আলস্যবশতঃ এতদিন ফেলে দেওয়া হয় নি, তাই জলে ভিজিয়ে গলাধঃকরণ করে' মনে হ'লো, যেন এইমাত্র চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সমেত প্রকাণ্ড এক ভোজ শেষ করা গেল।

এখানে একটি ইহুদী ছোক্‌রার কাছে এক অদ্ভুত কাহিনী শোনা গেল। এর দু'দিন আগে নাকি লূকুভে পোল সরকারের সঙ্গে ইংরেজ রাষ্ট্রদূত এবং সমগ্র ইংরেজ উপনিবেশ গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। জার্মানরা এ খবর পেয়ে লূকুভের ওপর বেপরোয়াভাবে বোমা বর্ষাতে সুরু করে। রাষ্ট্রদূত স্যর হাউয়াড্ কেনার্ডের স্ত্রী এবং তাঁর শিশু একটা বাড়ীর তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেই নাকি তাঁরা বাড়ী চাপা পড়ে' নিহত হয়েছেন। আশা করি এ সংবাদ সত্য নয়, যদিও এর বহুদিন পরে, ঐদিক দিয়ে ফেরবার সময়ে একটি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ঠিক ঐ খবরই শুনতে পেয়েছিলাম। যাই হোক্, ইহুদী ছেলেটির কাছে অন্ততঃ এইটুকু জানা গেল যে, ইংরেজেরা এই পথ দিয়েই লূকুফ্ হয়ে অন্য

কোথাও গিয়েছেন। কোথায় এবং কোন্ দিকে, সে খবর হয়তো লূকুভে গিয়ে পাওয়া যাবে।

এইবার বনের ভেতর দিয়ে বড় রাস্তা। সেই পথ দিয়ে লূকুফ্ লক্ষ্য করে' চলতে লাগলাম। দেখলাম, এ অঞ্চলে ধ্বংস বিশেষ কম হয় নি। পথের মাঝখানে প্রায়ই দেখি বড় বড় ডোবার মত গর্ত। সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে হয়। তখন কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রি, পথের ধারে বা বনের ভেতর সারি সারি মৃতদেহ মাটির সঙ্গে লয় হচ্ছে কিনা, তা লক্ষ্য করবার উপায় নেই। এদিককার এইপথটা তখন একেবারে জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। কাজেই দলে ছ'জন হওয়া সত্বেও অন্ধকার রাত্রিতে বনভূমির ভেতর দিয়ে যাবার সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বিকলাঙ্গ শবদেহের কথা মনে হওয়ায় দস্তরমত গা ছম্‌ছম্ করে' ওঠে। এই গা ছম্‌ছমানিটা ঠিক ভয়ে নয়। জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা যখন এই অন্ধকার, বিজন বনের ভেতর কঙ্কালের মত আত্মপ্রকাশ করে, তখন জীবজগতের অংশরূপে নিজের জীবনের লক্ষ্যহীনতা এমন নির্দয়ভাবে চোখে পড়ে যে, মানুষ এক কঠোর বৈরাগ্যের হিমস্পর্শে ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে।

রাত দশটা আন্দাজ সময়ে আবার লোকালয় মিললো, এটি একটি গণ্ডগ্রাম, নাম মনে নেই। পথের ধারের বাড়ীগুলো প্রায় সবই বিধ্বস্ত হয়েছে, সেই অন্ধকার রাত্রেও তা নজরে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক জায়গায় আশ্রয় মিললো এবং সারাদিনের পর খানিকটা পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া গেল। সেইদিনকার কাটানো টাটকা ছানা, যে যত খেতে পারে। রাত কাটানোর ব্যবস্থা হ'লো আরো জন দশেক স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে গোলাঘরের সুপ্রশস্ত মাচার ওপর শুক্‌নো ঘাস বিছিয়ে। এক নাগাড়ে এতখানি পথ চলার পর—অর্থাৎ হিসেব করে' দেখা গেল আমরা সেদিন প্রায় তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছি—ঘুমে আমাদের

সর্বশরীর অবশ হয়ে গেছে। কোথা দিয়ে রাত কাটলো জানি না। ভোরে বোমারুদের গজরানিতে ঘুম ভাঙ্গলো। এবং আবার আমরা পথে বেরুলাম।

লুকুভে পৌছতে হ'লে বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়, আমাদের আশ্রয়দাতা চাষাটি বারে বারে জানিয়ে দিলে। কারণ বড় রাস্তায় ক'দিন ধরে' অসংখ্য মানুষ মারা গেছে। তবুও মানুষের পাল হন্যে হয়ে সেইপথ দিয়েই যাবে। চাষাটি নাকি চীৎকারে গলা ফাটিয়ে প্রত্যহ প্রবহমান জনতাকে সাবধান করে' দেয়, কিন্তু লোকে সে কথায় কান দেয় না, পাগলের মত স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে' মোট-ঘাট পিঠে নিয়ে কেবলই এগিয়ে যায়। যাই হোক্, চাষার সতর্কতা-বাণী অগ্রাহ্য না করে' আমরা আবার বনের পথ ধরলাম, যাতে সাত আট মাইলের পরিবর্তে আমাদের প্রায় পনেরো মাইল হাঁটতে হ'লো।

বনে ঢোকবার আগেই একদল পোল সৈনিক আমাদের পাস্‌পর্ত্ পরীক্ষা করে' চুপি চুপি জানিয়ে দিলে, যেন আমরা খুব সাবধানে পথ চলি। কারণ বনের সর্বত্র শত্রুদের সশরীরে স্বর্গে পাঠাবার জন্যে মাইন্ বসানো হয়েছে। সুতরাং যেখানেই সামান্য একটু মাটি খোঁড়া বা অস্বাভাবিক ঘাসের চাপড়া চোখে পড়বে, সেই স্থানগুলি যেন বিষবৎ পরিত্যাগ করি। ফল সহজেই অনুমেয়। জায়গাটি দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক নিমেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। গতরাত্রে বন দিয়ে আসবার সময়ে এই মাইন্‌গুলির একটিও যে আমাদের চরণচুম্বন করে নি, তা মহা ভাগ্যের কথা বলতে হবে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করে' আমরা একটা রেলের লাইনের কাছে এসে পড়লাম। সেখান থেকে লূকুফ্ সহর বেশ স্পষ্ট নজরে আসে। আমাদের দলে মেয়ে বলতে সুধু একটি।

কিন্তু তিনি সমানে পুরুষদের সঙ্গে পা চালিয়ে এসেছেন, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের ছাড়িয়েও আগে চলে' গেছেন। আজ পথে একটা ছোট খাটো দুর্ঘটনা ঘটলো, যেজন্যে বেচারী বেশ রীতিমত ঘায়েল হয়ে পড়লেন। একটা মাঠের মাঝখানে কাঁটা-ওয়ালা তার দিয়ে প্রচ্ছন্ন বারিকাদ্ বানানো ছিল। ভদ্রমহিলা তা না লক্ষ্য করে' তারে জড়িয়ে উচট খেয়ে পড়লেন, এবং কাঁটায় তাঁর একটা পায়ের গোছের কাছে অনেকখানি কেটে গিয়ে খুব খানিকটা রক্তপাত হ'লো। সঙ্গে যে ছোট দাওয়াইখানা ছিল, তার সাহায্যে রক্তপাত বন্ধ হ'লো বটে, কিন্তু ঐ অবস্থার পথ চলা তাঁর পক্ষে বেশ আয়াসসাধ্য হয়ে উঠলো। যাই হোক্, এই ক্ষত নিয়ে পরে তিনি অনেক দিন ভুগলেও আপাততঃ আমাদের সঙ্গে সমানে পা চালিয়ে চললেন।

রেলের লাইনের ওপর নজরে পড়লো একখানি উল্‌টে-পড়া ট্রেনের খানিকটা এবং তার কাছেই একখানা এঞ্জিন আর কয়েকটা গাড়ী। এঞ্জিনখানা দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, যাতে বোঝা যায়, এখনো তার দূরে অগ্রসর হবার বাসনা আছে। ঠিক এই সময়ে রেলের লাইন লক্ষ্য করে' ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু হু হু করে' এগিয়ে এলো। আমরা তখন একেবারে লাইনের ওপর এসে পড়েছি। লাইনের ওপর বোমা পড়া যে অবশ্যম্ভাবী এবং সে বোমার প্রতিক্রিয়াও যে কী ধরণের হয়ে থাকে, তার পরিচায়কস্বরূপ একটু দূরেই চোখে পড়লো এক জোড়া লাইন দুমড়ে বেঁকে সটান শূন্যে উঠে গেছে প্রায় তিন তলার সমান।

কাজেই লাইন পার হয়ে যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে পড়বার জন্যে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়বার প্রয়োজন হলো। আমাদের সঙ্গীরা প্রাণভয়ে ছুটে গিয়ে প্রায় তিন চারশ গজ অন্তরে কোপির ক্ষেতে সটান শুয়ে পড়লেন। বোমারুদের গজরানির তলায় আমার আহত বাগ্‌দত্তার হাত ধরে',

তাঁকে নিয়ে আস্তে আস্তে লাইন পার হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়তো জীবনে ভুলবো না। যাই হোক্, ওপাশের মাঠে পড়েই আমরাও কোপির ক্ষেতে শুয়ে পড়লাম। এবং একটু একটু করে' বুকে হেঁটে একটা কাঠের দেওয়ালের আড়ালে গা ঢেকে বসলাম।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, রেলের লাইন লক্ষ্য করে' অজস্র বোমা পড়ছে, যদিও তার একটাও ট্রেনখানাকে স্পর্শ করতে পারছে না। যতদূর মনে হ'লো, ট্রেনখানি শূন্য। কিন্তু তাতে লোক থাকলে যে তারা কাছে পড়া বোমার প্রতিক্রিয়ায় প্রাণ হারাতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রেলের ধ্বংসীকরণের দৃশ্যে অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে, মিন্স্কের পথে অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানশূন্য হয়ে যে ট্রেনে উঠে বসি নি তাতে নেহাৎ বুদ্ধিমানের কাজ করা হয়েছে। হঠাৎ কাঠের দেওয়ালের একটা ছিদ্র দিয়ে তার ওধারের জমিটা চোখে পড়লো। দেওয়ালের ওপাশে যে ইহুদীদের কবরস্থান তা এপাশ থেকে বোঝবার উপায় নেই। ছিদ্র দিয়ে দেখতে পেলাম, সারি সারি মৃতদেহ মাটির ওপর শোয়ানো। বোমারুদের দয়ায় তাদের কবর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। এবং দিনের পর দিন ঐ ভাবে পড়ে' থেকে তারা বীভৎস মূর্তি ধারণ করেছে।

আক্রমণ থামার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সহরের ভেতরে না গিয়ে মাঠের পথ ধরে' পূব দিকে চলতে সুরু করলাম। সহরে যাবার সমূহ বিপদ ছিল। শোনা গেল, লূকুভের ওপর ক'দিন ধরে' অবিরত বোমাবর্ষণ হ'চ্ছে। অনেকেই পরামর্শ দিলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূব দিকে চলা উচিৎ, যাতে বুগ্ নদী পার হয়ে রুশিয়ায় পৌছন যেতে পারে। লূকুভে ব্রিতানীদের গতিবিধির কোনো খবরই পাওয়া গেল না। সুতরাং মিথ্যে তাদের অনুসরণ না করে' তাড়াতাড়ি দেশ ছাড়াই শ্রেয় মনে হ'লো।

বড় রাস্তা পার হয়ে লূকুভের বালিগঞ্জ। বড় বড় ইমারৎ ও সুশোভন বাংলো-বাটিকা হানা বাড়ীর মত খাঁ খাঁ করছে। সমস্ত পাড়াটা এখনো আস্ত থাকলেও সেখানে একটিও মানুষ চোখে পড়লো না। সুতরাং পানাহারের আশা ত্যাগ করে' আমরা এগিয়ে চললাম। একটু দুরে গিয়ে গ্রামের মাঠ আরম্ভ হয়েছে। সেখানে অজস্র তোমাতো এবং গাজোর দেখা গেল। ক্ষুধায় অন্ধ হয়ে আমরা পাগলের মত গাজোর উপড়ে উপড়ে সেগুলো প্রায় মাটি সুদ্ধ কচমচিয়ে চিবিয়ে গলাধঃকরণ করতে লাগলাম। তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে পাকা পাকা তোমাতো হাতের কাছেই পাওয়া গেল।

লূকুফ্ ছাড়বার পথে পড়লো প্রকাণ্ড কবরস্থান, এইখানে আবার আক্রমণ সুরু হ'লো। মাথার ওপর দেখি সেই পূর্বপরিচিত ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা রঙের বোমারু বিমান, এবং সহরের ওপর বোমাবর্ষণের শব্দ এই সহরতলীটাকেও থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দেয়। পথে আসতে আসতে অন্য দু'একজায়গায় শোনা গিয়েছিল, জার্মানী বৈমানিকদের কবরস্থানের ওপর বিশেষ লোভ ও অনেক জায়গাতেই জার্মানদের বোমা চিরনিদ্রিতদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাদের কঙ্কাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সুতরাং কবরস্থানের ধারে-কাছে থাকায় বিপদ সমূহ। অথচ অন্য কোথাও যাবারও উপায় নেই, চারিদিকে সুধু খোলা মাঠ। কাজেই কবরস্থানের ধারে ছোট ছোট গাছের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। হাওয়া-বন্দরের পান্ ম—পথের ধারে একটা স্বাভাবিক সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করলেন, এবং তার মধ্যেই সটান প্রবেশ করলেন।

খানিকক্ষণ পরে আক্রমণ থেমে গেল, এবং আমরা পথ খাটো করবার জন্যে গোরস্থানের ভেতর দিয়ে সহরের বাইরে যাবার পথ ধরলাম। গোরস্থানে বোমা পড়ে নি বটে, তবে দেখলাম অনেকগুলো কফিন্-ভরা মৃতদেহ, যাদের সৎকার করা বিমান আক্রমণের প্রসাদে এখনো হয়ে ওঠে

নি। কবরস্থান ছাড়িয়ে আবার খোলা মাঠ প্রায় ক্রোশখানেক জুড়ে। বেপরোয়া হয়ে এই মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। মাঠ পার হ'তে যতটা সময় লাগলো তার চেয়ে বেশী সময় বোমারুদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে মাঠে শুয়েই কাটাতে হ'লো। সঙ্গে দিদির অনুরোধে নেওয়া ছাই রঙের ওভারকোট দু'টো না থাকলে আমাদের যে কী অবস্থা হ'তো তা এবার প্রতিপদে উপলব্ধি করলাম। কারণ আমাদের সঙ্গীদের সকলেরই ঐ ধরণের গ্রীষ্মকালের ওভারকোট ছিল। এবং লক্ষ্য করলাম, ওভার-কোটে সর্বাঙ্গ ঢেকে মাটির ওপর শুয়ে পড়লে দূর থেকে হঠাৎ মানুষ বলে' চেনা যায় না। দিদির স্নেহ-প্রণোদিত পরামর্শ যে আমাদের পক্ষে রক্ষা-কবচ হয়ে দাঁড়াবে, তা ভারশৌ ছাড়বার সময় কে জানতো?

মাঠ ছেড়ে আবার বহুদূর বিস্তৃত বনভূমি। ব্রিতানীদের তথা পোলসরকারের সঙ্গলাভের আশা ছেড়ে এবার আমরা ক্রমাগত পূব দিকে চলতে লাগলাম।

পূবে ও দক্ষিণে !

লুবুক্‌ ছেড়ে আমাদের আপাততঃ লক্ষ্য হ'লো বুগ্‌-নদীর তীরে ভ্লদাভা সহর। বুগ্‌ পার হ'লেই একেবারে পোলদেশের পূর্বাঞ্চলে গিয়ে পড়া যাবে। তারপর গড়িমাসি করে আস্তে আস্তে সুবিধা বুঝে রুশিয়ায় ঢুকে পড়লে আর আমাদের পায় কে ? সেখান থেকে রুশী-উক্রাইনার রাজধানী কিয়ভে পৌছন যাবে, তার পর হয় সটান মস্কৌ, না হয় দক্ষিণে অদেসা হয়ে জাহাজে করে' ইস্তাম্বুলে এসে পৌছন যেতে পারে। এই রকম আমাদের মৎলব ছিল। এবং মানচিত্রের ওপর দাগ কেটে আমাদের গতিপথও একরকম ঠিক করা ছিল। এখন সুধু বুগ্‌ পর্য্যন্ত পৌছন !

পথে গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, আমরা তাড়াতাড়ি দূরত্ব অতিক্রম করে' ভ্লদাভায় পৌছাবার জন্যে একটা চাষাদের মালবাহী ঘোড়ার গাড়ীর খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু চারিদিকে যুদ্ধ চলেছে বলে' চাষারা কেউ তাদের গ্রাম ছেড়ে এমন কি পাশের গাঁয়েও যেতে রাজী হয় না। সুতরাং মোট-ঘাট পিঠে নিয়ে আমরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পায়ে হেঁটে সুধু এগিয়ে চললাম। এ যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ

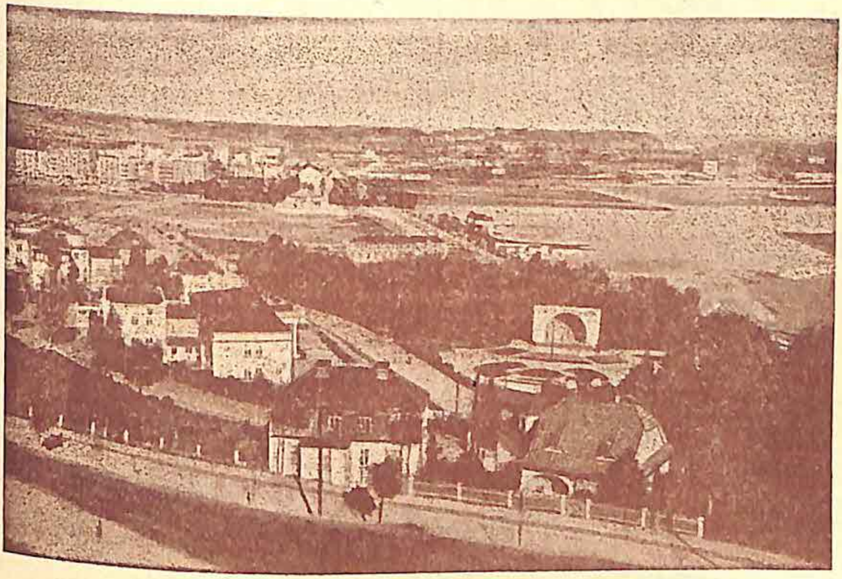
দেওয়া অত্র গ্রন্থে সম্ভব নয়। কাজেই পথে যেতে যেতে, যেসব স্মরণীয় ঘটনা বা দৃশ্য চোখে পড়লো তারই মোটামুটি পরিচয় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দিনের পর দিন চলাতে পথের দূরত্ব যতই কমে' আসতে লাগলো, আমাদের সহিষ্ণুতাও ততই হ্রাস পেতে লাগলো। এবং আমরা মরিয়া হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা পথ চলা স্থির করলাম। কিন্তু মুস্কিল হ'লো একটি জিনিষে। চলতে হ'লে কলেরও যেমন মানুষেরও তেমনি ইন্ধন দরকার। এবং যে পোলদেশে আহার্য্যের অপ্রতুলতা কল্পনা করা যেত না, সেই পোলদেশেই চাষাদের কাছে একটুকরো রুটি অবধি মেলা দুরূহ হয়ে উঠলো। সেই একই কথা শুনি, এ পথ দিয়ে যে লাখে লাখে মানুষ চলে' গেছে গত ক'দিনে, তারা পঙ্গপালের মত সব আহার্য্যই একেবারে শেষ করে' দিয়েছে। চাষা নিতান্ত দুঃখের সহিত তার প্রকাণ্ড ফলের বাগানের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। দেখি, সত্যিই হেমন্তকালে গাছে গাছে টক্টকে লাল আপেল আর সোনার বরণ বড় বড় নেস্পাতি ফলবার কথা, কিন্তু কোনো গাছে একটা কাঁচা ফল পর্য্যন্ত নেই। বিশ রকমের আপেল, নেস্পাতি, বড় বড় শাঁসালো কুল, চেরী, ভীশ্নিয়া, য়াগদা, মালীনা, প্রভৃতি নানা রঙের নানা আকারের ফলে পোলী গ্রামকে ভূস্বর্গে পরিণত করতো—আজ তার একটিও নজরে পড়ে না।

মাংস বলে' কোনো জিনিষ দেখাই যায় না। জার্মানরা সারি সারি যেসব গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, তাতে পশুপক্ষীও মানুষের সঙ্গে যে কত পুড়ে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। যেগুলো পুড়ে মরেনি, সেগুলো চাষারা

আসন্ন দুর্দিনের জন্যে জিইয়ে রেখেছে। এবং তাদের ঐ শেষ সম্বলটুকুর ওপর ভাগ বসানোও ধৃষ্টতা। মনে আছে স্রধু একজায়গায়, বহু দিন পরে আশ মিটিয়ে পক্ষিমাংস উদরস্থ করা গিয়েছিল। একটি বিধ্বস্ত গ্রামে। অন্য অন্য বাড়ী ঘরদোর সবই প্রায় বোমার চোটে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। যে দু'একখানা বাড়ী তখনও চিড় খেয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে ছিল, তারই একটিতে আমরা কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করি। যুদ্ধে সবই ছারখার হয়েছে, এবং আরো হবে, এই বিবেচনায় চাষা তার অবশিষ্ট মোরগ-মুর্গী এবং হাঁস নিঃশেষ করে' তার অতিথিদের সৎকারে নিয়োগ করলে। মাথা-পিছু পড়লো দু'টো করে' পাখী। মনে আছে, আমরা প্রত্যেকেই এক গামলা করে' ঝোল ও দুটি করে' পাখী নিয়ে বসেছি, আর মাথার ওপর দিয়ে ঘোর গর্জনে দিগন্ত ফাটিয়ে বোমারুরা উড়ে চলেছে; থেকে থেকে বোমার আওয়াজে বিধ্বস্তপ্রায় বাড়ীখানা দুলছে এবং আমরাও পাগলের মত খেয়ে চলেছি। যা খেতে পারা গেল না, তা সঙ্গে নেওয়া গেল। তাতে বড় জোর পরের দিনের এক বেলার খোরাক হবে। স্রতরাং আবার যে অবস্থা সে-ই।

রুটি স্রধু দুষ্প্রাপ্য নয়, একেবারে অপ্রাপ্য। যদি পাওয়াও যায় ত কিনে নয়, ভিক্ষা করে'। কোনো চাষী বুড়ীকে যদি বলা যায়, রুটি বেচবে না ত ভিক্ষা দাও, ত সে বেচারী অন্ততঃ ধর্মের ভয়েও খানিকটা রুটি দিতে বাধ্য। অতিথি-সৎকার এ জাতের মজ্জাগত। স্রতরাং ভিক্ষা করে' যেটুকু পাওয়া যায়, তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারি তাদের নিজেদের অবস্থাও ভালো নয়। আশ্চর্য্য নেই। সে বছর বেশীরভাগ জায়গাতেই যুদ্ধের দৌলতে শস্য ঘরে তোলা হয় নি। কতক জ্বলেছে, কতক ক্ষেতে থেকে পচে' নষ্ট হয়ে গেছে। বোমারুদের দয়ায় চাষারা মাঠে কাজ করতে পারে নি। আমাদেরই কত চোখে পড়েছে, প্রকাণ্ড মাঠের ওপর কর্মরত দু'টি একটি



কয়েকটি মৎস্য-জীবীর কুটীরের সমষ্টি হতে উদ্ভূত বাল্‌তিক্ সাগরের বৃহত্তম বন্দর গ্‌দ্যানিয়ার দশ বছরের আকৃতি।

চাষা ও তাদের লাঙল-টানা ঘোড়াগুলোকে জার্মানরা কল-বন্দুকের গুলিতে কচুকাটা করে' গেছে।

খাদ্য-সামগ্রীর ভেতর আলুটা এখনো কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাও সে গত বছরের কল-বেরুনো আধ-পচা আলু, যা শোর, গরু, ঘোড়া, মোরগ, মুর্গী, হাঁসদের জন্যে কিছু কিছু জমানো আছে। এ বছর ক্ষেতের আলু ক্ষেতেই পড়ে' আছে বেশীরভাগ, কারণ আলু তুলতে গিয়ে যেখানে সেখানে আকছার মেয়েদের প্রাণ যাচ্ছে। আলুর ক্ষেতে সারি সারি হুমড়ি খেয়ে বা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়া, মাথায় অবগুণ্ঠনের মত রঙিন রুমাল বাঁধা চাষার মেয়েদের অসাড় দেহ আমাদেরও চোখে পড়েছে।

কখনো কখনো আমাদের বরাত ভালো থাকলে কপালে জোটে আধ-পচা, কল-বেরুনো আলুসেদ্ধ আর তার সঙ্গে একরত্তি দই বা একটু দুধ, নুন মেশানো। বেশ বোঝা যায়, পশুদের খোরাক থেকে কেটে রেখে আমাদের দেওয়া হ'চ্ছে। চাষাদেরও ঐ একই খোরাক বরাদ্দ। শাক-সব্জী, মাছ বা ডিম বলে' যে কোনো জিনিষ পৃথিবীতে জন্মায় সেকথা আমরা প্রায় ভুলে গেছি। তার ওপর ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে' দিনরাত পথ চলা। ক্ষিদে যত বাড়ে, তত বাড়ে ভোগ-লালসা। আমাদের অবস্থায় পড়লে, বাপুজীর যেকোনো অহিংস ও ঘোর জৈন চেলার পক্ষেও বেশীদিন আমিষ-নিরামিষের পার্থক্য বজায় রাখা চলতো কিনা সন্দেহ। মাঠে-ঘাটে চরমান পশুদের চেহারা চোখে পড়লেই আমরা তাকে বধ করে' কী কী খাদ্য বানানো যেতে পারে তারই আলোচনা করি। একদিন নজরে পড়লো একটি নধর শূকর-শিশু, বেড়ার মধ্যে আটক পড়ে' হাত পা ছুঁড়ে চ্যা চ্যা করে' চেঁচাচ্ছে। তাকে দেখে আমরা প্রথমেই তাকে ছেলে-ধরার মত বগল-দাবা করতে প্রলুব্ধ হ'লাম। কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তিতে

অকৃতকার্য্য হয়ে তাকে নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে' যে আলোচনা করলাম, তার বিবরণ আপনাদের না দেওয়াই ভালো।

আমাদের এই ভোগ-লালসা এমন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল যে, প্রায়ই পথের ধারে মোট-ঘাট নামিয়ে একটু বিশ্রাম করবার সময়ে আমরা এক একজন নানা মুখরোচক খাদ্য-সামগ্রীর বা তার পাক-প্রণালীর বিবরণ দিয়ে পরস্পরের মনোরঞ্জন করতাম। দেখা গেল, আমাদের খাদ্য-তালিকা (যা আমরা মনো-রসনায় পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদন করতাম) এত দীর্ঘ হয়ে পড়ে যে, তা একদিনে কেন, একমাসেও খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। মনে পড়ে, আমি কেবল যতরকমের সিঙ্গাড়ার বর্ণনা দিয়ে আমার সাথীদের বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতি দস্তুরমত আসক্ত করে' তুলতাম। যাই হোক্, আমাদের এই পরিব্রাজকের জীবনে অন্নকষ্ট ক্রমাগত বেড়েই চললো।

তার ওপর আশ্রয় মেলা দুরূহ হয়ে উঠলো। আমাদের মতই হাজারে হাজারে লোক পূব দিক লক্ষ্য করে' একই পথ দিয়ে চলেছে, এবং পথে সবারই আশ্রয় দরকার। বড় রাস্তার ধারে কাছে কোনো চাষার বাড়ীতে আশ্রয় মেলা একেবারেই অসম্ভব, কারো বাড়ীতে তিল ধরবার স্থান নেই। যাদের সামান্য স্থান আছে তারা অবিরাম অতিথি-সৎকারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। একটু দূরে আশ্রয় পাওয়া যায় বটে, তবে সে গোলাঘরের ভেতর শুক্‌নো ঘাস বা খড়ের মাচার ওপর, পনেরো, বিশ, তিরিশ জন অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে। অতগুলো অজ্ঞাতকুলশীল মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে রাত কাটানোর বিপদ ত আছেই, কারণ তাদের মধ্যে যে দু'টি একটি চোর ডাকাত বা খুনে নেই, তা হলফ্ করে' বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যেসব জায়গায় শিশুরা জমা হয়েছে, সেখানে তাদের খাবার আব্দারে মানুষকে পাগল করে' দেয়। পথে যে দু'এক জায়গায়, জনবিরল

গোলা-ঘর বা চাষার বাড়ীতে শান্তিতে রাত কাটানো যায় নি, এমন নয়, তবে বেশীরভাগই আমাদের কাটে রাস্তায় বা রাস্তার ধারে।

ঘুম পেলেই যে বিছানায় গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুতে হবে এ কুসংস্কার থেকে আমরা ক্রমে মুক্তিলাভ করলাম। এক একবার দিনে ও রাতে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়তাম যে, পথের ধারে ঘুমনো ছাড়া আর উপায় ছিল না। তখন আর কী? স্রধু মাঠে গিয়ে স্যুট্-কেস্ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়া আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার মত। দু'এক দিন পরে আবিষ্কার করা গেল, সবচেয়ে আরামে শোয়া যায় খানার ভেতর, ঢালু হয়ে। তখনো হেমন্তের বাদল সুরু হয় নি, কাজেই খানাগুলো খট্‌খটে শুক্‌নো এবং জায়গায় জায়গায় ঘাস জন্মে' মাটিটাকে শয়নোপযোগী নরম করে' রেখেছে। শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ি; পথ দিয়ে সারারাত চলে সৈনিকের দল কুচ্‌কাওয়াজ করে' আর না হয় যুদ্ধের মালপত্র নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী।

এক একদিন অনাহারে, পথের ক্লান্তিতে ঘুম আসে না। সামনে চেয়ে দেখি, অন্ধকার তোলপাড় করে' চলেছে হাজারে হাজারে পলাতক আর সৈনিক। জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে' উপলব্ধি করি, যুদ্ধে আমাদের সবাইকে গৃহহারা, ছন্নছাড়া করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির পীড়নে দলে দলে জাতি যেমন এক জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গায় বসতি তুলে নিয়ে যেত, এও ত ঠিক তাই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটা সমগ্র জাতিকে যে এইভাবে যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। চলেছে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু— যাবতীয় প্রয়োজনীয় অস্থাবর সম্পত্তি আর গৃহপালিত পশু সঙ্গে নিয়ে নূতন দেশ, নূতন বসতির সন্ধানে। পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি, দেশ ছেড়ে চলে' যাবে তবু তারা জার্মানদের অধীনে থাকবে না, একথা প্রায়ই

ভ্রাম্যমান জনতার মুখে শুনতে পাই। কারো কারো মুখে শুনি—"রুশীরা পানিয়ে, ঢের ভালো। তারা আমাদের ওপর অত্যাচার কম করেনি একদিন, কিন্তু হাজার হোক্, তারা স্লাভ, আমাদের জ্ঞাতি, তাদের আমরা বুঝি। আর এই শ্বাব-ব্যাটাদের না বুঝি ভাষা, না বুঝি তাদের মনকে।" পোলদের মুখে একথা শুনে আশ্চর্য্য হই। আশা হয় একদিন হয়তো জার্মানদের অত্যাচারে সমস্ত স্লাভ একত্র মিলিত হবে।

এই যে বিরাট জনস্রোত চলেছে, গ্রামের ভেতর দিয়ে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, এ খবর জার্মানরা কি করে' রাখছে, সেইটাই আশ্চর্য্যের কথা। বারে বারে পথ বদ্‌লানো হ'চ্ছে, কিন্তু জার্মানরা ঠিক খবর পেয়ে এসে আবার জনতার ওপর আগের মতই বোমাবর্ষণ করছে। পরে বোঝা গেল, সৈন্যদল ও জনসাধারণের সঙ্গে মিশে চলেছে জার্মানী গুপ্তচর। এই ধরণের একটি গুপ্তচরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কালুশিনের পথে। লোকটি কেবলই সবাইকে জিজ্ঞেস করে, তারা চলেছে কোথায়? আমাকেও ঐ ধরণের প্রশ্ন করায় তার মুখের দিকে তাকাতেই সে চোখের নিমিষে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। গুপ্তচরগুলি সবই পোলদেশ-প্রবাসী জার্মান। সুতরাং কথার উচ্চারণে তাদের ধরবার উপায় নেই। এঁরাই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটতে কাটতে চলেছেন, এবং সৈন্যরা কোন্ দিক লক্ষ্য করে' যাচ্ছে, সে খবরও পকেট-রাদিও দ্বারা তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে পাঠাচ্ছেন। অথচ যে সৈন্যদল লড়তে চলেছে তাদের অসামরিক জনতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার উপায় নেই। লাখে লাখে বিশৃঙ্খল মানুষ হাজার নিষেধ সত্বেও কেবল সৈন্যদের পথ অনুসরণ করে' চলেছে। এবং তাদের হটাতে হ'লে তাদের কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই।

এবার খুব কাছ থেকে বোমার প্রতিক্রিয়া অনুভব করবার সুযোগ

মিললো। বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মাটির ফোয়ারা ওপরে উঠে যায়, তা আগেও দেখেছি। এখন দেখি তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কে যেন পাঁজা-কোলা করে' তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বোমার আওয়াজ যা কানে শুনি তাতে তাকে খুব ভয়ঙ্কর মনে হয় না, কারণ তা মানুষের শ্রবণ-শক্তিতে ধরা যায় না। তবে আওয়াজটা বাস্তবিক কী ভীষণ তা উপলব্ধি করি চোখে দেখে। যেখানে বোমা পড়লো, সেখানে একটা ডোবা হয়ে গেল, এবং তার পরিধির মধ্যে মানুষ, ঘোড়া ইত্যাদি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু সেই ডোবার দশ বিশ গজের মধ্যেও যারা রইল তাদেরও নিস্তার নেই। শব্দের প্রতিক্রিয়ায় সেখানকার হাওয়া এত জোর সরে' যায় যে, এই বহিঃপরিধির ভেতরকার মানুষেরও হাত, পা, ধড় বা মুণ্ড ছিঁড়ে ছটকে পড়ে।

এই মামুলি ধরণে বোমা ফেলে অসহায় মানুষের প্রাণসংহার জার্মানরা বরাবরই করে' চলেছে। এখন একটু নূতনত্ব চোখে পড়লো, মাঠে মাঠে ছোট ছোট রাখাল ছেলেদের শিকার। সাত আট ন বছরের বাচ্ছা ছেলেগুলো এতদিন বোমা অগ্রাহ্য করে' নিরাপদে গরু চরাচ্ছিল। সাধারণতঃ তারা গরীবের ছেলে, পরণে শতচ্ছিন্ন পোষাক, মাথায় পুরাণো ছেঁড়া টুপি বাঁকা করে' বসানো, হাতে ছোট একগাছি লাঠি। টুপির ফাঁক দিয়ে ঝুম্‌কো ঝুম্‌কো অতসী-বরণ চুল বেরিয়ে পড়েছে, নীল চোখ ভরা স্বপ্ন। এদের দেখলেই দাঁড়িয়ে দু'টো মিষ্টি কথা না বলে' থাকা যায় না। জার্মানরা এদেরও রেহাই দিলে না। গরুগুলো পর্য্যন্ত শত্রুদের কোপ এড়াতে পারলে না। হয়তো সমস্ত পোলজাতটাকে ত্রস্ত, সশঙ্ক, আতঙ্কে পঙ্গু করে' ফেলবার জন্যেই জার্মানী বৈমানিকরা ওপর-ওয়ালাদের কাছ থেকে এ ধরণের নির্দেশ পেয়েছিল। হয়তো বা তারা সত্যিই আল্‌ক-হলের উন্মাদনায় একেবারে বিবেকশূন্য হয়ে গেছে।

শেষোক্ত অনুমান মিথ্যা না হ'তেও পারে। এক জায়গায় দেখা গেল, মাঠের ওপর সারি সারি "কাশা" বা বার্লিজাতীয় শস্য আঁটি-বাঁধা দাঁড় করান আছে। একটা উড়োজাহাজ খুব নীচু হয়ে এসে কল-বন্দুকের গুলি দিয়ে সবকটি আঁটিকে একে একে ধরাশায়ী করলে। মস্তিষ্কের বিকৃতি না ঘটলে শস্যগুচ্ছকে সৈনিক জ্ঞান করা হয়তো সম্ভব নয়। হয়তো বা হিট্‌লার সাহেবের প্লান অনুসারে পোলদের ধনে প্রাণে ধ্বংস করার এও একটা রীতি। কারণ যুদ্ধের কিছুদিন আগেই তিনি পোলদের সম্বন্ধে তাঁর মৎলব প্রকাশ করেছিলেন দু'টি কথায়—ausrotten, vernichten—ধ্বংসীকরণ, নিশ্চিহ্নীকরণ।

পথ চলতে চলতে দেখি পুড়ছে গ্রাম, পুড়ছে ক্ষেত, পুড়ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতি আর বহু যোজনব্যাপী উত্তুঙ্গ অরণ্যানী। তখন সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। পোলদেশের বনে বনে "সোনার হেমন্তের" আমেজ লেগেছে। দেখি, পোলভাষায় যাকে "সোনার হেমন্ত" বলে, তা স্বধু কবির কল্পনা নয়। সবুজ পাতা ক্রমে কাঁচা সোনার মত হলদে হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে আখ্‌রোট বা ক্লন্‌-গাছের গাঢ় তাম্রের ব্যবধান। দূর থেকে মনে হয় যেন বনে আগুন লেগেছে। এবং সেবছর সত্যিই বনে বনে আগুন লাগলো। ছোট ছোট অগ্নিবর্ষী-বোমা এসে পড়ে বনের ভেতর, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত দাবানল বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলে ক্রোশের পর ক্রোশ, একেবারে দিশেহারা হয়ে। সোনার বরণ পত্র-পল্লব ক্রমে লাল অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে গাঢ় তাম্রের লেলিহান তরবারির আকার ধারণ করেছে, অবাক্ হয়ে দেখি। কখনো বা দেখি, ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে' বোদ-মাটির মাঠ গুমে গুমে, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পুড়ছে। অনভ্যস্ত চোখে মাটি পোড়ার দৃশ্য অদ্ভুত ঠেকে, মনে হয় যেন কী একটা আরব্য রজনীর কাহিনী বাস্তব হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার সময়ে সেদিক দিয়ে যেতে গা ছম্‌ছম্ করে।

সারা রাত ধরে' জ্বলে বন আর গ্রাম। সে আলোয় অনেকদূর থেকেও অন্ধকারে পথ চিনে নিয়ে আমরা চলি। চলে হাজারে হাজারে মানুষ আমাদের মত; কখনো বা স্বল্পালোকে দেখি, চলেছে বিরাট অশ্বারোহী বা পদাতিক সেনা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মালবাহী ঘোড়ার গাড়ী সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, আহার্য্য প্রভৃতি নিয়ে। দিনের পর দিন সৈন্যবাহিনী অবিরাম পথ চলেছে দেখে মনে সন্দেহ জাগে, হয়তো এরাও আমাদেরই মত লক্ষ্যহীনভাবে ক্রমাগত দূরত্ব অতিক্রম করছে। তাদের দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় উপলব্ধি করি, আমাদের অনুমান ভ্রান্ত নয়। অনেকেই অসঙ্কোচে স্বীকার করে, তারা কোথায় যাচ্ছে জানে না, এবং তাদের মাথার ওপর কাপ্তেনের উচ্চতর পদস্থ অফিসার একজনও নেই। এদের বেশীর ভাগই হ'চ্ছে তারা যাদের একেবারে সবশেষে হাতিয়ার ধরবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল, এবং যারা শেষপর্য্যন্ত নিজের নিজের ঘাঁটিতে এসে পৌছতে পারে নি। তার প্রধান কারণ দু'টি। এক: জার্মানরা পোলদেশের সর্বত্র বোমা ফেলে ট্রেন চলা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। দুই: জার্মানী গুপ্তচররা টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পাঠানো একেবারে অসম্ভব করে' ফেলেছে। সুতরাং এই বিশৃঙ্খল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল হন্যে হয়ে যোজনের পর যোজন পথ অতিক্রম করে' চলেছে আপন আপন ঘাঁটির সন্ধানে। রাত্রির অন্ধকারে প্রায় শুনি দু'দলে পথে দেখা হ'লে তারা চীৎকার করে' পরস্পরকে একই কথা সুধায়—"হেই পানভিয়ে, অমুক পণ্টনের খবর বলতে পারো?" দু'পক্ষ থেকেই জবাব আসে—"না, পানিয়ে।"

তোমরা চলেছ কোথায়?

যেদিকে দু'চোখ যায়।

হলেরা! * হেঁটে হেঁটে পাহ্’খানা ক্ষয়ে গেল, তবুও হলেরা কোথায় যে চলেছি তার ঠিক নেই।—পথশ্রান্ত, অসহিষ্ণু সৈনিকের কর্কশ কণ্ঠস্বরে বেশ বুঝতে পারি, তারা ক্রমে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

আমরা যতই পূব-মুখো চলি, ততই সৈন্যদের এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা স্পষ্টতর হয়ে চোখে পড়ে। দেখি চারিদিক দিয়ে সৈন্যদের দল চলেছে কেউ পূবে, কেউ পশ্চিমে, কেউ উত্তরে, কেউ দক্ষিণে। পরস্পরের সঙ্গে খবরাখবরের একমাত্র উপায় বিমানপথে। কিন্তু তা জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলে হওয়া সম্ভব নয়। এবং জার্মানরা যে কোথায় তা আমরা যেমন তেমনি সৈন্যরাও জানে না। স্থানে স্থানে যুদ্ধ হ’চ্ছে, বুঝতে পারি, কারণ কামানের গোলার আওয়াজ খুব কাছেই শোনা যায়। কিন্তু এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্যের দল যে একত্র মিলিত হয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করবে, সে উপায় নেই, কারণ এখানেও ঐ মুস্কিল, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব। সুতরাং যারা লড়ছে তারা সংখ্যায় জার্মানদের তুলনায় নগণ্য হলেও প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে। কিন্তু তারা যে সর্বত্র যুদ্ধে জয়লাভ করছে, তা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, লক্ষ্য করি, সৈন্যদের মধ্যে ছত্রভঙ্গ ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মাত্র। পথে দেখা যায়, কাতারে কাতারে দলছাড়া সৈনিক চলেছে; হাতে হাতিয়ার নেই, গায়ে সম্পূর্ণ উর্দি নেই, অনেকের পায়ে জুতো পর্য্যন্ত নেই। এবং পল্টন ছেড়ে ছটকে পড়াতে উদরে অন্ন নেই। কারো কারো সঙ্গে পরিচয়ে খবর পাই, জার্মানরা প্রায় আমাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করেছে। এবং পোল সৈন্যদল চলাচলের অসুবিধার জন্যে এত খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছে যে, এ অঞ্চলে জার্মানদের সঙ্গে লড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

পথ-চলা সৈনিকদের কাছে জার্মানদের লড়ার বিবরণ শুনতে পাই।

* কলেরা। পোলী কটু-উক্তি।

তাদের কাছে প্রথমে শুনে তখনো বিশ্বাস হয় নি যে, এক একটা জার্মান বাহিনী মাইলের পর মাইল রাস্তা জুড়ে বিদ্যুতের গতিতে, ব্লিৎসী কায়দায় ছুটে চলে। তাদের পদাতিক বলে' কোনো পায়ে চলা সৈনিক নেই। আছে বড় বড় লোহায় ঢাকা বাস্, তাতে হাজারে হাজারে সৈনিক দিনে একশ মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করে' আরামে তাঁবু গেড়ে নিদ্রা দেয়। তার পর আবার সকালে ক্ষৌরকার্য্য ও জামাইষষ্ঠীর জলখাবার সেরে লড়তে বার হয় বাসে চড়ে'। সঙ্গে থাকে শত শত ট্যাঙ্ক্ আর আর্মার্ড্ কার। আগে খাদ্যের অভাব ছিল, এখন পোলদেশে এসে পড়ায় আছে চাষাদের হাঁস-মুর্গী-পেরু, শোর-গরু, ডিম-দুধ-মাখন-ছানা ইত্যাদির অবারিত ভাণ্ডার যা পেটির পিস্তল দেখিয়ে অনায়াসে, লুটতরাজ করা চলে। শুনে তখনো বিশ্বাস হয় নি যে, জার্মানরা যখন লড়তে যায়, তখন তাদের সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকে। ঘণ্টায় সত্তর মাইল গতিতে তারা মোটর-বাইকে চড়ে' লড়াই করে। একজন চালায় গাড়ী, আর একজন সাইড্-কারে কল বন্দুকের সামনে বসে' গুলির হরিরলুট ছড়াতে ছড়াতে চলে। সাধারণ বন্দুক দিয়ে তাদের তাগ করতে করতেই তারা আশে পাশে মৃত্যু-বাণ ছড়াতে ছড়াতে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়। তাদের পায়ে যে বুট তাতে গুলি লাগলেও তাদের মক্ষম রকমে জখম করতে পারে না। "আর আমাদের!" —পথশ্রান্ত দল-ছাড়া সৈনিক নিজের জুতোর ওপর মোটা কাপড়ের পট্টির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দেখি, একটা গুলি পট্টি ফুঁড়ে তার পায়ের অনেকখানি মাংস কেটে নিয়ে গেছে। দেশে এতটুকু আইওডিন্ নেই। পথের ধুলোয় তার পায়ের ক্ষত কুৎসিত আকার ধারণ করেছে।

বেশ খানিকদূর পূবদিকে এগিয়ে যাবার পর দেখা গেল, আমরা যে-মুখো চলেছি তার ঠিক উল্টো দিক থেকে আসছে হাজারে হাজারে

পলাতক আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দল-ছাড়া সৈনিক ঠিক আমাদেরই মত। জিজ্ঞেস করি, তা'রা কোন্‌দিকে? উত্তর আসে, যেদিকে দু'চোখ যায়।

জার্মানরা কোথায়?

ভগবান জানেন।

তোমরা ফিরছ যে?!

কেন তাও জানি না। পথে অফিসাররা ভারশৌএ ফিরতে বললে, তাই ফিরছি।

ভারশৌ দখল হয়নি?

কী করে' জানবো বলো ভাই?

তাদের কথা শুনে একবার মনে হ'লো, এই অনিশ্চিত যাত্রা স্থগিত রেখে ভারশৌএ ফিরলেও হয়। কিন্তু আমরা তখন অনেকটা পথ পূব দিকে এসে পড়েছি, বুগ-নদী আর বেশী দূরে নয়। আর একটু পা চালিয়ে চললে হয়তো একদিনে রুশিয়ার সীমান্ত পার হওয়া যাবে। কিন্তু জার্মান পরিবেষ্টিত ভারশৌএ হয়তো পৌছনও যাবে না, এবং পৌছলেও সেখানে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক পড়তে হবে। তাছাড়া দিনের পর দিন যাযাবরের জীবন যাপন করে' পথের মায়া আমাদের দেহমনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছে। তখন মনে হয়, মানব জাতি পথের ধারে ঘর বেঁধে হয়তো একদিন যে ভুল করেছিল, তার জন্যেই জগতে আজ এত বিরোধ পদে পদে। মানুষ যখন পথ ছেড়ে ঘর বাঁধলে, পৃথিবীর মুক্ত, অপ্রতিহত কোলের ওপর ছক কেটে, বেড়া দিয়ে, খণ্ড খণ্ড জমীকে গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সঙ্গে এবং তাদের বংশপরম্পরার সঙ্গে অবিছিন্নরূপে যুক্ত করলে, তখনই সুরু হ'লো ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, জাতির স্বার্থবোধ, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'লো স্বার্থের সংঘাত। পথ চলতে চলতে পথ আমাদের ঘরবাড়ী হয়ে উঠলো। বনের প্রসার আর

খোলামাঠের মুক্তিকে সমাজের বেষ্টনীভুক্ত করতে প্রবৃত্তি হ'লো না। আমরা স্বপ্নাবিষ্টের মত ক্রমাগত এগিয়ে চললাম।

বুগ-নদীর ধারে ভ্লদাভা সহরের কাছাকাছি এসে দেখা গেল, যে পরিমাণে লোক পূবমুখে চলেছে তার চেয়ে ঢের বেশী চলেছে ঠিক তার উল্টোদিকে। অর্থাৎ এবার ক্রমাগত লোক পূবদিক থেকে ফিরে আসছে। এ অঞ্চলে পথচলা খুব সুখের নয়। বাংলাদেশের বর্ষাকালের কাদার মত এখানে সর্বত্র একহাঁটু করে' কাদা; তার ওপর জলা জায়গারও অভাব নেই, যেখানে পথ ভুলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাতালপুরীতে গিয়ে পৌছন যেতে পারে। কোনো প্রকার খাদ্য এখানে যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি দুর্মূল্য, আর তেমনি অস্বাস্থ্যকর। তাছাড়া এখানকার বাসিন্দারা অনেকেই উক্রাইনী যাদের জন্যে, আগেই বলা হয়েছে, হিট্‌লার সাহেবের কোষাগার একেবারে অবারিতদ্বার। রাতে আশ্রয় দিয়ে টাকা পয়সা লুট করা এদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর দেশভক্তির নামে এরা পোলদের পূর্বকৃত উপকারের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বুকে হরদম ছুরী চালাচ্ছে। এসমস্ত অসুবিধাই অগ্রাহ্য করে' আমরা এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু একটা খবরে সে সঙ্কল্প আমাদের ত্যাগ করতে হ'লো। ওদিকে নাকি ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, এবং পূব দিক থেকে বসতি তুলে নিয়ে দলে দলে মানুষ পশ্চিমমুখো চলেছে। কেউ কেউ বললে, রুশীরা আক্রমণ করেছে। আমরা তখন সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলাম বটে, তবে জনতার বিপরীত গতি দেখে বেশীদূর কাদা ভেঙ্গে পূবদিকে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে' মনে হ'লো না। কারণ, স্পষ্ট বোঝা

গেল, ওদিকে একটা গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি না হ'লে অন্ততঃ পোলচাষা তার ক্ষেত-খামার ছেড়ে অন্য অঞ্চলে বসতি তুলে নিয়ে যেত না। যাই হোক্, মোটা-মুটি জানা গেল, পূবদিক দিয়ে দেশ থেকে বেরুবার পথ বন্ধ।

ছত্রভঙ্গ জনতা নিরুপায় হয়ে ভারশৌএর দিকে ফিরে চললো। এইবার একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। জার্মানী বিমান-আক্রমণের বহর বেশ একটু কমে' এলো। তাতে অনেকে অনুমান করলে, জার্মানরা হয়তো পশ্চিমে ডাণ্ডা খেয়ে কথঞ্চিৎ ঢিট্ হয়েছে; অন্ততঃ পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করতে তারা পূব থেকে সৈন্য-সামন্ত, বোমারু-কামান প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ চুপি চুপি বললে, পোলদের পক্ষে যুদ্ধের অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। শেষোক্তদের অনুমানই ঠিক ব'লে মনে হ'লো, কারণ পূর্বোক্তেরা দেশ-প্রীতিতে প্রণোদিত হয়ে আশায় বুক বাঁধছিল। এবং আমরা যখন জার্মানদের এড়াতে চাই, তখন আমাদের পক্ষে দস্তুরমত সিনিক্ না হয়ে উপায় নেই। কাজেই আমরা পূবদিক দিয়ে বেরুবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে এবার একটু পশ্চিম ঘেঁসে দক্ষিণ-মুখো চলতে লাগলাম। আপাততঃ লক্ষ্য হ'লো লুব্লিন্; পরে ল্ভূফ্ * দিয়ে রোমানিয়ায় পৌঁছন যেতে পারবে। সটান ল্ভূফ্ লক্ষ্য করে' আমরা দক্ষিণ-দিকে নামা বিবেচনার কাজ হবে না মনে করলাম এইজন্যে যে, অতদূর পথ অতিক্রম করতে হ'লে ধারে-কাছে একটা সহরের দিকে নজর রাখা দরকার। যদি আমাদের ভাগ্যে কোনো দুর্ঘটনা বা গুরুতর অসুস্থতা লেখা থাকে তা হ'লে তাড়াতাড়ি সহরে এসে পড়া যেতে পারবে। যাই হোক্, নানা কারণে আমরা লুবলিন্ লক্ষ্য করে' চললাম। মনে মনে এ আশাও হ'লো যে, হয়তো পোলসরকার ও ইংরেজরা এখনো লুব্লিনে সুস্থিরভাবে বসবাস করছেন।

* যাকে জার্মানী ও ইংরেজী কায়দায় ভুল করে' বলা হয় লেম্বের্গ্।

ভ্লদাভার দিক থেকে লুব্লিনের পথ অতিক্রম করা খুব সহজ-সাধ্য নয়। পোলদেশের পূর্ব অঞ্চল আমাদের পূর্ববঙ্গের চেয়ে বিশেষ ভালো বলে' মনে হয় না। কেবল জল আর কাদা। রাস্তা সর্বত্রই কাঁচা। একটি মাত্র সরু পাকারাস্তা চোখে পড়লো। তার ওপর দিয়ে চলবার উপায় নেই, কারণ সামরিক ও অসামরিক জনতায় সেটি দিবারাত্র পরিপূর্ণ। এবং রাস-রথের ভিড় ঠেলে আমরা যে কোনাদিন গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারবো সে বিশ্বাস হয় না। কাজেই ওদেশের চাষারা ব্যাকরণ-অশুদ্ধভাবে যে পথকে "পোল্স্কা দ্রগা" বলে সেই ধরণের পথ ধরে' চলতে হ'লো। হওয়া উচিৎ "পল্না দ্রগা" অর্থাৎ মেঠো পথ, কিন্তু চাষারা ভুল করে' বলে পোল্স্কা দ্রগা অর্থাৎ পোলীয় পথ। এই পোল্স্কা দ্রগার দূরত্ব সম্বন্ধে পোল চাষাদের ধারণা আমাদের দেশের চাষাদের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেয় নয়। পাঁচ সাত মাইল পথকে এরা দু'মাইল বলে' পথ-শ্রান্ত পথিকের মনে আশার সঞ্চার করে।

অমুক গাঁ এখান থেকে কতদূর হবে হে?

ঐত, কাছেই পানিয়ে, ঐ মাঠ ছাড়িয়ে বন, বনটা পার হ'লেই ব্যস, পানভিয়ে একেবারে গাঁয়ের মাজ-মিস্থি-খেনে পৌছে যাবে।

কতদূর হবে?

তা, প্রশে পানুফ্, প্রায় দু'কিলোমেত্র্ হবে বৈকি।

আমরা একহাঁটু কাদা ভেঙ্গে মাঠ পার হয়ে বনে এসে ঢুকি, তারপর আবার মাঠ আবার বন। এমনি করে' দু'য়ের জায়গায় সাত কিলোমেত্র্ হাঁটতে হাঁটতে আমরা রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠি বিশেষ করে' এইজন্যে যে, চাষাদের দূরত্ব-নির্দেশের প্রসাদে আমাদের প্রায়ই খাওয়া হয় না। মানচিত্রে দেখা গেল, কাছেই একটা বড় গোছের গ্রাম

আছে তার দূরত্ব দু'মাইল হ'লে ঠিক খাওয়া-দাওয়ার সময়ে গিয়ে পৌছন যেতে পারে। কিন্তু দু'য়ের জায়গায় সাত কিলোমেত্র্ পথ অতিক্রম করে' আমরা এমন সময় গিয়ে পড়ি যখন চাষাদের বাড়ীর আগুন নিবে গেছে, এবং তারা দুপুর বেলায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। এবং এমন কি শোর-হাঁস-মুর্গীদের পর্য্যন্ত খাওয়া হয়ে গেছে। তাদের খোরাক থেকেও যে একটু কেটে নিয়ে আমাদের পাতে দেবে, সে উপায়ও নেই। কখনো কখনো গোটাকয়েক আলু সেদ্ধ আর একটু দই পাওয়া যায়। যাই হোক, আমাদের ভাগ্যে অন্নকষ্ট আর ঘুচলো না, যতক্ষণ না একদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে বিধি আমাদের ওপর সদয় হ'লেন।

দিনে ও রাতে ক্রমাগত প্রায় তিরিশ মাইল পথ চলে' আমরা ভোরের দিকে একটা আশ্রয়ের খোঁজে বেরুলাম। তখন অল্প অল্প হেমন্তের ঝড় ও বৃষ্টি সুরু হয়েছে। খোলা আকাশের তলায় মাঠের ওপর শোয়া স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে নিরাপদ ত নয়ই, উপরন্তু এ অঞ্চলে চারিদিকে বনজঙ্গল থাকায় প্রায়ই ছোট ছোট তামাটে রঙের মারাত্মক বিষধর সাপ দেখা যায়। পোল ভাষায় তার নাম ঝ্মীয়া (zmija)। এই ঝ্মীয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু নিশ্চয়, তা দু'এক ঘণ্টা বা দু'দশ দিনের ভেতরই হোক্। নানা কারণে আমরা এবার ক'দিন থেকে চাষাদের গোলা-বাড়ীর খড় বা শুক্নো ঘাসের মাচায় একটু শুয়ে বা ঘুমিয়ে নিয়ে পথ-ক্লান্তি দূর করছিলাম।

যে জায়গাটায় এসে সেদিন পৌছলাম ভোরের দিকে, সেটাকে গ্রাম বলা যায় না। মাত্র কয়েকঘর বসতি, চারিদিকে মাঠ, আব্ছা অন্ধকারে একগাছা কাছির মত একটি নদী চোখে পড়লো। তথাকথিত বড় রাস্তা খুব কাছেই। প্রথম যে কুঁড়েখানা পথে পড়লো, তারই দোরে ঘা দিয়ে চাষার কুকুরদের সতর্কিত করে' তুললাম। তখনো আঙিনার পশু-পক্ষী

ও ঘরের ভেতরকার মানুষ কেউই জাগে নি। কুকুরের ডাক শুনে একটি বুড়ী দোর খুলে আমাদের সামনে দাঁড়ালো।

খ্রীষ্টের জয় হোক।

যুগে যুগে।

আশ্রয় পাওয়া যাবে?

আচ্ছুয়? নিশ্চয়! বলে, অতিথ এলো দোরে না ঠাকুর এলেন ঘরে। ভেতরে এসো তোমরা।—বুড়ী আমাদের ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসালে। তারপর বলতে লাগলো—তোমরা যে এয়েচো, এ বাপু স্রেফ মা মারীয়া চেঁস্তোহভ্স্কা'র দয়ায়। ক'দিন থেকে কেবলই মারে ডাকতিচি, বলি মা, আমরা এই ক'ঘর চাষী, নেকা-পড়া জানিনে, আমাদের বুদ্দিসুদ্দি নেই, কী যে কাণ্ডটা হতেচে তা কিচুই বুইতে পাচ্চি নে। দেকি, হোই বড় রাস্তা দে' কেবলই পালে পালে নোক চলতেচে। বলে, জার্মানরা নাকি মোদের দেশটারে এক্কেবারে তচ্‌নচ্ করে' দেচে। আশে-পাশের গাঁগুনোরে পুইড়ে একেবারে খাক্ করে' দেচে। অবিশ্যি মা মারীয়া চেঁস্তোহভ্স্কার দয়ায় এখেনে এখনো কিচু হয় নি, কিন্তু হ'তে কতক্ষণ! সব পাপেরই ত শাস্তি আচে রে বাপু!—বুড়ী গলা খাটো করে' বলে—আর হোই যে দূরে দেকতেচো পেল্লায় বাড়ীখানা, ওখানা ত স্রেফ ডাকাতির পয়সায় তুলেচে ওরা! এত পাপ কি আর ভগমানে সইতে পারে? তাই বলি, ওরে শাস্তি দিতে গে হয়তো বা দেব্‌তার রাগ পড়বে মোদের ওপর, দু'কোন বাড়ীর মদ্দে আর কতটুকুই বা তপাৎ! তাই বলি, মা মারীয়ো, এমন কাউরে এখেনে পাটিয়ে দাও যে আমাদের কী ক'ত্তে হবে না হবে, একটা সুপরামর্শ দেয়। এই কালই বলতেচি, বলি মা পাটিয়ে দাও। আর আজ এই দেকো! তোমরা তাঁরই হুকুমে এখেনে এসে হাজির হ'লে আজ সাত সক্কাল বেলা!

বুড়ীর সরল বিশ্বাস নিতান্ত সিনিক্‌ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া তখন আমাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। কাজেই আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে' চুপ করে' রইলাম। আমার বাগ্‌দত্তার জন্যে বুড়ী তার নিজের ঘরখানা ছেড়ে দিলে, এবং আমরা পাঁচটি পুরুষ বুড়ীর দুই ছেলের দু'খানা ঘর দখল করবার শত উপরোধ উপেক্ষা করে' গোলা-বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লাম। আমাদের লট্‌-বহর অবশ্য বুড়ীর জিম্মাতেই কুটীরের ছাদের তলাকার ঘরে রেখে আসতে হ'লো। তিরিশ মাইল পথ চলে' এবং অনিদ্রায় আমরা এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে, সোজা হয়ে বসবারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু বুড়ীর অনুরোধে এখনো শোয়া চললো না। আধঘন্টার মধ্যেই খেতে যাবার ডাক এলো। সদ্য-দোয়া বটের আঠার মত দুধে প্রত্যেকের সামনে একটি ছোট গামলা ভর্ত্তি, পাশে একরাশ ডিম সেদ্ধ। তার ওপর রুটি, মাখন, মধু, বুড়ীর নিজের হাতে তৈরী ভীশ্‌নীয়া-চেরীর জ্যাম্‌ ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুদিন অনাহার ও স্বল্পাহারে আমাদের রসনা ও উদর উভয়েরই বৈরাগ্যভাব এসে পড়েছে। কাজেই যেরকম বুভুক্ষার সঙ্গে খাওয়া যাবে মনে করা গিয়েছিল, তা কার্য্যক্ষেত্রে হয়ে উঠলো না।

আহারের পর আমরা গোলা-বাড়ীর মাচায় গাদা প্রমাণ শুক্‌নো ঘাসের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া দু'এক ঝাঁক বোমারুর গর্জন কানে এলো বটে, তবে তা আমাদের কাছে নেহাৎ মাছির ভন্‌ভনানি বলে' বোধ হ'লো। কারণ বহুদিন পরে তখন আমাদের উদর পরিপূর্ণ, সুতরাং শরীরের স্বাভাবিক পুষ্টি-কার্য্য সুরু হয়ে গেছে, এবং আমাদের স্নায়ু একেবারে দাক্ষিণাত্যের হৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণদের স্নায়ুর মত শীতল ও নির্বিকার।

ন' দশ ঘণ্টা ঘুমোবার পর পড়ন্ত রোদ দেখে হঠাৎ মনে হয়, বুঝি ভোর হয়েছে, সূর্য্য উঠলো এখুনি। বুড়ীর ছেলের ডাকাডাকিতে ভুল

ভাঙ্গে। অনেকক্ষণ খাবার তৈরী। কী ঘুম, পানিয়ে! বেচারা ঘণ্টা খানেক ধরে' আমাদের ডাকাডাকি আর ঠেলাঠেলি করছে। পানী (ভদ্রমহিলা) অনেকক্ষণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাঁর স্নানও হয়ে গেছে ঘণ্টা দুইতিন আগে। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বুড়ীর রন্ধনশালার প্রকাণ্ড পালিশ-বিহীন শক্ত ওক্-গাছের টেবিলের চারিপাশে বসলাম। অতিথিদের জন্যে আলাদা জায়গা করা হয়েছে। একটু পরেই অতিথিদের ভোগ একে একে এসে টেবিল অলঙ্কৃত করতে লাগলো। বহুদিন এধরণের ভোজ্যের মুখ দর্শন করা হয় নি। সেসব পশু-পক্ষিদের পাক-রূপান্তরিত দেহাংশের বিবরণে পুঁথির কলেবরবৃদ্ধি করতে চাই না। স্বধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, খেতে খেতেই বুভুক্ষার উদ্রেক হয়, এই ফরাসী প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা সেদিন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করলাম।

যে ছোট গ্রামখানিতে আমরা এসে আশ্রয় নিলাম তার নাম, অনুসন্ধানে জানা গেল, গ্রীন্‌ঠী স্তক্। যে ক'ঘর চাষার বাস এখানে তাদের সংখ্যা হাতে গণা যায়। প্রাকৃতিক শোভা বলতে এর নিজস্ব কিছুই নেই। স্বধু একটু দূরে দূরে বন আর সবুজ মাঠ। চাষাদের জমীজমাও সব গ্রামের বাইরে। নেদিষ্ঠ "সভ্যতার" কেন্দ্র বলতে পাঁচ মাইল দূরের একটি ছোট সহর, নাম পার্‌চেক্, যেখানে একটি সিনেমা আছে, এবং যেখানকার গির্জার চূড়া পরিষ্কার দিনে অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

পোল-জার্মান যুদ্ধে গ্রীন্‌ঠী স্তক্-কে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমরা স্বয়ং চেঁস্তোহোভার মারীয়া দেবী-প্রেরিত প্রহরীরূপে দিনের পর দিন বুড়ীর আদরযত্নে লালিত ও পালিত হ'তে লাগলাম, এবং এই ছ'টি প্রহরীর রক্ষণাবেক্ষণ-কল্পে বুড়ীর আঙিনার পশু-পক্ষিদের সংখ্যাও ক্রমে

ন্যূন হ'তে ন্যূনতর হ'তে লাগলো। যাই হোক্ গ্রীন্‌স্কী স্তক্‌-এর স্মৃতি আমাদের মনে চিরদিন সজীব থাকবে। এখানে যে ক'টা দিন কাটানো গেল, তাতে যুদ্ধের কথা আমরা একেবারে ভুলে গেলাম। কখনো কখনো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে দু' এক ঝাঁক বোমারু উড়ে যায় বটে, তবে বোমার শব্দ ধারে-কাছে কোথাও শোনা যায় না। মনে হয় যেন আমরা গ্রামে ছুটি কাটাতে এসেছি। যুদ্ধ যে চলেছে তার খবর পাই পাশের একটা গ্রামে রাদিও-যন্ত্র থাকার জন্যে। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা পালা করে' পাশের গ্রাম থেকে খবর নিয়ে আসি।

একদিন মাত্র ভারশৌএর রাদিও-কেন্দ্র থেকে খবর পাওয়া গিয়েছিল, ভারশৌ তখনো লড়ছে, এবং আত্মসমর্পণ করার আগে আত্মবিসর্জন দেবার জন্যে পোলদেশের রাজধানী বদ্ধপরিকর হয়েছে। এর পরে ভারশৌ থেকে আর কোনো খবর নেই। তার পরিবর্তে জার্মানী রাদিও-কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত খবর আসতে লাগলো, ভারশৌ অধিকৃত হয়েছে। এবং দেশের সর্বত্র যুদ্ধরত পোলদের লক্ষ্য করে' রণে ভঙ্গ দেবার জন্যে বারে বারে সতর্কতা-বাণী ও তর্জনী-আস্ফালনও শুনতে পাওয়া গেল। ব্যাপারটা কী হ'লো, বোঝা গেল না। কারণ এধরণের প্রোপাগান্দা জার্মানরা যুদ্ধের গোড়া থেকেই চালিয়ে আসছিল; সুতরাং তাদের বিশ্বাস করা চলে না। তার পর রাদিওর ব্যাটারীটি ফুরিয়ে গেল, এবং পারচেফ্ সহরের কোথাও নতুন ব্যাটারী পাওয়া গেল না। কেউ কেউ অনুমানও করলে যে, ভারশৌ-এর রাদিও-কেন্দ্র বোমার চোটে ভেঙ্গে গেছে, এখন সহরের কাছেই দ্বিতীয় কেন্দ্র, রাশ্চীন্ থেকে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গের সাহায্যে খবর পাঠানো হ'চ্ছে, এবং তা সাধারণ যন্ত্রে ধরা পড়ছে না। একবার লন্ডন থেকে পোলভাষায় খবর পাওয়া গেল এই মর্মে যে, শোনা যাচ্ছে ভারশৌ আত্ম-সমর্পণ করেছে। তা যদি সত্য হয় ত অতিশয় আফ্‌শোষের বিষয় ইত্যাদি

ইত্যাদি। মিত্র-শক্তি পোলদেশের রাজধানী অধিকৃত হওয়ায় ইঙ্গস্থান ও ফ্রাঁস্ জার্মানীর ওপর চড়াও হয়েছে কি না, সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ শোনা গেল না। সুতরাং এও জার্মানদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রোপাগান্দা ভেবে আমরা সে সংবাদকে হাসির তোড়ে নস্যাৎ দিলাম। যাই হোক্, ভারশোঁএ কী হ'লো না হ'লো, এবং সমগ্র পোলদেশের অবস্থা কী, তা প্রদেশের লোক জানতে পারলে না। এবং আমরাও পরম শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলাম।

একদিন এক রহস্যময় ঘটনা ঘটলো। গভীর রাতে বুড়ীর রন্ধনশালায় আগুনের ধারটিতে বসে' নানা খোশগল্প করছি, এমন সময়ে দূরে কামানের গোলার মত আওয়াজ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা-জান্‌লাগুলো ঝন্‌ঝন্ করে' উঠলো। একটু পরেই পাশের বাড়ীর একটি বুড়ী এসে আমাদের শরণাপন্ন হ'লো। তাদের বাড়ীতে কে একজন ষণ্ডামার্কা-গোছের লোক এসে আশ্রয় নিয়েছে। তার দুষমনী চেহারা দেখে মনে হয়, সে নিশ্চয়ই জার্মানী গুপ্তচর। সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গোলাঘরে শুতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর একেবারে জান্‌লার নীচে বার তিনেক গুলি ঝাড়ার শব্দ শোনা গেল। আমরা ভূতের গল্প করছিলাম, সুতরাং এধরণের অলৌকিক সংবাদ আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করলাম, এবং তৎক্ষণাৎ পাশের বাড়ীতে গিয়ে নিদ্রিত লোকটিকে ঘুম থেকে টেনে তুলে তুম্বী-হুম্বী করে' হাস্যাস্পদ হ'লাম মাত্র।

পরের দিন সকালে খোঁজ পাওয়া গেল, গতরাত্রের শব্দটা মাইনের। স্নীন্‌স্কী স্তক্ থেকে মাইল চারেক দূরে যেখানে সরু নদীটা একটু চওড়া হয়ে একটা প্রকাণ্ড জলায় এসে পড়েছে সেইখানে তার বাঁধটাকে জার্মান-দের আগমনের প্রতিরোধ করবার জন্যে সে অঞ্চলে যুদ্ধ রত পোল সৈন্যরা মাইন্ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। দু'ক্রোশ অন্তর থেকে তার শব্দ আমাদের

বাড়ীটাকে ভূমিকম্পের দোলানির মত বার কয়েক দুলিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক্, সঙ্গে সঙ্গে আরো খবর পাওয়া গেল, পাশের মাঠ আর খানা-ডোবায় এত মাছ এসে ঢুকেছে যে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা সবাই নিষ্কর্মা, সুতরাং মাছ ধরার স্পোর্ট্‌-এর লোভ সামলানো গেল না। খবর পাওয়ামাত্র সেখানে গিয়ে হাজির হ'লাম।

সেদিন একসঙ্গে যত মাছ দেখেছিলাম, তত মাছ বোধ হয় জীবনে দেখা ঘটে' ওঠে নি। প্রকাণ্ড একটা মাঠের ওপর দিয়ে, পথের ওপর দিয়ে, অল্প জলে কোনো রকমে কানে হেঁটে, চলেছে হাজার রকমের হাজার আকারের মাছ। বেশীর ভাগই বড় বড় রুই ও কাতলা জাতীয়, ওজনে এক একটা প্রায় পাঁচ-সাত সের হবে। এত মাছ যে ধরবার লোক হ'চ্ছে না। আশপাশের সবগুলো গাঁয়ের মানুষ, ছেলে-বুড়ো ধামা-চেঙারী নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। মাঠে নেমে সুধু হাত দিয়ে বড় বড় মাছের কান পাকড়ে ঝুড়ি বোঝাই করা। সবাই তাই করছে, আমরাও এক একজন এক একটা মাছের কান পাকড়ে ধরলাম। এধরণের মাছধরা হয়তো সৌখান ধীবরদের স্বপ্নে কখনো কখনো "আকাঙ্ক্ষা-পূর্তি" হিসেবে ঘটে' উঠেছে। কিন্তু বাস্তব জগতে, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, কখনো সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না। যাই হোক্, ইউরোপের নদী, হ্রদ বা পুষ্করিণীতে মাছ ধরতে গিয়ে ফেরবার পথে জেলেদের কাছ থেকে মাছ কিনে এনে বন্ধু-পরিচিতদের কাছে যে মুখ বাঁচাতে হয়েছিল বহুবার, সেই বিড়ম্বনার জন্যে সেদিন মৎস্যকুলের ওপর আশ মিটিয়ে শোধ তোলা গেল।

বুড়ীর বাড়ীতে বেশীদিন থাকা চললো না; একদিন বিকেলের দিকে এই ক্ষুদ্রতম জনপদটির ওপর এক ঝাঁক কালো কালো হাল্‌কা উড়োজাহাজ এসে হাজির হ'লো। এবং আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টিতে

ধারে-কাছের চাষার কুটীর, খড়ের গাদা ও শস্যাগারে আগুন লাগিয়ে দিলে। বোমা-বর্ষণের শব্দে বুড়ীর বাড়ীখানা কাঁপতে লাগলো, এবং বুড়ীও নতজানু হয়ে চেঁস্তোহোভার মারীয়া-দেবীর কাছে আপন সংসারের নিরাপত্তা কামনা করতে বসলো।

গ্রীন্‌স্কী স্তক্-এ এই প্রথম আক্রমণ। সুতরাং গ্রামের লোক পাগলের মত যাবতীয় অস্থাবর-সম্পত্তি কুটীরের বাইরে টেনে এনে মাঠ বোঝাই করতে লাগলো। জামা-কাপড়, বিছানা-মাদুর, যা হাতের কাছে পেলে তাই। সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ এদের কাছে পালক-ঠাসা লেপ আর বালিশ, যা না থাকলে এই নিদারুণ শীতের দেশে প্রাণ বাঁচানো মুস্কিল। সুতরাং এদেশে চাষাদের মধ্যে যাদের যত বেশী পালকের লেপ আর বালিশ থাকে তারাই তত বেশী অবস্থাপন্ন বলে' গণ্য হয়। এমন কি মেয়ের বিয়ের যৌতুকেও এরা দেয় গাদা গাদা লেপ আর বালিশ। বুড়ীর বাড়ীতে এই সম্পদটির অপ্রতুলতা ছিল না। মারীয়া-দেবীর এই ছ'টি খাস্ প্রহরী বুড়ীর লেপ আর বালিশ বয়ে' এনে মাঠে হাজির করতে লাগলো। মনে আছে, লেপ আর বালিশ ফুরতে চায় না। তারপর পোষাক-আশাক, গাল্‌চে-সতরঞ্চি, হাতে বোনা পুরু পশমের নক্সা-কাটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্বল, সব আমরা ঘর থেকে টেনে এনে মাঠের ওপর হাজির করলাম। এবং বোমারুদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে তার ওপর মাঠের শুকনো লাউ-কুমড়োর গাছ, বাঁধাকোপির পাতা আর শুকনো ঘাস দিয়ে ঢেকে কামুফ্লাঝ্ করা গেল। বুড়ী মারীয়া-দেবীর অনুচর ক'টির কর্ম্মকুশলতা লক্ষ্য করে' সজল-নেত্রে আমাদের বারে বারে ধন্যবাদ জানালে। সত্যিই দেখা গেল, শিক্ষার অভাবে বিপদের সময় মানুষ কী পরিমাণে অপটু ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। আমরা না থাকলে, হয়তো বুড়ীর বাড়ী ঘরদোর সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। পুড়তো বুড়ীর লেপ আর বালিশের গাদা, পুড়তো আস্তাবল-

ভরা ঘোড়া, গোয়াল-ভরা গরু, পুড়তো শেকলে-বাঁধা বিশ্বস্ত কুকুর, এবং বুড়ী আর তার দুই ছেলে আর বউ, সবাই মিলে হতবুদ্ধি হয়ে আগুন নিবতে গিয়ে একসঙ্গে পুড়ে মরতো। চেঁস্তোহোভার মারীয়ার দয়াতেই হোক্ আর স্রেফ্ ভাগ্যের জোরেই হোক্, বুড়ীর বাড়ীতে আগুন না লাগলেও খুব কাছেই বেশ বড় একটা চাষার কুটীর ও শস্যাগার চোখের নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গ্রামে কেন যে দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার কারণ সেদিন স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম। এর মূলে সুধু অশিক্ষা-জনিত গ্রামবাসিদের কর্মতৎপরতার অভাব।

এতক্ষণ যুদ্ধের দিকে তাকাবার অবসর হয় নি। এইবার দেখা গেল, আকাশে এক অদ্ভুত স্পোর্ট্ চলেছে। খান ছয়েক হাল্কা বোমারু ছোট একখানা বার্তাবহ উড়োজাহাজকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে' তাকে লক্ষ্য করে' বোমা আর কল-বন্দুকের গুলি ছুড়ছে। কিন্তু ঐ বাচ্চা জাহাজখানা তাদের এমনভাবে আশ কাটিয়ে, পাশ কাটিয়ে, গোঁৎ খেয়ে, লাট মেরে এড়িয়ে চলেছে যে, আক্রমণকারীদের রাগ বাড়লেও তারা তার কিছুই করতে পারছে না। অনেকক্ষণ ধরে' এইধরণের লুকোচুরীর খেলা চললো। তার পর হঠাৎ দেখা গেল, দাউ দাউ করে' কোথায় আগুন জলে' উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট জাহাজখানা ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে একটা জঙ্গলের ধারে মাটিতে এসে পড়লো। বোমারুগুলো ঘোর গর্জনে দিগন্ত কাঁপিয়ে আমাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে চলে' গেল। এইবার সত্যিই বিশ্বাস করতে হ'লো, রুশীরাও পোলদের ওপর চড়াও হয়েছে, কারণ স্পষ্ট চোখে পড়লো, বোমারুদের তলায় আঁকা লালরঙের বড় বড় তারা।

কিছুক্ষণ পরেই বাচ্চা জাহাজখানা হুস্ করে' মাটি ছেড়ে উঠে পড়ে' অন্যদিকে চলে' গেল। দেখলাম বার্তাবহ বিমানখানা পোলদের।

ব্যাপারটা এইবার বোঝা গেল। এই জাহাজখানা পূব দিক থেকে কোনো মূল্যবান খবর নিয়ে আসছিল। তাকে দেখতে পেয়ে রুশীরা তাকে আক্রমণ করে। খানিকক্ষণ আত্মরক্ষা করার পর যখন সে দেখলে বনের ধারে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে, তখন সে এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়লো যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি তার নিজের দেহেই আগুন লেগেছে। যাই হোক্, রুশীরা যখন ধোঁকা খেয়ে ফিরে গেল, তখন আর তাকে পায় কে? একটু পরেই দেখা গেল, পাশের বড় গ্রামখানা যেখানে আমরা রাদিও শুনতে যেতাম, সেখানে হুহু করে' আগুন জ্বলছে। বোঝা গেল, রুশীরা ফেরবার পথে সেখানেও অগ্নিবৃষ্টি করে' গেছে।

এইবার আমাদের সমস্যাটা বাস্তবিকই জটিল হয়ে উঠলো। রুশিয়া জার্মানীর সঙ্গে পোলদেশের বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করেছিল, তদনুসারে সমগ্র পূর্ব অঞ্চল দখল করতে প্রবৃত্ত হ'লো। আক্রমণের অছিলা পোলদেশবাসী উক্রাইনীদের স্বার্থ-রক্ষা। ত্রি-চতুর্থাংশ উক্রাইনাটাই সাভিয়েৎদের অধীনে, এবং আজ প্রায় বিশ বছর আগে তা রুশীদের দ্বারা পুনরধিকৃত হওয়ায় উক্রাইনীরা তাদের বিরুদ্ধে বরাবর বিদ্রোহই করে' আসছে। তত্রাচ সেই উক্রাইনীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যে পোল-রুশ অনাক্রমণের চুক্তি অগ্রাহ্য করে' সাভিয়েৎরা পোলদেশের ওপর হাম্‌লা করলে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তারা আক্রমণ করবার আগে মস্কোএ পোল রাষ্ট্রপ্রতিনিধিকে সে সম্বন্ধে নোটিস্ দিয়েছিল। যাই হোক্, শোনা গেল, রুশীরা হুহু করে' পূর্বাঞ্চল অধিকার করছে। কেউ কেউ বললে, কয়েকদিন আগেই ল্‌ভুফ্ দখল করা হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের যাত্রা আপাততঃ দক্ষিণে ও পূর্বে নাস্তি। কারণ সে অঞ্চলে পোলরা যা সামান্য সৈন্য মোতায়েন রেখেছিল, তারা মরিয়া হয়ে লড়ছে। কাজেই সে দিকে এখন রণ-সীমান্ত ভেদ করে' যাবার উপায় নেই।

এখন কথা হ'লো, আমরা এই ছ'টি প্রাণী করি কী? বিকেলে বৃদ্ধার রন্ধনশালায় মুখোমুখি বসে' আমরা বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। আলোচনার সার মর্ম এই ঃ

রুশদের আক্রমণের প্রসাদে আমাদের পূব বা দক্ষিণ দিক দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা অসম্ভব। কারণ রুশীদের প্ররোচনায় উক্রাইনী চাষারা সেদিকে ভীষণ লুট-তরাজ সুরু করে' দিয়েছে। তাছাড়া সে অঞ্চলে যুদ্ধ চলেছে। শোনা গেল, রোমানিয়াও পলাতকদের জন্যে তার সীমান্ত বন্ধ করে' দিয়েছে। সুতরাং রণ-সীমান্ত পার হয়ে আরো শ চারেক মাইল হেঁটে যদি কোনোদিন রোমানিয়ার দ্বারদেশে পৌছন যায়ও ত সে দেশে প্রবেশ করতে পারা যাবে কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কারণ পথে অনেকের কাছে শুনেছি, তারা গাড়ী করে' রোমানীয় সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়েও বিফল-মনোরথ হয়ে এখন পদব্রজে ভারশৌএর দিকে চলেছে। যাই হোক্, এখন গ্রীন্স্বী স্তক্ বা এই অঞ্চলে কিছুদিন থাকা চলবে কি না? বহু তর্ক-বিতর্কে স্থির হ'লো, না। তার প্রধান কারণ, এখানে যখন আক্রমণ সুরু হয়েছে, তখন এখানে মিছে বসে' থাকা সুবিবেচনার কাজ হবে না। দ্বিতীয়তঃ, এখানে কতদিন কাটাতে হবে তারও স্থিরতা নেই, এবং আমাদের সঙ্গে যে অর্থ আছে তা চিরকালের জন্যে নয়। উপরন্তু আমাদের সকলেরই পরিধানে গ্রীষ্মকালের হালকা পোষাক। তা দিয়ে এদিককার প্রচণ্ড শীত কাটানো অসম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ, যদি রুশীরা এ অঞ্চল অধিকার করে ত আমরা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এখানে আটক পড়বো, কারণ স্বয়ং রুশদেশ নিজে পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে এসে পড়লেও সত্যিকার রুশদেশে প্রবেশ-লাভের অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহের বিষয়। যেকোনো অধিকৃত দেশ থেকে বার হওয়া যে দুরূহ, তা চেকোস্লোভাকিয়া-প্রবাসী কয়েকটী পোল

বন্ধুর বিবৃতিতে জানা ছিল। পক্ষান্তরে আশা হ'লো, ভারশৌ হয়তো এখনও আত্মরক্ষা করছে, এবং জার্মানী যদি সত্যিই পশ্চিম থেকে আক্রান্ত হ'য়ে থাকে ত সে বেশীদিন পোলদেশকে অবরুদ্ধ করে' রাখতে পারবে না। সুতরাং কে জানে, হয়তো আমরা আবার স্বাধীন পোলদেশে গিয়ে পৌছবো !

নানা দিক ভেবে চিন্তে স্থির করা গেল, সবাই যখন ভারশৌএ ফিরছে, তখন আমরাই বা মিছে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাই কেন ? পোলদেশ থেকে বেরুবার উপায় থাকলে তিন চার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত পৌছতেও আমরা পশ্চাৎপদ হ'তাম না। কিন্তু সে সম্ভাবনা যখন নেই তখন আপাততঃ ভারশৌএ ফেরাই যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, সেবিষয়ে আমরা সকলে একমত হ'লাম।

এর দু'একদিন আগে কিছু কিছু বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, কাজেই আস্তে আস্তে শীত পড়ে' আসছে। কবে ভারশৌএ পৌছন যাবে তারও কোনো স্থিরতা নেই। সুতরাং কিছু গরম কাপড় ও অন্ততঃ একজোড়া মজবুত জুতো কেনবার জন্যে আমরা সেদিন বিকেলেই পার্‌চেফ্ সহরে ধাওয়া করলাম। জার্মানরা পার্‌চেফ্ সহরের অনেক অংশই ভেঙ্গে, জালিয়ে দিয়েছে। তার ওপর আজ রুশীয়াও তার কম ক্ষতি করে নি। তবুও সহরে মানুষ ধরে না। পলাতকের দল ক্রমাগত সহরের ভেতর দিয়ে চলেছে। কেউ কেউ সেখানে দু'একদিন বাস করে' পথ-শ্রান্তি দূর করছে। যাই হোক্, যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা তা সফল হ'লো না। যুদ্ধের আগে থেকেই ইহুদীরা সকল প্রকার আহার্য্য ও নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্র লুকিয়ে রেখেছে, একদিন শতগুণ লাভ করবার আশায়। গরম মোজা বা গেঞ্জী ইত্যাদি পাওয়া অসম্ভব। অনেক খুঁজে একজোড়া উট্‌কো মুচীব তৈরী কেটো চামড়ার জুতো মিললো বটে, তবে ইহুদী মুচী

সুবিধা দেখে তার দাম চাইলে পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে তখনো আমরা অভ্যস্ত হই নি। সুতরাং শুধু হাতেই গ্রীন্‌স্থী স্তক্-এ ফিরতে হ'লো।

সেই রাত্রেই আমরা ভারশৌএর দিকে যাত্রা করবো, স্থির হ'লো। মালপত্র আগে থেকেই গোছানো ছিল। বুড়ী আমাদের যাওয়ার কথা শুনে হাউ হাউ করে' কাঁদে। বলে, আমরা চলে' গেলে নিশ্চয়ই তার বাড়ীর অকল্যাণ হবে। কত মানুষের মনে যে কত রকমেরই বিশ্বাস অনড়ভাবে শিকড় গাড়ে তা বলা শক্ত। শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমরা যে চেঁস্তোহোভার মারীয়া-প্রেরিত প্রহরী সে বিশ্বাস বুড়ীর অটল রইল। যাই হোক্, যাবার আগে প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজনে আমাদের যাত্রাকাল বেশ কয়েক ঘন্টা পোছিয়ে গেল। যাবার সময়েও বুড়ী আমাদের খাবারের থলী মোটা মোটা বালিশের মত রুটি আর গোটা কুড়ি করে' সেদ্ধ ডিমে ভরে' দিলে।

তখনো শুক্ল-পক্ষ চলেছে, রাতে হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হবে না। প্রায় এগারোটার সময় মোট-ঘাট নিয়ে আমরা আবার পথে বেরুলাম। চাঁদের আলোয় কুটীরের প্রবেশদ্বারের কাছে বুড়ীর অস্পষ্ট মূর্তি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গেল।

অনিশ্চিতের পথে।

গ্রীন্‌স্তী স্তক্ থেকে বেরিয়ে একটা ছোট সাঁকো পার হয়ে আমরা পাশের যে গ্রামখানায় আগুন লেগেছিল তারই ভেতর দিয়ে কংস্ক্‌ যাবার বড় রাস্তা ধরলাম। তখন আগুন নিবে গেছে, গ্রামবাসিদের কর্ম-তৎপরতায় ক্ষতি খুব অল্পই হয়েছে, শোনা গেল। কয়েক দিন আগে যেখানে বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সেইখান দিয়ে আমাদের পথ। কিন্তু বেশীদূর এগুনো গেল না। কয়েক মাইল ব্যাপী এক বিরাট পোল বাহিনী ভারশো লক্ষ্য করে' চলেছে। অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতিকে পথ ছেয়ে ফেলেছে। এরা পূব দিকে লড়ছিল, সেদিকে জার্মানদের হারিয়ে দিয়ে এই বিজয়ী পোল সেনা ভারশো রক্ষা করতে চলেছে। সামনেই ভাঙ্গা বাঁধ, কাজেই সেখান দিয়ে অতি কষ্টে অল্প অল্প সৈন্য সন্তর্পণে পুলের ভগ্নাবশেষের ধার দিয়ে কোনো রকমে ওপারে গিয়ে উঠছে। পেছনের সৈন্যরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে' অপেক্ষা করছে, এবং সময় কাটাবার জন্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সমস্বরে গান ধরেছে।

আমাদের এই অসামরিক দলটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে একটি অফিসার ঘোড়ার ওপর থেকে আমাদের থামতে বললে।

এত রাত্তিরে কোথায় ?

দেখতেই পাচ্ছেন, পথে।

কোন্ দিকে যাবেন ?

ভারশৌএর দিকে।

আপনাদের পাস্‌পর্ত্ দেখান।

পাস্‌পর্তে আমার পরিচয় পেয়ে অফিসারটি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে' একটি সামরিক সেলাম করে' আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পানিয়ে প্রফেসঝে, আপনি আমায় চেনেন না, এবং আমি আপনার ছাত্রও নই যদিও আমি ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি। আপনাকে দূর থেকে দেখেছি। আজ আলাপ হ'লো।

আপনি কী পড়েন ?

আইন। ভারশৌএ চলেছেন, কিন্তু ভারশৌএর খবর কিছু জানেন ? বলুন না, পানিয়ে প্রফেসঝে। আমরা আজ পনেরো দিন ধরে' ক্রমাগত চলছি, এক ফ্রণ্ট্ থেকে আর এক ফ্রণ্টে। এই ক'দিন ভারশৌএর খবর আমরা একটুও পাই নি।

আমরাও জানি না। তবে দিন কতক আগে অবধি ভারশৌ-এর রাদিও থেকে খবর পাওয়া গিয়েছিল। তখন তারা দস্তুরমত লড়ছে।

সত্যি ! ক'দিন আগে ?

দিন চার পাঁচ।

তা হ'লে আর ভাবনা নেই। আমরা "হলেরা"দের ভুষ্টিনাশ করে' দেব। একবার গিয়ে পৌছতে পারলে হয় !

ছাত্র অফিসারটির মত ওঅঞ্চলে কেউই জানে না, ভারশৌএর এতদিনে কী অবস্থা হয়েছে ; যারা শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত পাত করে' সমানে লড়ে' স্থানে স্থানে জয়লাভ করেছে, তারাও না। জার্মানদের পঞ্চম থাম্বা সমগ্র

পোলদেশের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে সৈন্যদলের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে' দিয়েচে। দেখা গেল, এই পঞ্চম খাম্বার কার্য্যকলাপ এমন নির্ভুল এবং নির্ঘাত যে, তাতে কোন জায়গায় এক শ গজ তারও আস্ত নেই। এই পঞ্চম খাম্বা যদি পোল সেনার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের পথ বন্ধ করে' না দিত, এবং যদি অসামরিক বা সৈনিকের বেশে সৈন্যদলের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গতিবিধির কথা যথাস্থানে রাদিও-যোগে না পৌছে দিতে পারতো, তা হ'লে অন্ততঃ প্রদেশে জার্মানদের পক্ষে জয়লাভ করা সহজ হ'তো না। কারণ, গ্রামে গ্রামে যেখানে যেখানে সামনা-সামনি যুদ্ধ হয়েছে, সেখানে উপযুক্ত সেনা মোতায়েন থাকলে পোলেরা বরাবরই জার্মানদের হটিয়ে দিয়েছে। সহরে যেমন ওপর থেকে বোমা ফেলে ব্লিৎসী কায়দায় তুড়ী মেরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, গ্রামে সে সুবিধা নেই। কারণ বোমার চোটে পথে-ঘাটে বড় বড় ডোবা খুঁড়ে' বা চাষার বাড়ী ঘরদোর ধ্বংস করলেও তাতে লড়াকুদের নৈতিক মেরুদণ্ড বা "মরাল" দুমড়ে ভেঙ্গে দেওয়া যায় না। জমী দখল করতে গেলে চাই কামান, ট্যাঙ্ক্ হাতিয়ার, সঙ্গীন। পোলদের যথেষ্ট ট্যাঙ্ক্ না থাকলেও তারা কামান ছুড়তে এবং হাতিয়ার ধরতে অদ্বিতীয়।

যাই হোক্, ছাত্র অফিসারটির কৃপায় অল্প অল্প করে' এগিয়ে আমরা পুলের ওপারে গিয়ে হাজির হ'লাম। রাত তখন বেশ গভীর হয়ে এসেছে। আশেপাশে দু'এক ঘর চাষার বাড়ীতে তখনও মিট্ মিট্ করে আলো জ্বলছে। চারিদিক ঘিরে ছোট ছোট বন, একপাশে বিস্তীর্ণ হ্রদের মত জলা-ভূমি, তার মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা মাথার সমান ঘাস বা কাশের বন, দূর থেকে ছোট ছোট দ্বীপের মত দেখায়, আর এই নিয়ত চলমান বিরাট সৈন্য-বাহিনী। চাঁদের আলোয় এই যে দৃশ্য সেদিন দেখবার

সুযোগ ঘটেছিল তা আমার মনে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে গেছে। সামরিক জীবনের মাদকতা সেদিন প্রথম উপলব্ধি করি। মনে হয়েছিল, অর্থহীন, অসংলগ্ন ঘটনা-পরিপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের পরিস্রুত সার আস্বাদন করবার সৌভাগ্য যদি কারো ঘটে ত সে সৈনিকদের। সৈনিকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের কদমে কদম ফেলে, তাদের গানের সুরে সুর মিলিয়ে, তাদেরই আশা ও আকাঙ্খায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সারা রাত সামনের অফুরন্ত পথ ধরে' উন্মত্তের মত চলতে লাগলাম।

শেষ রাত্রির দিকে একটা ছোট সহরের ভেতর দিয়ে আমাদের পথ পড়লো। কিছুদূর যাবার পর আর এক দিক থেকে এক বিপুল অশ্বারোহী বাহিনী এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হ'লো। বোঝা গেল, ধারে-কাছেই কোথাও যুদ্ধের সূচনা হ'চ্ছে। সেরাত্রে যে অশ্বারোহী সেনা চোখে পড়লো তার তুলনা হয়তো কোনো দিন আমার অভিজ্ঞতায় মিলবে না। ট্যাঙ্ক ও আমার্ড্-কারের দৌলতে বর্তমান যুদ্ধেই অশ্বারোহীর তাৎপর্য্য ক্ষীণতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে হয়তো অশ্বারোহী সেনা মাত্র ঐতিহাসিক, চিত্তাকর্ষক সামগ্রী বলে' গণ্য হবে। কিন্তু যখন দেখি, ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে চলেছে সাদা আর বাদামী রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়া, পরস্পরের সঙ্গে কদমে কদম মিলিয়ে, পথ-চলায় উত্তেজিত, মদ-মত্ত; আর তাদের পাশে পাশে লাগাম ধরে' পায়ের "কুশ-বেড়ী" ঝন্‌ঝনিয়ে চলেছে দীর্ঘাকার, স্বাস্থ্যবান্ সওয়ার, তখন ভাবি ক্ষাত্র ধর্ম্মের প্রতীক এই অশ্বারোহী সেনার রেওয়াজ যেদিন পৃথিবী থেকে উঠে যাবে, সেদিন মানুষ সুধু আপন জঘন্য স্বার্থের জন্যে পরস্পরকে যান্ত্রিক রবত্-এর মত ধ্বংস করে' চলবে, আজ এই বর্তমান যুদ্ধে যা ক্রমেই প্রতীয়মান হ'চ্ছে।

চেঙ্গীস্ খাঁর ঘোড়-সওয়ারী সেনা যখন এই ইউরোপেরই পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ অধিকার করেছিল, তখন সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র যাযাবর-জাতির

আদিম জয়-পিপাসা। মধ্য যুগের শার্লমাঞ্ ও রোলাঁর অভিযানও সেই একই অনুপ্রাণতায় প্রণোদিত। এমন কি একশ বছর আগে নাপোলেঁঅঁ যে প্রায় সারা ইউরোপকে পদানত করেছিলেন, তার মূলেও দস্যুবৃত্তি ছিল না, ছিল নিছক দিগ্‌বিজয়-লালসা। তখন অশ্বারোহী সেনার কদর ও মর্য্যদা ছিল সবার ওপরে। ক্ষত্রিয়ের জাত পোলরাও আপন সামরিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখে গড়ে' তুলেছিল বিশাল ও জগতের সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনা। পক্ষান্তরে জার্মানরা বানিয়েছিল হাজারে হাজারে চলমান "রবত্"-ঈ লোহার কেল্লা, ট্যাঙ্ক্ আর আর্মার্ড্-কার। যুদ্ধের হিসেবে স্পষ্ট দেখি—

পোলপক্ষে—৮ অশ্বারোহী ব্রিগেড্, ১ মোটার ব্রিগেড্।

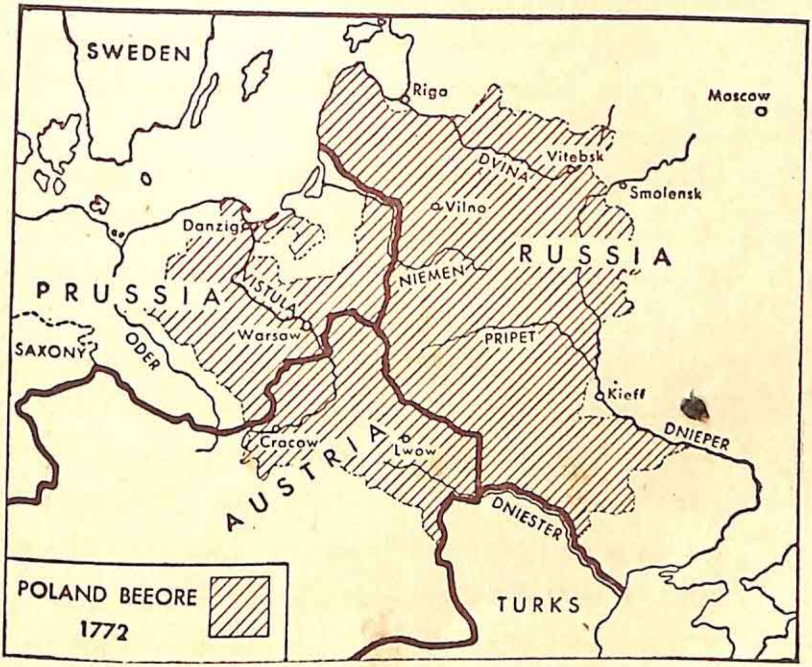
জার্মানপক্ষে—১ অশ্বারোহী ব্রিগেড্, ১৫ মোটার ও আর্মার্ড্ ডিভিশন্।

সৈনিক হিসেবেও যে পোলীয় অশ্বারোহীরা সর্বোৎকৃষ্ট তা প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে। এই শত শত সৈনিকদের একটিরও চেহারা ছ'ফুট, সাড়ে ছ'ফুটের কম নয়, বীরের সব ক'টি লক্ষণ এদের দেহে বিরাজমান। এই প্রকাণ্ড বাহিনীর তত্বাবধান-রত জেনারেলকে স্বচক্ষে দেখলাম। তাঁর নাম মনে নেই। এঁর মত দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ শরীর আমি খুব অল্পই দেখেছি। এক কথায় পোল সেনার জীব-উপকরণ অর্থাৎ মানুষ ও ঘোড়া সে রাত্রে যা প্রত্যক্ষ করলাম, তাতে যে যন্ত্রের কাছে মানুষ হার মানতে পারে, তা উপলব্ধি করে' রীতিমত গ্লানি বোধ হ'তে লাগলো।

সারারাত সৈনিকদের সঙ্গে উন্মত্তের মত পথ চলে' ভোরের দিকে পথের ধারেই একটা গাঁয়ে আশ্রয় খুঁজতে হ'লো। কিছুদুর গিয়েই আশ্রয় মিললো ছোট একটি চাষার কুটীরে। বেঁটে-খাটো গোছের লোকটি আকিঞ্চন করে' আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর কম্বল পেতে শোবার জায়গা করে' দিলে। তখন বেশ শীত পড়ে' আসছে,

সুতরাং পালকের লেপের ওমে আমরা বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে সারাদিন ধরে' শোনা গেল, ধারে-কাছে, মাথার ওপর দিয়ে ক্রমাগত উড়োজাহাজ চলেছে। জান্‌লা দিয়ে কখনো কখনো তাদের চেহারা নজরে আসে, ছোট ছোট কালো রঙের, লাল তারা বা হাতুড়ী-কাস্তে আঁকা বল্‌শেভিক্‌দের বোমারু।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙ্গলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষার বউ বাটি বাটি দুধ, রুটি আর অল্প ডিম এনে হাজির করলে। সেদিন রবিবার, চাষার ক্ষেতের কাজের ছুটি। কিন্তু সে অল্প কাঁচি আর ক্ষুর ধরতে শিখেছে, কাজেই রবিবার এক বোতল জল আর ক্ষৌরকার্য্যের যন্ত্রপাতি নিয়ে সে সৈনিক আর পথিকদের কামিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে এনেছে। এবং সন্দেহ হ'লো, পথে সে তার শুঁড়ি বন্ধুকে সেলাম জানিয়ে আসতেও ভোলে নি। এইবার তার চেহারাটা ভালো করে' দেখবার সুযোগ হ'লো। অন্তরে হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সে লোক খুব ভালো। কিন্তু তার শরীরে যেন বেশ খানিকটা জন্তুর রক্ত আছে বলে' মনে হয়। তার মুখের প্রকাশ যেমন ভালো মানুষের মত তেমনি তাতে এক অন্ধ জান্তব হিংস্র প্রবৃত্তি স্পষ্ট চোখে পড়ে। আল্‌কহলের উত্তেজনায় তার প্রতিবেশীর সঙ্গে কী একটা পুরাণো তক্‌রারের কথা হঠাৎ মনে পড়ে' গেল। এবং সে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রকাণ্ড একটা খুঁটি নিয়ে প্রাচীনকালের নগর বা কেল্লার দুয়ারভাঙ্গা মেষ-মস্তকের মত চক্রবাল রেখায় তুলে ধরে' দুদ্দাড় করে' প্রতিবেশীর জান্‌লার সব ক'খানি শার্শী ভেঙ্গে চুরমার করে' দিলে। তার এই খামখেয়ালীপনার মৃদু প্রতিবাদ করাতে এবার তার রাগ পড়লো তার অন্তঃসত্বা স্ত্রী বেচারীর উপর। আমরা না থাকলে হয়তো সে সেদিন বেচারীকে খুন করে' ফেলতো। তাকে ধরে' বসিয়ে অনেকক্ষণ বোঝাবার পর সে একেবারে জল হ'য়ে গেল, এবং



অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পোলদেশের রূপ। এই মানচিত্রে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোলদেশের চূড়ান্ত অংশীকরণও দেখানো হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে আপন কুকার্য্যের জন্যে গভীর অনুতাপে হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগলো। পরে সে পরম খ্রীষ্টানের মত প্রতিবেশীর কাছে মাফ্ চেয়ে এলো ও স্ত্রীর মান-ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হ'লো। এই খামখেয়ালী জীবের সঙ্গে রাত কাটানো নিরাপদ নয়। কিন্তু তার স্ত্রীর কাছে যখন তার স্বভাব সম্বন্ধে আশ্বাস পাওয়া গেল তখন সেখানেই আমরা রাত কাটানো স্থির করলাম। গ্রীন্‌স্থী স্তকে বুড়ীর আশ্রয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আমাদের চলবার ক্ষমতা একেবারে কমে' গেছে।

পরের দিন সকালে আবার আমরা পথে বেরুলাম। ভোর থেকেই বল্‌শেভিক্‌রা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কাজেই বড় রাস্তা ছেড়ে সোজা মাঠের ওপর দিয়ে চলতে হ'লো। মাঠের ওপর দিয়েও ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু-বিমান উড়ে চলেছে। আমরা বার কয়েক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আস্তে আস্তে সাহস সঞ্চয় করলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখা গেল, রুশীরা আমাদের ওপর গোলা-গুলি কিছুই বর্ষণ করলে না। এখন থেকে লক্ষ্য করলাম, তারা জার্মানদের মত থামকা যার তার প্রাণবধ করে' যায় না। বোঝা গেল, তারা শুধু ধারে-কাছে কোথাও সৈন্য লুকিয়ে আছে কি না, তাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করছে। সুতরাং আমরা নির্ভয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। সাম্‌নে একটা ছোট নদী পড়লো। ডোঙায় নদী পার হয়ে আমরা কৎস্ক্‌-এর দিকে চলতে লাগলাম। কিন্তু খানিকদুর গিয়েই শোনা গেল, কৎস্ক্‌-এর কাছেই ভীষণ যুদ্ধের তোড়জোড় চলেছে। সে দিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। এবার সত্যিই আমরা হতবুদ্ধি হয়ে একটা খালি চাষার বাড়ীর দাওয়ায় বসে' ভাবতে লাগলাম, কী করা উচিৎ।

গ্রামখানা খুব ছোট, তার ওপর এ অঞ্চলে যুদ্ধ সুরু হওয়াতে গ্রামবাসীরা অনেকেই বাড়ী ঘরদোর ছেড়ে চলে' গেছে। আঙিনায় সুধু একটা ক্ষুধার্ত কুকুর চারিদিকে শুঁকে শুঁকে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

গ্রীন্‌গ্নী স্তক্ থেকে আনা আমাদের সঙ্গে খানিকটা মাংস ও দু'তিন হাত লম্বা একছড়া করে' সসেজ ছিল। একটু মাংস কুকুরটাকে দিতেই সে দিব্যি আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললে। পরিত্যক্ত চাষার বাড়ী থেকে বেরুবার সময়ে সেও আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরী হ'লো। পরিব্রাজকের জীবনে কুকুরটা সঙ্গে থাকলে হয়তো তাকে নিয়ে অনেকটা পথকষ্টের লাঘব হ'তো। কিন্তু চারিদিকে যে অন্নকষ্ট তাতে আমাদের নিজেদেরই আহার্য্য জোটানো দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাকে একরকম জোর করে' বেড়ার ভেতর পূরে দিয়ে, আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গন্তব্যস্থল নিরূপণ করবার জন্যে সেখান থেকে আবার কৎস্ক্-এর দিকে চলতে সুরু করলাম। কিন্তু গ্রাম পার হওয়াও হয়ে উঠলো না। হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে খুব কাছেই কামান দাগার শব্দ সুরু হ'লো। এবং চারিদিকে বনের ধারে ধারে কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠছে, দেখা গেল। দু'পা যেতে না যেতেই দেখলাম, মাথার ওপর দিয়ে পরম আনন্দে শিস্ দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তাল তাল গোলা দু'দিক থেকে উড়ে চলেছে। আমরা গত্যন্তর না দেখে মাঠের ওপর মাটি আঁকড়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। এবং শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম, একটু দূরে দূরে ফ্লাস্ক্-এর মত ছোট ছোট গোলাগুলো মাঠের ওপর এসে পড়ে' সশব্দে ফেটে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। বড় বড় গোলাগুলো মাথার ওপর দিয়ে উড়ে কতদূরে গিয়ে পড়ছে তার হদিস্ পাওয়া যায় না।

খানিকক্ষণ পরে গোলাবর্ষণ যখন বেশ একটু ধরে' এলো, তখন মাঠের ওদিক থেকে একটি চাষা হন্ হন্ করে' হেঁটে আসছে, দেখা গেল। আমাদের দেখে দূর থেকে সে কী একটা দেখিয়ে আনন্দে চীৎকার করতে করতে আমাদের কাছে ছুটে এলো। তার কাছে শোনা গেল, কাছেই

জার্মানরা পোল গোলন্দাজ আর অশ্বারোহীদের কাছে বেধকড় প্রহার খেয়েছে। বলতে বলতে সে হাতের চামড়ার থলীটা আমাদের চোখের সাম্‌নে মেলে ধরলে। দেখলাম তাতে মৌচাকের মত সর্বত্র ছিদ্র। চাষার কাছে শুনলাম, এই চামড়ার থলীটা একটি জার্মান সৈনিকের। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে চড়ে' জার্মানরা ক্ষেতখামার থেঁৎলে, বুনো হাতীর মত চাষাদের কুঁড়ে ভেঙ্গেচুরে তছ্‌নছ করে' দিয়ে পোল সেনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে পোলী অশ্বারোহী সেনা চারিদিক থেকে তাদের আক্রমণ করে। ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে জার্মানরা গুলির চোটে অশ্বারোহীদের সারি সারি ধান-কাটা করে' দিয়েছে। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে যারা ট্যাঙ্ক্‌গুলোর কাছে গিয়ে পড়েছে তারা পেট্রোল দিয়ে ট্যাঙ্ক্‌গুলোতে চোখের নিমেষে আগুন লাগিয়ে দিলে। জার্মানরা বেশীর ভাগই ট্যাঙ্কের ভেতর জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। যারা পালাতে চেষ্টা করেছে তাদের গুলির চোটে সর্বাঙ্গ ছিদ্র করে' দেওয়া হয়েছে। নিদর্শনস্বরূপ চামড়ার থলীটা চাষা আবার আমাদের চোখের সুমুখে মেলে ধরলে। এ ধরণের বীরত্ব যে পরশু রাত্রের অশ্বারোহী সেনার দ্বারাই সম্ভব, তাতে সন্দেহ নেই।

চাষাকে আমাদের গন্তব্যপথ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞেস করলাম। তার দাঁড়াবার সময় নেই। সমস্ত গ্রামবাসীদের তার চোখে-দেখা যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়ে শতছিদ্র চামড়ার থলীটা দেখাবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে সে কৎস্ক্‌-মুখো যেতে বারণ করে' বলে' দিলে, যেন আমরা ডান দিকে যাই। সেখানে পোল সেনা ঘাঁটি বানিয়েছে বটে, তবে পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মাঠ ভেঙ্গে বন পার হ'য়ে আমরা খানিকটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। একটু দূরে বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছে, তার ওধারে গ্রাম।

জনমানবের চিহ্ন নজরে পড়ে না, স্থুধু দূরে বনের ধার থেকে এখনো কামানের গোলার কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া আকাশে উঠে আস্তে আস্তে মেঘের আকার ধারণ করছে। হঠাৎ এই নির্জন প্রান্তরে চীৎকার করে' কে যেন আমাদের থামতে বললে। চীৎকার শুনি অথচ মানুষ দেখা যায় না। আমরা স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে দেখা গেল, দূরে খড়ের গাদার ভেতর থেকে একজন সৈনিক সঙ্গীন উঁচিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার উর্দি দেখে আশ্বস্ত হলাম, সেটি পোল সৈনিক। সে কাছে এসে আমাদের পাস্‌পর্ত্‌ পরীক্ষা করে' জানিয়ে দিলে, আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে' যাই। পাশের এই গ্রামখানিতে সৈন্যের ঘাঁটি বানানো হয়েছে, এবং এখানে ভীষণ যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা। জার্মানরাও খুব কাছেই বনটার ভেতর ঘাঁটি বেঁধেছে।

সত্যিকার রণ-সীমান্তে সম্মুখ যুদ্ধটা কীভাবে হয় তা দেখবার শত ইচ্ছা থাকলেও আমাদের ভাগ্যে তা ঘটে' উঠলো না। সামরিক কর্তৃপক্ষীয়দের আদেশে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে' যেতে হ'লো। তবে যেতে যেতে যেসব জিনিষ চোখে পড়লো তাতে ফ্রন্ট্‌ সম্বন্ধে সামান্য ধারণা হ'লো। গ্রামে ঢোকবার আগে থেকে দেখলাম মাঠের ওপর দিয়ে টেলিফোনের তার চালানো হয়েছে বরাবর। আন্দাজে বোঝা গেল, সেনাধ্যক্ষের ঘাঁটি থেকে রণ-সীমান্তে হুকুম পাঠাবার জন্যে এই টেলিফোন্‌ পাতা হয়েছে। পরে গ্রাম ছাড়িয়ে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত মাঠের ওপর দিয়ে টেলিফোনের তার দেখেছিলাম। অর্থাৎ ধারে-কাছে অন্যান্য সেনার ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। এ তার নষ্ট করা পঞ্চম বাহিনীর সাধ্য নয়, কারণ সর্বত্র প্রহরী রাখা হয়েছে। গ্রামের ভেতর বড় বড় গাছগুলোর সঙ্গে দমকলের মইয়ের মত বড় বড় মই লাগানো হয়েছে, এবং গাছে গাছে সঙ্গীন নিয়ে একজন করে' প্রহরী

দূরবীণ দিয়ে চারিদিকের শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। গ্রামের ভেতর এর বেশী কিছু নজরে পড়ে না, তবে সারা গ্রামখানার ওপর গভীর বিষাদের ছায়া পড়েছে। গ্রামবাসীরা প্রাণপণে দেশপ্রীতির খাতিরে সৈনিকদের সেবা করছে বটে, কিন্তু তারা হয়তো এই পোল সেনার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এ আশঙ্কা তাদের মনে যে জাগছে না, তা তাদের দেখে বোধ হয় না। ছেলে-বুড়ো সবার মুখেই দেখি, ভারী একটা বিষণ্ণ, নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। যেন তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মরণের প্রতীক্ষা করছে।

এই গ্রামটি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ইতিহাস শোনা গেল। হপ্তাখানেক আগে জার্মানরা এসে গ্রামখানাকে দখল করে, তার দিন তিনেক পরে এলো রুশীরা। গত দু'দিন ধরে' গ্রামখানায় আবার পোলীয় পতাকা উড়ছে। এ ধরণের পারম্পর্য্য এর পরে প্রায়ই ঘটতে দেখেছি। একটি গ্রাম বা সহর দু'একদিন জার্মানদের অধিকার আসে তার পর রুশীদের, তার পর আবার পোলদের হাতে ফিরে আসে।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে দেখলাম চারিদিকের মাঠে স্থানে স্থানে সৈন্যরা ঘাঁটি বেঁধেছে। তাদের দূর থেকে দেখে মনে হয়, দাবা-বড়ের ঘুঁটির মত করে' এই দলগুলিকে সাজানো হয়েছে। ঠিক কীভাবে তাদের সাজানো হয়েছে তা হয়তো আকাশ থেকে দেখা সম্ভব হ'তো। মাটি থেকে সুধু একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল মাত্র। জানি না, একেই ব্যূহরচনা করা বলে কি না। যাই হোক্, দেখে মনে হ'লো, এদিক দিয়ে জার্মানরা গেলে তাদের ফাঁদে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ গ্রাম ছেড়ে কোন্ দিকে যাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই। পথে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে' পরামর্শ পাওয়া গেল, আমরা যেখানে এসে পড়েছি সেখান থেকে একমাত্র লুকুফ্ লক্ষ্য করে' যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

বিশেষতঃ আমরা যখন ভারশৌএই ফিরতে চাই তখন এ পথ ধরে' যাওয়াই ভালো। অবশ্য লূকুফ্ রুশীরা অধিকার করেছে। তবে ভারশৌএর পথে লূকুফ্‌কে পাশ কাটিয়ে জঙ্গল দিয়েও যাওয়া চলতে পারে।

পথ চলতে চলতে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে। সুতরাং আবার রাত্রির মত আশ্রয় খুঁজতে হ'লো। এই অনিশ্চিত যাত্রায় আর পথ চলার উৎসাহ পাই না। এ অঞ্চলে অনেক গ্রাম জার্মানরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। কাজেই আশ্রয় পাওয়া দুরূহ হ'লো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক জায়গায় মাথা গোঁজবার জায়গা পাওয়া গেল বটে, তবে আহার্য্য সম্বন্ধে একেবারে হাল ছেড়ে দিতে হ'লো। খানিকটা শুক্‌নো রুটি গলাধঃকরণ করে' কোনো রকমে রাত কাটানো গেল। ঘুম হ'লো না, কারণ সারা রাত ধরে' সে পথ দিয়ে দলে দলে সৈন্য চলতে লাগলো। এবং সারারাত ধরে' তাদের জল দিতে দিতে আমাদের আশ্রয়দাতা চাষা বেচারীরও চোখেপাতায় করা হয়ে উঠলো না! সকাল হ'তে না হ'তেই দিগন্ত কাঁপিয়ে কামান দাগার শব্দ পাওয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা আতঙ্কিত হয়ে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে গরু বা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে কিংবা ঠেলা গাড়ীতে করে' গ্রাম ছেড়ে চললো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গ্রাম ছেড়ে বার হ'লাম।

সারাদিন ধরে' আমরা পথ চলি, আর আমাদের পেছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে সারাদিন ধরে' কামানের গর্জন শুনি। হাওয়া-বন্দরের পান্ ম— কামানের আগুনের চমক আর শব্দের অনুপাত কষে' অনুমান করলেন, সেগুলো আমাদের কাছ থেকে বড় জোর মাইল সাত আট দূরে ছোড়া হ'চ্ছে। প্রায়ই দেখতে পাই, মাথার ওপর দিয়ে শিস্ দিতে দিতে গোলাগুলো উল্কার মত ছুটে দিক্‌চক্রবালে উধাও হয়ে যায়। এ অবস্থায় মাঠে শুয়ে থাকাও যা আর মরিয়া হয়ে পথ চলাও তাই। কপালে মৃত্যু লেখা থাকলে যে কেউ খণ্ডাতে পারবে না, এই ধরণের একটা

কাজ-চালানো কিস্‌মেতী দার্শনিকবাদে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় কী ?

খানিকদূর যেতে যেতে আবার জার্মানী-উড়োজাহাজের প্রকোপ সুরু হ'লো। ধারে-কাছে অনেকগুলি বন পাওয়া গেল। সুতরাং সেখান দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে কিছুদূর যাওয়া গেল বটে, কিন্তু বন ছাড়িয়েই আবার যে কে সেই। এক্ষেত্রে সাহসে ভর করে' চলা ছাড়া গতি নেই। এইবার পান ম—র মাথায় এক বুদ্ধি জোগালো। তাঁর পরামর্শে আমরা বন থেকে কয়েকটা বড় বড় ডাল ভেঙ্গে নিয়ে সেগুলোকে মাথার ওপর ছাতার মত করে' ধরে' চলতে লাগলাম। দেখা গেল, এধরণের কামুফ্লাঝ্‌ যথার্থই কার্য্যকর। পথ বা মাঠ দিয়ে চলতে চলতে দূর থেকে উড়োজাহাজ দেখলেই আমরা মাল-পত্র নামিয়ে চট্‌ করে' বসে' পড়ে' মাথার ওপর ডালপালা মেলে ধরি। জার্মানরা আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না, সটান সাম্‌নের দিকে চলে' যায়। অর্থাৎ বোঝা গেল, ওপর থেকে আমাদের সুধু একসারি চারা গাছ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। উড়োজাহাজগুলো চোখের আড়াল হ'লেই এই গাছগুলি আবার ডাকিনী-চালানো গাছের মত হু হু করে' পথ চলতে থাকে।

এমনি করে' আমরা দিনের পর দিন লক্ষ্যহীনভাবে দূরত্ব অতিক্রম করি। কিন্তু ঠিক কোন্‌দিকে যে চলেছি, তার হদিস্‌ পাই না। যেদিকে শত্রুর আঘ্রাণ পাওয়া যায়, সেদিক ছেড়ে তার উল্টো দিকের পথ ধরি। আবার সেদিকে যখন জার্মানদের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়, তখন আবার আর একদিক লক্ষ্য করে' চলতে হয়। মোটকথা, আমরাও তখন সম্পূর্ণরূপে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। কারণ আপাততঃ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, পৈত্রিক প্রাণটা কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখা। চারিদিকে

যুদ্ধ চলেছে, এবং আমরা এই যুদ্ধের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে' ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছি।

পথে যা কিছু চোখে পড়ে, সবই মামুলি, গা-সওয়া ঘটনা। সেই একঘেয়ে বোমারুদের অত্যাচার। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হ'চ্ছে আর শত শত পথ-চলা মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। একবার একটা ছোট গ্রাম কী ভাবে ধ্বংস হ'লো তা প্রত্যক্ষ করলাম। পোলী চাষারা অসহায়ভাবে মার খেয়ে খেয়ে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে। পড়ে' পড়ে' মার খাওয়া পোলীয় চাষাদের কুষ্টিতে লেখে না। তাই ক্ষেতে কাজ করতে করতে একবার একটি চাষা একখানা বোমারু লক্ষ্য করে' হাতের প্রকাণ্ড খন্তাখানা ছুড়ে দিলে। কিন্তু সেটা তৎক্ষণাৎ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিতে একেবারে বুমেরাং-এর মত তারই ক্ষেতে ফিরে এলো। কিন্তু তার এই অপমান-সূচক ব্যবহার বোমারুর চোখ এড়াতে পারলে না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজখানা খুব নীচু হয়ে এসে চাষাকে ত মারলেই, উপরন্তু অবিরাম বোমা-বর্ষণে গ্রামখানাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে' দিলে।

এবার পথ চলতে চলতে একটি বিশেষ লক্ষণীয় জিনিষ নজরে এলো। কয়েক সপ্তাহ আগে যেসব ভাগ্যবানেরা দুর্ভাগাদের হাড়গোড় ভেঙ্গে, গায়ে কাদা ছিটিয়ে, মোটার হাঁকিয়ে সীমান্তের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, তাঁদেরও কিছুদূর যাওয়ার পর ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটেছিল। মানুষ না খেয়ে পথ চলতে পারে, কিন্তু মোটার যে পেট্রোল না পেলে এক'পা চলবে না, একথা না জানে কে? পথে ভাগ্যবানদের তেল ফুরলো, এবং যেখানে এসে মোটার থামলো সেইখানেই সে মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কেউ কিছুদূর পেট্রোলের বদলে কড়া ভূদকা দিয়ে গাড়ী হাঁকালেন বটে, কিন্তু তার পর আবার যে কে সেই! পথের ধারে অচল মোটারে ঘর-সংসার পেতে বসা যায় না, বিশেষতঃ যখন জার্মানরা তাড়া করেছে।

সুতরাং শোনা গেল, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ভালো ভালো মোটারের বদলে দু'একখানা ভাঙ্গা সাইক্ল নিয়ে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করেছেন। কেউ কেউ তাও না পেয়ে নিরুপায় হয়ে গাড়ী ছেড়ে পদব্রজে টহল দিয়েছেন, আমাদের মত। যাই হোক্, ফেরবার পথে দেখি, দূর দূর গাঁয়ের ভেতর পথের ধারে বা চাষাদের আঙিনায় উৎকৃষ্ট মোটার-যান। বেশীর ভাগই অধুনা চাষাদের সম্পত্তি; দস্তুরমত লেখাপড়া করে' নিয়ে তবে তারা মোটারের পরিবর্তে সাইক্ল্ দিয়েছে। তবে এখন এই কলের গাড়ীগুলো নিয়ে কী করা যায়, সেইটেই সমস্যা। গদীগুলো তাদের বাড়ীর তোষক-বালিশরূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। কাঠামখানায় হাঁস-মুর্গীদের খোপ করা যেতে পারবে। এমন কি ঘোড়া জুতে গাড়ীখানাকেও যে কাজে লাগাতে পারা যাবে না, তা নয়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন গভীর রাতে ঝড়বাদল মাথায় করে' আমরা একখানা গ্রামে এসে ঢুকলাম। নাম গলম্ব্কি, শোনা গেল, লূকুভের খুব কাছেই। অত রাতে কেউ আশ্রয় দিতে চায় না। বহু খোঁজাখুঁজির পর একটি অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ পরিবারে এই ছ'টি পরিব্রাজকের রাত-কাটাবার মত আশ্রয় মিললো।

গলম্ব্কি চাষাদের গ্রাম হ'লেও এরা প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন শিক্ষিত কিষাণ। যে বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম, সে বাড়ীর মেয়েটি পর্য্যন্ত ভারশৌএ থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে। আমাদের আশ্রয়দাতা পান্ জ—নিতান্ত অমায়িক লোক, তাঁর যে শিক্ষা আছে তাতে তাঁর সঙ্গে সব বিষয়েই সহজ-ভাবে আলোচনা করা চলে। ভারশৌএ ফেরবার আগে যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু পারা যায় সঠিক খবর নেবার জন্যে গলম্ব্কিতে আমরা দিন কয়েক কাটানো ঠিক করলাম। পান্ জ—ও অতিশয় আকিঞ্চন করে' তাঁর বাড়ীতে আমাদের থাকতে অনুরোধ করলেন।

সুতরাং আমরা বৃথা তকল্লুফ্ বা ওজর-আপত্তি না করে' সেখানেই দিন তিনেক কাটিয়ে দিলাম।

এই তিন দিনে এ অঞ্চলের নানা খবর সংগ্রহ করা গেল। পান্ জ—র মুখেও ব্রিতানী রাষ্ট্রদূত-পত্নী সম্বন্ধে যে শোকাবহ সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, তারই পুনরুক্তি শুনলাম। তবে তিনিও বললেন, এ তাঁর শোনা কথা, তিনি নিজ চোখে কিছুই দেখেন নি। কোনো বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে জার্মানী পঞ্চম বাহিনী কর্তৃক এধরণের খবর রটানোও আশ্চর্য্য নয়।

পান্ জ—র মুখে জার্মানদের দ্বারা লুকুফ্ অধিকারের বিবরণও শোনা গেল। জার্মানরা নাকি সহরে ঢুকেই বাড়ী বাড়ী হাজির হয়ে পুরুষদের এনে জড়ো করেছিল নগর-সমবায়-গৃহের সাম্‌নে প্রকাণ্ড খোলা জায়গাটায়। পান্ জ—ও সেদিন কর্মসূত্রে সহরে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাঁকেও পাকড়াও করে' আনা হয়েছিল। পুরুষদের একত্র জড়ো করে' জার্মানরা তাদের মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হুকুম দিলে। এবং তাদের সাম্‌নে দাঁড়ালো এক সারি জর্মান সৈনিক, হাতের কাছে কল-বন্দুক নিয়ে। পোলদের স্রধু যে গুলি করে' মারা হবে তা নয়, তাদের মাটির ওপর সাষ্টাঙ্গ করে' কুকুর-বেড়ালের মত মারা হবে। পান্ জ—র একটু বয়েস হয়েছে। স্থির হয়ে শুয়ে আছেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। তার পর হঠাৎ কে একজন বুটের চোটে তাঁকে ঠেলে তুলে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে—"এই সেই লোকটা?" উত্তর এলো—"হ্যাঁ"। পান্ জ—গলার স্বরে চিনলেন, তাঁরই এক পরিচিত পোলদেশ-প্রবাসী জার্মান যাঁর একদিন তিনি সমূহ উপকার করেছিলেন। এই ভদ্রলোক তাঁকে ভিড়ের মধ্যে চিনতে পেরে জার্মানদের বলে' কয়ে তাঁকে রেহাই পাইয়ে দেন। পান্ জ—বাড়ী ফেরবার পথে ঘন ঘন কল-বন্দুকের গুলি শুনতে পেলেন। পরে শোনা গিয়েছিল, জার্মানরা এই সবক'টি পোল পুরুষকে সেইদিনই

গুলি করে' মেরে ফেলে। তবে আনন্দের বিষয় এইটুকু যে, তারা গুলি ছোড়া হবার ঠিক আগেই উপুড় হয়ে শুয়ে মরা আত্মসম্মানবিরুদ্ধ জ্ঞান করে' সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং গুলির চোটে নিমেষের মধ্যেই তাদের অসাড় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

শুনলাম, লুকুফ্ তিনবার অধিকৃত হয়। একবার জার্মানরা অধিকার করে, তার পর পোলরা, এখন লুকুফ্ রুশীদের হাতে। রুশীদের অত্যাচারের কথা বিশেষ শোনা গেল না। তবে কমুনিজমের ঝাণ্ডা উড়িয়ে ইহুদীরা রুশ-অধিকৃত অংশে নির্বিবাদে রাজত্ব করছে, খবর পেলাম। রুশীরা অবশ্য লুট-তরাজ করছে কিছু কিছু। বিশেষতঃ ঘড়ি, আতর, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং নানা বিলাসের জিনিষের প্রতি রুশী সৈনিকদের দুর্দমনীয় লোভের কথা প্রায়ই শুনি। সঙ্গে সঙ্গে এও শুনি, তারা টাকা দিয়ে লুট করছে। অর্থাৎ তাদের রুব্ল্-এর দাম রুশিয়ার বাইরে প্রায় কিছুই নেই, এবং যে যা জিনিষ নিচ্ছে, তার জন্যে ডাইনে-বাঁয়ে রুব্ল্ ছড়াচ্ছে। যাই হোক, বল্‌শেভিক্‌দের এধরণের ধর্ম্মভীরুতার তারিফ না করে থাকা যায় না, বিশেষতঃ যখন পরে দেখলাম, জার্মানরা স্রেফ্ পেটির পিস্তল দেখিয়ে লুট-তরাজ করছে। রুশীদের সম্বন্ধে একথাও শোনা গেল, যে তারা সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের শাস্তিবিধানের জন্যে প্রজাদের ওপর সদয় জমীদারদের সকল রকম সুবিধা করে' দিচ্ছে, এবং অত্যাচারী জমীদারদের পথের খানার ধারে দাঁড় করিয়ে তৎক্ষণাৎ গুলি করে' মারছে। আরো শুনলাম যে, তারা অধিকৃত অঞ্চলে রেল, পোষ্ট আফিস ও অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের কাজে আহ্বান করে' তাদের আগাম বেতন দিচ্ছে। লুকুফ্ থেকে নাকি ভ্‌ঝেশ্চ্ দিয়ে মস্কৌ পর্য্যন্ত রেল চালানো হ'চ্ছে, এখবরও পাওয়া গেল।

শেষোক্ত সংবাদে আমাদের মনে এক নূতন আশার সঞ্চার হ'লো।

হয়তো শেষে জার্মান-অধিকৃত পোলদেশ থেকে বেরিয়ে পড়া যাবে। কিন্তু ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যার সময় খবর পেলাম, পরের দিন ভোর পাঁচটার সময় রুশীরা লুকুভের অধিকার জার্মানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে' যাবে। শোনা গেল, রুশ ও জার্মানদের মধ্যে আপোষে বন্দোবস্ত হয়েছে, বুগ্ নদীকে সীমানা করে', তারা সমগ্র পোলদেশটা ভাগাভাগি করে' নেবে। এখবর পাওয়ামাত্র আমরা স্বাধীন ভারশৌএ পৌছবার ক্ষীণ আশা বুকে নিয়ে পরের দিন সকালেই গলম্ব্ কি ছেড়ে চললাম।

গ্রাম ছেড়ে বড় রাস্তায় বেরিয়েই দেখা গেল, ব্লিৎস্-গতিতে জার্মানরা মোটার-বাইক্ হাঁকিয়ে চলেছে। জার্মানদের সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো রকমে বড় রাস্তা পার হয়ে আমরা জঙ্গলের পথ ধরলাম। যাবার সময়ে এই জঙ্গলটাই পার হয়েছিলাম বলে' মনে হলো'। কাজেই পথ অল্প অল্প চেনা। জঙ্গলের ভেতর এখনো জায়গায় জায়গায় মাইন্ পোঁতা। খুব সন্তর্পণে চলতে হ'লো। বনের ভেতর এক জায়গায় গাদা গাদা ছোট বড় খাতা ছড়ানো। দু'একখানা তুলে নিয়ে দেখা গেল, সেগুলো সৈনিকদের এক একজনের পরিচয়-পুস্তিকা। কোনো পোল সেনা যুদ্ধে হেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বার সময় খাতাগুলো ফেলে গেছে, যাতে যুদ্ধের পরে জার্মানরা তাদের যুদ্ধে যোগদান করার অজুহাতে গ্রেপ্তার না করতে পারে। কিন্তু যাবার সময়ে বেচারীরা খাতাগুলো নষ্ট করে' দিয়ে যাবারও সময় পায় নি। কাজেই তাদের সামান্য উপকার করবার জন্যে সেগুলোতে আমরাই অগ্নিসংযোগ করলাম।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড মাঠ, তার পাশেই দু'তিন মাইল ধরে' বড়রাস্তা দেখা যায়। আমরা বনের ধারে এসে দেখলাম, বড় রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত আর্মার্ড্ কার আর সৈন্যবাহী বাস্ চলেছে ব্লিৎস্-গতিতে। এই বিশাল সৈন্য খাম্বাটি যে কাদের তা অনুমান করতে কষ্ট হ'লো না।

কাজেই স্থির করা গেল, ওরা চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত বনের ভেতরেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে। কিন্তু আমাদের সে আশায় ছাই পড়লো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে' তারা পথ দিয়ে ক্ষিপ্র-গতিতে মোটার হাঁকিয়ে চললো, আর আমরাও বনের ভেতর আটক পড়লাম। শেষকালে মরিয়া হয়ে খানিকদূর গিয়ে একটা চাষার বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়া গেল। দেখলাম, দূর থেকে জার্মানরা আমাদের দেখতে পেয়েও কিছু বললে না। সুতরাং আশা হ'লো, হয়তো বড় রাস্তা পার হয়ে কোনো রকমে ভারশৌ-এর পথ ধরা যাবে। চাষার বাড়ী থেকে শুনতে পাই, অবিরাম মোটার চলে' যাওয়ার শব্দ। জান্‌লা দিয়ে চোখে পড়ে নানা আকারের নানা ঢঙের ছোট বড় আর্মার্ড্-কার, ট্যাঙ্ক্ আর সৈন্যবাহী বাস্। এইবার নিজ চোখে দেখে হৃদয়ঙ্গম করলাম, ছত্রভঙ্গ পোল-সৈনিকদের মুখে জর্মান বাহিনীর যে বিবরণ শুনেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বাস্তবিকই এই লোহা আর ইস্পাতের সঙ্গে মাংস আর স্নায়ু দিয়ে লড়া সহজ নয়।

চাষার কুঁড়েটিতে জনসমাগম কম হয় নি। সবারই আমাদের মত অবস্থা। প্রথমে মনে হ'লো, এরা সবাই চাষা, কারণ পরণে এদের সবারই ছেঁড়া তালি-দেওয়া পাৎলুন আর শতচ্ছিন্ন কোট। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাদের কথা শুনে আমাদের ভুল ভাঙ্গলো, জানা গেল, এরা সবাই শিক্ষিত ভদ্রলোক, অফিসার। আপন আপন সৈন্যদল ভেঙ্গে যাবার পর সামরিক উর্দি ছেড়ে তাড়াতাড়ি চাষাদের কাছ থেকে এই অসামরিক পোষাক কিনে পরেছেন, যাতে জার্মানরা তাঁদের লড়িয়ে বলে' গ্রেপ্তার না করে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন জার্মানদের থাম্বা শেষ হ'লো না, তখন বেপরোয়া হয়ে তাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হওয়া স্থির করা গেল। কিন্তু তাদের কাছে যেতে যেতে বার কয়েক কামান দাগার শব্দ পাওয়া গেল। এবং একটি আধা-ভদ্রলোক গোছের চাষা এসে বললে,

যেন আমরা না এগোই। একটু আগেই সে ঝোপের আড়াল থেকে দেখেছে, একদল পথ-চলা পোলদের জার্মানরা পাকড়াও করে' নিয়ে চলে' গেল। আগেই শুনেছিলাম, জার্মানরা পথে-ঘাটে পোলদের ধরে' নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়ে বেগার খাটাবার জন্যে জার্মানী চালান করছে। সুতরাং লোকটির কথায় অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। সে আগ্রহ করে' কাছেই তার মামার বাড়ীতে আমাদের আশ্রয় ঠিক করে' দিলে।

এইখানে দু'দিন কাটাতে হ'লো। এবং এই দু'দিন ধরে' বড় রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত জার্মানদের মোটারের আওয়াজ পাওয়া গেল। সুতরাং জার্মানদের সৈন্যবল সহজেই অনুমেয়। পোলরা যে তাদের পদাতিক, অশ্বারোহী আর চাষাদের মালবাহী ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে জার্মানী ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড্-কার আর বাসের সঙ্গে এতদিন ধরে' সমানে পাল্লা দিচ্ছে, সেইটাই আশ্চর্য্য মনে হ'লো। তবে তাদের যে পরাজয় সুনিশ্চিত, সে বিষয়ে সন্দেহ ক্রমেই কমে' আসতে লাগলো।

এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার আমরা ভারশৌ লক্ষ্য করে' চলতে সুরু করলাম। খানিকদূর গিয়ে জঙ্গল পার হয়ে আবার বড় রাস্তা। পথ জুড়ে আমাদেরই মত পরিব্রাজকের দল চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উর্দি-ছাড়া সৈনিক ও অফিসারও চলেছে হাজারে হাজারে। তারা কেউই জানে না, ভারশৌএর কী অবস্থা হয়েছে। কেউ কেউ চুপি চুপি বলে, ভারশৌ নাকি ২৯শে সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করেছে। তখন অক্টোবরের ৬ কি ৭ তারিখ। তখনো এধরণের "গুজব" শুনে পোলরা বিশ্বাস করতে চায় না, ভারশৌ সত্যিই হার মেনেছে। কারো কারো কাছে শোনা গেল, সমগ্র পোল সরকার নাকি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দেশ ছেড়ে পালিয়ে রোমানিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। স্মীগ্‌ল্যি, বেক্‌, রাষ্ট্রপতি মশ্চীৎস্কি, এরা কেউ দেশে নেই। এধরণের "গুজবের"ও কড়া প্রতিবাদ আসে।

কেউ কেউ বলে, তারা নাকি কয়েকদিন আগেও যুদ্ধ-রত শ্মীগ্‌লি্য সাহেবকে নিজের চোখে দেখেছে। বললেই হ'লো, তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন? ওসব জার্মানদের পঞ্চম থাম্বার কারসাজি! এই ধরণের বাদ-প্রতিবাদ চলে। কিন্তু ভারশৌএর পঞ্চাশ মাইল দূরেও ব্যাপারটা যে আসলে কী দাঁড়িয়েছে, তা কেউ জানে না। এ অঞ্চলের চাষাদের তখনো বিশ্বাস, ইংরেজ ও ফরাসী উড়োজাহাজ পোলদের সাহায্য করতে এলো বলে'!

এমনি করে' চলতে চলতে, একদিন হুহু করে' তুষার নামলো। ভারশৌএর অত কাছে অক্টোবরের গোড়াতেই তুষারপাত বড় একটা ঘটে না। নভেম্বরের আগে তুষারপাত ওদেশে বিরল। ১২ই নভেম্বর মার্টিন্ ঠাকুর সাদা ঘোড়ায় চড়ে' আকাশ থেকে নেমে আসেন পৃথিবীতে, আর তাঁর পেছনে পেছনে আসে তুষারের ঝড়। যতদিন পোলদেশে ছিলাম, প্রতিবৎসর তার একটুও ব্যতিক্রম হয় নি। উনচল্লিশ সালে তার ব্যতিক্রম ঘটলো, ১০ই অক্টোবর সমস্ত পোলদেশ তুষারে ঢেকে গেল। চাষরা মাথা নেড়ে বললে, "দেবতার রাগ এখনো থামে নি, শীতটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি।"

অকস্মাৎ তুষার-পাতে আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে উঠলো। আমাদের পরণে স্নধু গ্রীষ্মকালের হাল্‌কা পোষাক। তদুপরি আমার পদযুগলে সৌখীন হাল্‌কা, হাওয়া খেতে বেরুবার জুতো; তার ওপর দিকে বায়ু-চলাচলের জন্যে অজস্র ছিদ্র। পথে, মাঠে তুষারে পা ঢুকে যায়, তারপর ছিদ্র দিয়ে ঢোকে যেমনি ঠাণ্ডা জল আর তেমনি ঠাণ্ডা হাওয়া। শীতে ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমরা আগের মতই পথ চলি। মনে মনে ভাবি, হয়তো ভাগ্যের দয়ায় ভারশৌএ গিয়ে দেখবো, আমার অ-স্রা-মাটি এখনো ঠিক আছে, এবং তার পর আলমারী খুললেই গণ্ডায়

গণ্ডার গরম কাপড় আর শীতের জুতো! সেগুলো আপাততঃ কাছে না থাকলেও কল্পনায় তার ওমটুকু বেশ উপভোগ করা যায়। তাই সারাক্ষণ রোমের ওভারকোট, টুপি আর দস্তানার কথা কেবলই মনে পড়ে। নিদারুণ শীত যাঁরা কখনো সহ্য করেন নি তাঁদের কাছে কথাগুলো হয়তো হাস্যকর শোনাবে। কিন্তু শীতের দেশে আহার্য্যের চেয়ে উত্তাপ যে কত প্রয়োজনীয়, তা শরীরতত্ত্বের যেকোনো ছাত্রের জানা আছে।

এ দিকের পথ-ঘাট প্রায় সবই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। তবে এখন সব জায়গা ঠিক চেনা যায় না। যাবার সময়ে যেসব সহর, গ্রাম, গণ্ডগ্রামের ভেতর দিয়ে গিয়েছিলাম, ফেরবার সময়ে তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগে ছিল গ্রাম, সেখানে এখন পোড়ো জমী। গ্রাম ছেড়ে সহরের ভেতর দিয়ে চলি। কিছুদিন আগে যেখানে বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল, এখন তার অর্দ্ধ-দগ্ধ কঙ্কাল পড়ে আছে। বাড়ীঘর সব পুড়েছে, সুধু বাড়ীর মাঝখানকার শক্ত গাঁথুনির ধূমনলগুলো আত্মরক্ষা করেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তাদের দেখে প্রায়ই একটা কথা মনে হ'তো। যেন কোন মহামারীতে হাজারে হাজারে লোক মারা গেছে। তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে যেন প্রকাণ্ড একটা মাঠ জুড়ে। হঠাৎ মুষল-ধরে বৃষ্টি। চিতা নিবে গেল। যারা দাহ করতে এসেছিল তারা পালিয়েছে। তেপান্তরের মাঠটায় প্রাণের চিহ্নস্বরূপ একটি ঘাসের পাতা পর্য্যন্ত নেই। হঠাৎ কোন্ পিশাচের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অর্দ্ধ-দগ্ধ শবগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে উঠেছে, যেন কী উপলক্ষে প্রেতের কুচকাওয়াজ হবে। পোড়া-পোড়া ধূমনলের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে গা ছম্ ছম্ করে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলি।*

* লেখকের রাদিও-বক্তৃতায় দৃশ্যটি বিবৃত হয়েছিল।

যেতে যেতে প্রায়ই দেখি, পথের ধারে বা মাঠের ওপর জ্বালানো জার্মানদের ছোট ও বড় আকারের ট্যাঙ্ক্। সুতরাং পোল অশ্বরোহীরা যে জার্মানদের ট্যাঙ্ক্ জ্বালিয়ে দিয়েছে গণ্ডায় গণ্ডায়, তা এবার বিশ্বাস করতেই হ'লো। পোলদের ভাঙ্গা-চোরা ট্যাঙ্ক্, আর্মার্ড্-কার, ছোট ছোট কামান, নদী পার হবার জন্যে নৌকা ইত্যাদি কম চোখে পড়লো না। তবে সেগুলো ভাঙ্গা, দোমড়ানো, ব্যবহারের উপযোগী নয়। বোঝা গেল, পোলরা যাবার আগে তাদের যা কিছু যন্ত্রপাতি সব নষ্ট করে' দিয়ে গেছে, যাতে জার্মানরা তা কাজে লাগাতে না পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য অধ্যবসায় এই জার্মান জাতের! পথ চলতে চলতে দূর থেকে দেখি, জার্মানরা এইসব ভাঙ্গা-চোরা জিনিষগুলোকে অতি সন্তর্পণে কাদা বা পাঁকের ভেতর থেকে টেনে তুলছে। এমনকি তাদের সঙ্গে এইসব ভারী জিনিষগুলো টেনে তুলে লরী বোঝাই করবার জন্যে ছোট ছোট মোটারে চালানো ক্রেন্ পর্য্যন্ত রয়েছে। দেশের যেখানে যেখানে যুদ্ধ থেমে গেছে, এবং যেসব অঞ্চল জার্মানদের হস্তগত হয়েছে, সেইখানে বড় বড় লরী-বোঝাই উদ্ধৃত যুদ্ধের মাল-মসলা পথ দিয়ে হুহু শব্দে চলেছে পশ্চিম দিকে, প্রায়ই নজরে পড়ে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যার দিকে আবার কীচ্‌কিতে ফিরে এলাম। আবার সেই পুরাণো গির্জা, ছোট নদী আর গম-ভাঙ্গা কলের দৃশ্য চোখে পড়লো। আশ্চর্য্যের বিষয়, কীচ্‌কির কোনো ক্ষতি হয় নি। ভারশৌ ছেড়ে যাবার পথে আমাদের সাথীরা যে বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন সেই বাড়ীতেই এসে ওঠা গেল। কীচ্‌কিতে পৌছে প্রথম শোনা গেল, ভারশৌ সত্যিই আত্মসমর্পণ করেছে ২৯শে সেপ্টেম্বর। আর তখন অক্টোবরের ১২ তারিখ। এই প্রায় দু'সপ্তাহকাল আমরা এবং যে যে অঞ্চল দিয়ে এসেছি সেখানকার কেউই সে খবর জানে না।

আমাদের আশ্রয়দাতা নিজেই মাত্র কাল ভারশৌ থেকে ফিরেছে, তার কাছে শোনা গেল, ভারশৌএ ভীষণ দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছে। সহরে একটুক্‌রো রুটি বা একটি আলু নেই। সহরে যদি একান্তই ফিরতে চাই, ত যেন গ্রাম থেকে কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই। পরামর্শটা যত সহজ বলে' মনে হ'লো, তা কার্য্যে পরিণত করা ঠিক সেই পরিমাণে দুরূহ হ'লো। গ্রামে গ্রামে খাদ্যের অনটন আগে থেকেই সুরু হয়েছে। সুতরাং উদরের অন্ন জোটানোই মুস্কিল; পিঠে বইবার জন্যে খাবার চাষাদের কাছে কিনতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তবুও আমরা কীচ্‌কি ছেড়ে গ্রামে গ্রামে কিছু রুটি ও মাংস সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হ'লাম।

অনেক ঘুরে ঘুরে নানা আকারের, নানা প্রকারের বেশ কিছু রুটি সংগ্রহ করা গেল। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ অঞ্চলে কিছু কিছু মাংসও চোখে পড়লো। তার কারণ অনুসন্ধান করতে বেশীদূর যেতে হ'লো না। চাষা ইসারায় পথ দিয়ে ব্লিৎস-গতিতে ধাবমান বড় বড় জার্মানী লরীগুলোর প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে।

ভারশৌএ সুরু হয়েছে বিকট দুর্ভিক্ষ, আর গ্রামে গ্রামে চলেছে জার্মানদের অবাধ লুটপাট। যা সামান্য কিছু আহার্য্য অবশিষ্ট আছে তা চাষারা কুঁড়ের তলায় মাটির নীচের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে—শস্য, আলু, দু'চারটে হাঁস-মুর্গী, শোর, গরু, হয়ত এক ভাঁড় গলানো মাখন, ডজন দু'এক ডিম, এক বস্তা চিনি, কিছু সব্জী এইসব। চাষী বুড়ী ফাঁকে ফাঁকে এক একবার গিয়ে দেখে আসে, তার ভাঁড়ার ঠিক আছে কিনা। ভগবানের করুণায় তার চোখে জল আসে, মা মারীয়ার উদ্দেশে মাথা নোয়ায় গভীর কৃতজ্ঞতায়। তার পর এক দিন নিরালা গ্রামখানা মোটারের ধক্‌ধকানিতে, পেট্রোলের উগ্র গন্ধে, বিজেতা সৈনিকের কুৎসিত কণ্ঠস্বরে অস্থির হয়ে ওঠে। বড় বড় লরী ক্ষেতের কচি গাছগুলোকে পিষে, থেঁৎলে কুটীরের

সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। চলে যথেচ্ছ লুট-তরাজ। চাষী বুড়ীর ভাঁড়ার লরীতে গিয়ে ওঠে। পেছনের লরীখানায় ওঠে খড়, ঘাস, পশুদের যাবতীয় খাদ্য। চাষার লাঙল-টানা ঘোড়াটা চেয়ে থাকে জুলজুল করে'। বুড়ী হাউ হাউ করে' কাঁদে। বিজেতা সৈনিকেরা হো হো করে' হাসে। কেউ বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা পোলভাষায় অভদ্র ব্যঙ্গোক্তি করে। কেউ বা সান্ত্বনা দেয়—"দাঁড়ানা বুড়ী, যুদ্ধ ত খতম হয়ে এলো, এইবার হিট্‌লারের রাজত্বে সব ফিরে পাবি, এর বিশগুণ!" হিজিবিজি লেখা একখানা কাগজের টুক্‌রো তার হাতে দেয়। বুড়ী কাগজখানা সযত্নে তুলে রাখে, হবেওবা, তা না হ'লে তারা খাবে কী? সৈনিকরা জার্মানীর জয় ঘোষণা, জার্মান জাতের মহত্ত্ব, তার মিশনের গুরুত্ব সম্বন্ধীয় গানে আকাশ ফাটিয়ে পাশের গাঁয়ে গিয়ে হাজির হয়। পথে আসতে আসতে এইসব দৃশ্য চোখে পড়ে অহরহ। বড় রাস্তা দিয়ে চলেছে সারি সারি লরী শস্য, আনাজ, পশু, পশু-খাদ্যের ভার নিয়ে, জার্মানী মুখো।*

চাষারা নিরুপায় হয়ে সামান্য অবশিষ্ট আহার্য্য যতটা পারছে নিজেরা খেয়ে শেষ করছে, এবং বাদবাকী তাড়াতাড়ি বিক্রী করে' ফেলছে। জার্মানরা লুটে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে যে দেশের লোক খেতে পাবে, সে সান্ত্বনা বড় কম নয়। তবে কিছুদিন পরে দুর্ভিক্ষের আগুন যখন সহর ছেড়ে দাবানলের মত ব্লিৎস্‌-গতিতে গ্রামে গ্রামে ছড়াতে আরম্ভ করবে, তখন সমগ্র পোল জাতির যে কী অবস্থা হবে, তা ভাববার কারো উপায় নেই। আপাততঃ আমরা পিঠের আধমণ বোঝার ওপর আরো পাঁচ সাত সের রুটি আর মাংস নিয়ে ভারশৌএর দিকে চললাম।

পথে আসতে আসতে প্রায়ই নজরে পড়ে, জার্মানরা সামান্য অছিলায় ষোল থেকে ষাট বছর বয়েসের পুরুষদের মাঠে জড়ো করে' কলবন্দুকের

*লেখকের রাদিও-বক্তৃতায় দৃশ্যটি বিবৃত হয়েছিল।

গুলিতে ধান-কাটা করছে, আর না হয় লরী বোঝাই করে' জার্মানীতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের দিয়ে ক্ষেত-খামারের কাজ করাবার জন্যে। জবরদস্তী মজুরী করাতে হ'লে মানুষের মাথায় শাস্তির বোঝা চাপানোর চেয়ে সহজ উপায় নেই। পোলীয় পুরুষদের অপরাধ, তাদেরই দু'দশজন যুদ্ধের সময় হাতিয়ার ধরেছিল। সে অপরাধে মেয়েদেরও নিস্তার নেই। গাঁয়ের পথ-চলা, অবগুণ্ঠনের মত করে' মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা, অল্পবয়সী, দেখতে শুনতে ভালো মেয়েদেরও ধরা হ'চ্ছে। তাদের কাছ থেকে জবরদস্তা "মজুরী" আদায় করবার কায়দা অবশ্য অন্যরকম! মজুরী আদায় করা হয়ে গেলে জার্মানরা আবার মেয়েটিকে যেখানে সেখানে দূর গাঁয়ের পথে লরী থেকে নামিয়ে দিয়ে যায়। এজাতীয় মজুরীর বিবরণ যা চাষা-ভূষোদের কাছে শুনলাম, তা ভদ্র-সমাজে সঠিকভাবে দেবার আমার সাহস নেই।

আবার আমরা মিন্স্ক্-এর কাছে এসে পড়লাম। বিধ্বস্ত সহর তখন জার্মানদের অধিকারে। শত শত লোক যখন সহরের ভেতর দিয়ে চলেছে ভারশৌএর দিকে, তখন আমরাও সাহস করে' ভিড়ে গা ঢেকে জার্মানদের চোখের সাম্নে দিয়ে তাড়াতাড়ি সহর পার হয়ে গেলাম। এইবার দিনের আলোয় চোখে পড়লো মিন্স্ক-এর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রূপ। সহরের বাড়ী ঘরদোর বেশীর ভাগই চূর্ণ হয়ে গেছে, আর সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে পেট-মোটা জার্মান সৈনিকরা কদর্য্য ভাষায় বিজিত পোলদের উপহাস করছে। পোড়া-মাটি বুট দিয়ে খুঁড়ে বলে, "শ্বাইনের্-হুন্ট্* পোলদের দেশের মাটি দেখেচ?" জার্মানী রসিকের রস-বোধে তার সাথীরা চীৎকার করে' হাসে।

মিন্স্ক্ পার হয়ে ভারশৌএ পৌছতে প্রায় দেড় দিনের পথ। এই

*"শোর-কুকুর", জার্মান ভাষায় গর্হিত কটু-উক্তি।



ভারশৌএর প্রধান রেল-
ষ্টেশনের বিধ্বস্ত রূপ।

দেড় দিনে ক্রমে জার্মানদের লুট-তরাজ আর অত্যাচারের দৃশ্যে চোখ ও মন দু'ই অভ্যস্ত হয়ে আসে। দেশে তখন ভীষণ অরাজকতা চলেছে। শাসন-ব্যবস্থা বলে' কিছুই নেই, বিজেতা জার্মানদের স্রধু বিজিত পোল-দেশে স্ফূর্তি করতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই লুটপাট, অত্যাচার ও চাষার মেয়েদের কাছ থেকে নানা "মজুরী" আদায় করা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজের প্রবৃত্তিও নেই, ফুরসৎও নেই। সৌভাগ্যের বিষয়, পথিকের পাস্‌পর্ত্‌ বা পরিচয়-পত্র প্রভৃতি কিছুই তারা দেখতে চায় না। সুতরাং আমরা দাঁতে দাঁত চেপে তাড়াতাড়ি পথ চলি, যতশীঘ্র পারা যায় ভারশৌএ পৌঁছবার জন্যে। ভারশৌএ পৌঁছে কী হবে, আমাদের জানা নেই। কিন্তু অন্য উপায় কী? পোলদেশ থেকে বার হওয়া যখন আমাদের ভাগ্যে ঘটলো না, তখন আমাদের কর্ত্তব্য দেখা গেল দু'টি। এক, আত্মহত্যা করা, আর দুই, ভারশৌএ ফেরা। এবং আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ, এ নীতি যখন সর্বধর্মসম্মত, তখন দ্বিতীয় কর্তব্যের অনুসরণ করা ছাড়া গতি নেই।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারশৌএ ফেরে শত শত ছত্রভঙ্গ পোল সৈনিক, আহত, ভগ্নস্বাস্থ্য, ছিন্নবস্ত্র। অনেকেরই পেটে খাবার নেই, পায়ে সেই নিদারুণ শীতে জুতো নেই। কেউ কেউ মরিয়া হয়ে চাষাদের চোখের সামনে তাদের আহার্য্য ও পরিধেয় বিনা অনুমতিতে আত্মসাৎ করছে। ক্ষেতের অবশিষ্ট আনাজ তুলে নিয়ে তারা পশুর মত কচ্‌মচিয়ে উদরস্থ করছে। কেউ কেউ হাঁস-মুর্গী যা পাচ্ছে ধরছে। এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, চাষারাও কোনো আপত্তি করছে না। নিক্‌ না, তারা ত দেশের মানুষ। জার্মানরাও ত একদিন জবরদস্তি করে' সব লুটে নেবে। এই ধরণের যুক্তি চাষাদের মুখে প্রায়ই শুনি।

কীচ্‌কি ছাড়বার পরের দিন ভিড়ের মধ্যে আমরা সেই যে আমাদের

সঙ্গীদের কোথায় হারিয়ে ফেললাম, তার পর আর তাঁদের দেখা পাওয়া গেল না। মাসাধিক কাল তাঁদের সঙ্গে সহবাসে, সহ ভোজনে ও সহ-ভ্রমণে (স্থধু তাঁদের সঙ্গে সহ-মরণটা ঘটে' ওঠে নি) যে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে' উঠেছিল, তা হয়তো সামান্য রক্তের টানের চেয়ে ঢের বেশী স্থায়ী। পরস্পরকে সাহায্য করতে গিয়ে আমরা নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছি। অন্ধকার রাতে ভিড়ের ভেতর পথ চলতে চলতে পরস্পরের নাম ধরে' ডেকে যখন সবাই আবার একসঙ্গে মিলিত হয়েছি, তখন উপলব্ধি করেছি, সত্যিকার "বিরাদরী" বা "কামারাদরী" কাকে বলে। পথে একজনের অসুস্থতায় আমরা সবাই একই রকম উদ্বিগ্নতা অনুভব করেছি। কোনো বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আমরা পরস্পরকে অক্ষত দেখে একই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছি। পথের পরিচয় পোষ-মানানো বনের পশু-পক্ষীর মত। কিছুদিনের সহবাসে নিবিড় স্নেহ গড়ে' ওঠে। তার পর গৃহস্থ থাকে গৃহে আর বনের পাখী একদিন বনের পত্র-পল্লবের ভেতর উধাও হয়ে যায়। সুতরাং সাথীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি একদিন হ'তোই, তা দু'দিন আগে আর পরে। তবে খেদ রইল এই যে, তাঁদের কাছে বিদায় নেওয়া হ'লো না।

যাই হোক্, তার পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা ভারশৌএর উপনগরী প্রাগায় এসে পৌছলাম।

যুদ্ধের আগে এই সহরতলীটি হল্‌ফলিয়ে বেড়ে উঠছিল। বড় বড় ইমারৎ, আধুনিকতম স্থাপত্য, সভ্যজগতের জীবনযাত্রার সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় প্রাগা আস্তে আস্তে ভারশৌকেও ছাড়িয়ে উঠছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। চলবার সময় পথ চিনতে পারি না, যেসব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা পথের নিশানা ছিল, সেগুলো স্থধু ইট কাঠের ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্ধকারে দু'একখানা বাড়ী এখনো দাঁড়িয়ে

আছে বলে’ মনে হয়। কিন্তু তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে ভুল বুঝতে পারি, বাইরে থেকে দোর জান্‌লার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, স্থধু বাইরের ঠাট্‌টা কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো কখনো দু’একটা বাড়ীতে মিট্‌মিটে আলো দেখে বোঝা যায়, সেগুলো এখনো বাসোপযোগী আছে। কিন্তু তাতে গৃহস্থদের বাস করবার অধিকার নেই। জার্মানরা সেগুলোকে সৈন্যদের ঘাঁটি বানিয়েছে।

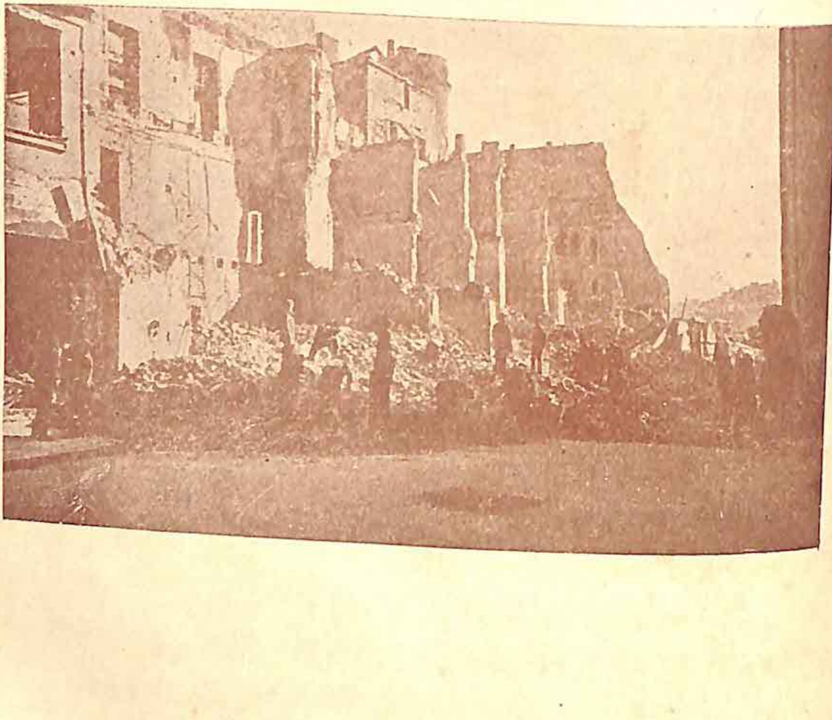
পথে জনমানব নেই। মনে হয় যেন দুঃস্বপ্নে দেখা কী একটা হানা সহরের ভেতর দিয়ে চলেছি দু’জনে। বয়েস যখন কুড়ির নীচে থাকে, তখন যেমন মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখা যায়, প্রিয়জনের হাত ধরে’ কোন্ এক বিপদ-সঙ্কুল পথ ধরে’ জনমানবশূন্য কী একটা হানা সহরের ভেতর দিয়ে চলেছি, বহু বৎসর পরে প্রথম যৌবনের আবেগ-ভরা সেই স্বপ্ন সেদিন সত্য হয়ে উঠলো। কখনো কখনো আধো অন্ধকারে সিগারের আগুনে জার্মান সৈনিকের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইহুদী-বিদ্বেষী হিট্‌লার-যুগেন্দের আলিঙ্গনাবদ্ধ ইহুদী বারাঙ্গনার ভাঙ্গা ভাঙ্গা জার্মান ভাষায় প্রেমালাপ কানে আসে। আমরা পোড়া বাড়ীর আড়ালে আড়ালে চোরের মত পা টিপে টিপে চলি।

পথে একজনের সঙ্গে দেখা, ভারশৌ থেকে গ্রামের দিকে চলেছে পায়ে হেঁটে, কিছু আলু আর গোটাকতক বাঁধাকোপি সংগ্রহ করবার জন্যে। বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য, সহরে খাবার নেই। আমাদের সাবধান করে’ দিলে, যেন সাতটার পরে রাস্তায় না চলি। সন্ধ্যা সাতটার পর পথ চলতে মানা। সাতটার এক মিনিট পরেও পথে দেখলে জার্মানরা নগরবাসীদের গুলি করে’ মারছে। কিছুদূরে গিয়ে দেখা গেল, অন্ধকারে গা ঢেকে কে একজন সাইক্লে চড়ে’ চলেছে। আমাদের দেখে থম্‌কে দাঁড়ালো। তার কাছ দিয়ে যাবার সময়ে শুনলাম একটি মেয়ের গলা,

"বাবা! ভেবেছিলাম, শ্বাব্ ব্যাটারা আসছে বুঝি! বুকটা ধড়াস্ করে' উঠেছিল।" দেখলাম, একটি ভদ্রঘরের মেয়ে, বয়েস বছর তেইশ-চব্বিশ। বহুদিন স্বামীর খবর পান নি। আজ একটু আগে একটি পরিচিত লোক খবর দিয়েছে, তাঁর স্বামী আহত অবস্থায় মিন্স্ক্-এ কাদের বাড়ীতে পড়ে' আছেন। খবর পাওয়া মাত্র এই মেয়েটি নিজের প্রাণসংশয় করে' অন্ধকার পথ দিয়ে সাইক্লে চড়ে' সম্পূর্ণ একাকিনী মিন্স্ক-এ চলেছেন।

সহরে ঢোকবার আগে ভীস্লার ওপর পুল, মস্ত্ ক্যের্বেজ্যা। ভারশৌ ছাড়বার দিনে এখানে যে ধ্বংসলীলা দেখে গিয়েছিলাম, অন্ধকার রাত্রিতে সেসব স্পষ্ট মনে পড়তে লাগলো। দেখলাম, পুলটা ঠিক আছে বটে, তবে তার চারিপাশের বাড়ী ঘরদোর প্রায় কিছুই নেই। পুল পার হয়ে ভারশৌ-এর ভগ্নাবশেষের চিত্র প্রথম চোখে পড়লো।

ভীস্লা-নদীর উপকূলে পোলজাতির, পোল সংস্কৃতির প্রতীক রাজ-দুর্গ চূর্ণ হয়েছে। স্থাপত্যের দিক দিয়ে ভারশৌ-এর দুর্গ পোলজাতির গৌরবের বস্তু ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই দুর্গ তৈরী হয়েছিল। এবং গত সাত শ বছর ধরে' একদিকে যেমন সে বহিঃশত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে' এসেছে, অপর দিকে ইউরোপের নানা বিখ্যাত স্থপতির পরিকল্পনা তাকে শতাব্দীতে শতাব্দীতে সুন্দর হ'তে সুন্দরতর করে' তুলেছিল। যুদ্ধের আগে ভারশৌ-এর দুর্গ ইউরোপের সুষ্ঠু সৌধাবলীর মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করতো। বোমার চোট খেয়ে তার উত্তুঙ্গ মিনার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ছিন্নশির, দগ্ধদেহ দুর্গের প্রতিবেশ-পল্লী প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সন্ধ্যার অন্ধকারে দুর্গ-পল্লীর ভস্মীভূত রূপ শ্মশানের মত হাহাকার করছে। দিদির কাছে কিছুদিন আগেই এখানে আমরা বিদায় নিই। সেদিন যে দৃশ্য চোখ ভরে' দেখে গিয়েছিলাম তার এই সহসা



উলীৎসা ভ্যেরা্‌ভা ও হোতেল
আঙ্গ্যেল্‌স্কি। গ্রন্থকার এইখানে
একবার "আশ্রয়" নিয়েছিলেন।

অপসারণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাবার সাহস পাই না। আমরা মুখ নীচু করে' তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলি, সহরের ভেতর যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া যায়।

কিছুদূর যেতে না যেতেই সাতটা বেজে গেল। পথে একটি মানুষ নেই, রাস্তাঘাটে বা আশে-পাশের যে দু'একখানা বাড়ী আধ-পোড়া অবস্থায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে কোথাও একটু আলোর রশ্মি পর্য্যন্ত নেই। ভাবছি, কোথায় যাওয়া যাবে এবং আরো অগ্রসর হওয়া নিরাপদ কিনা, এমন. সময়ে দূরে অন্ধকার তোলপাড় করে' জার্মান সৈনিকদের ভোঁতা বুটের আওয়াজ এলো। আমরা ছায়ার মত নিঃশব্দে পাশের একটা পোড়া, ভাঙ্গা বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লাম। সেইখানেই রাত কাটাতে হবে। বাড়ীর ভেতর ভিতের তলায়, যেখানে যুদ্ধের সময় হয়তো শত শত লোক এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখান থেকে পোড়া কাঠের ও বিগলিত দেহের উগ্র গন্ধে সারা রাত আমাদের জাগিয়ে রাখলে।*

* লেখকের রাদিও-বক্তৃতায় দৃশ্যটি বিবৃত হয়েছিল।

Kulturkampf.

১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় আমরা জার্মান অধিকৃত ভারশৌএ ফিরে এলাম। পোলদেশের রাজধানী যাকে রক্ষা করবার জন্যে পোলজাতি ধন, প্রাণ, সম্মান সমস্ত পণ করেছিল, তারই দগ্ধপ্রায় সতীদেহ জার্মানদের হাতে এসে পড়েছে। পোলদেশের স্থানে স্থানে তখনো যুদ্ধ চলেছে, এমন কি মিন্স্ক্ দিয়ে ফেরবার পথে খুব কাছেই সারাদিন ধরে' কামানের আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু পোল-জার্মান অস্ত্র-শস্ত্রের সংগ্রাম (যদিও সে সংগ্রাম প্রায়ই জার্মান বোমারু ও নিরস্ত্র পোল অসামরিক স্ত্রী, বৃদ্ধ ও শিশুদের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল) যে ভারশৌ দখল হওয়ার পর শেষ হ'লো, তাতে কারো সন্দেহ রইল না। মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়েরও সমাপ্তি-রেখা এইখানেই।

এইবার সমগ্র পোলদেশে সুরু হ'লো এক নূতন সংগ্রাম যা গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে' জার্মান জাতি তার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে জগতের কাছে ঘোষণা করে' এসেছে। তার গাল-ভরা নাম Kulturkampf বা সংস্কৃতি-সংগ্রাম। জর্মান সংস্কৃতি যে বিশ্বের একটি অন্যতম সংস্কৃতি, একথা অস্বীকার করতে পারে এমন ব্যক্তির যদি সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ত

বুঝতে হবে সে ব্যক্তির শিক্ষা এখনো পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারে নি। অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিন্তাধারায় জার্মান দার্শনিকবৃন্দের অবদান যে কত বড় তা শিক্ষাক্ষেত্রে আপামরসাধারণ সবারই জানা আছে। এবং এই যে জর্মান সংস্কৃতি গত দু' তিন শতাব্দী ধরে' বিশ্ব-মানবকে ক্রমে ক্রমে অনুষিক্ত করে' নব নব চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে, তার জন্যে জার্মান জাতকে কোনো দিন ধস্তা-ধস্তি বা কোস্তা-কুস্তি, করতে হয় নি। জ্ঞানের প্রদীপ, প্রদীপ বলেই তার আলো স্বভাবের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিহত না হ'লে, সর্বত্র আপনা আপনিই বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া জগতের ইতিহাসে স্বীয় বিস্তার লাভের জন্যে কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতি অসিধারণ করেছে, এমন উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানদের হঠাৎ মাথায় ঢুকলো যে, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট, এবং যেহেতু বিশ্বের বাজারে তারা ফরাসী ও ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না, সেই হেতু ডাণ্ডার চোটে আপন পণ্যদ্রব্য ও সংস্কৃতি বিস্তারের অধিকার তাদের জন্মগত। এই ধরণের মনোবৃত্তি যারা পোষণ করতে লাগলো তারাই জগতে গায়ের জোরে জর্মান কৃষ্টি বিতরণ করবার নাম দিলে কুল্‌টুর্‌কাম্‌প্‌ফ্‌।

গত মহাযুদ্ধের কুল্‌টুর্‌কাম্‌প্‌ফ্‌ যে সফলতা লাভ করতে পারে নি, এ দুঃখ বিশ বছর ধরে' সমগ্র জার্মান জাতকে গুম্‌রে গুম্‌রে তুষের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। শ্রীমান্ হিট্‌লারের কেতাব মাইন্ কাম্‌প্‌ফ্‌-এও এই কুল্‌টুর্‌কাম্‌প্‌ফ্‌-এর আভাষ পাই ছত্রে ছত্রে। এতদিন পরে অধিকৃত পোলদেশে জার্মানরা স্ব-কল্পিত জহাদ্ চালাবার সুযোগ পেলে।

যুদ্ধের পর পোলদেশে জার্মানী সংস্কৃতি-সংগ্রামের যে মূর্তি চোখে পড়লো, তারই নিতান্ত যৎসামান্য পরিচয় দিয়ে বর্তমান পুঁথির সমাপ্তি-রেখা টেনে দেবো।

১৫ই অক্টোবর ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম, যে বাড়ীটার ভেতর আমরা রাত্রির আশ্রয় নিয়েছিলাম তার কাঠাম ছাড়া আর কিছু নেই। প্রাচ্যভাষা বিদ্যালয়ে যাবার জন্যে প্রায় প্রতিদিনই আমায় এ পথ দিয়ে যেতে হ'তো। যুদ্ধের আগে এর তলায় নানা দোকানপসার ছিল, এবং সাততলা বাড়ীটাকে একটা ছোট-খাটো সহর বললেও অত্যুক্তি হ'তো না। এখানেই আমার এক সহকর্মী, রুশ সাহিত্যের অধ্যাপক বাস করতেন। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এ বাড়ীটি মাটি থেকে আকাশ পর্য্যন্ত একেবারে ফাঁকা; আগে যে এর প্রতি তলায় অগণিত ফ্ল্যাট্ এবং ওপরে ওঠবার জন্যে চওড়া-চওড়া ধাপ-ওয়ালা সিঁড়ি ছিল, তা এর উপস্থিত রূপ দেখে বিশ্বাস করা যায় না। দেখি, বাইরে স্থধু কাঠামখানা আর ভেতরে পর্বতপ্রমাণ ছাইয়ের গাদা। ভারশৌ অধিকৃত হবার দু'তিন সপ্তাহ পরেও আজ তা দিয়ে গুমে গুমে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। খোঁজ নিয়ে শুনলাম, উক্ত সহকর্মী অধ্যাপক আপন মূল্যবান গ্রন্থাগার বাঁচাতে গিয়ে নিজে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন।

একটু দূরে ভেঙ্গ্যেরক্যেভিচের চায়ের দোকানের অবস্থা চোখে পড়লো। সমস্ত রাস্তা এবং সমস্ত পাড়াটা স্থধু একটা ইট-কাঠ আর ছাইয়ের গাদায় পরিণত হয়েছে। এখান থেকে দু'পা গেলেই প্রাচ্যভাষা বিদ্যালয়। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম দেখতে। এখানেও ঐ দৃশ্য। নাপলেঁঅর প্রেম-বিলাসের স্মৃতি-স্তম্ভ এই প্রাচীন প্রাসাদটির স্থধু বাইরের ঠাটটুকু বজায় আছে। ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই, প্রবেশপথের কাছেই দু'তলার সমান ছাইয়ের গাদা। ঘোড়া-ছোটাবার উপযোগী পুরাণো, চওড়া কাঠের সিঁড়িটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। পোলদেশে প্রাচ্য-বিদ্যা বিষয়ক সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার ছিল এইখানে। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখানেও লক্ষ্য করলাম, তখনো গুমে গুমে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।



উলীৎসা মার্শাল্‌কফ্‌স্কা। ভারশৌএর সর্ব্বপ্রধান রাজপথ অধিক অংশে এই রূপে পরিণত হয়েছে।

যেদিকে তাকাই, দেখি ধ্বংসের নগ্নতা। তার ওপর প্রকৃতি তুষারের প্রচ্ছদ টেনে দিয়ে দৃশ্যের বীভৎসতাকে ঢাকতে চেষ্টা করেছে। যেসমস্ত বাড়ী অন্ধকারে মনে হয়েছিল, আত্মরক্ষা করেছে, তাদের ভেতরটা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, দরজা-জান্‌লা কিছু নেই। তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় চোখের ভুল ধরা পড়ে। সেসব বাড়ী ছিল যেন এক একটা সহর। ফটকের পর ফটক পার হয়ে দৃষ্টি চলে' যায় বহুদূরে, তবুও বাড়ীর শেষ হয় না। ভেতরে দোকানপাট, অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এখন দেখি, দাঁড়িয়ে আছে স্বধু শক্ত ইটে গাঁথা বাড়ীর কাঠামখানা, ভেতরে যতদূর দেখা যায় স্বধু অপ্রতিহত শূন্য, মাঝে মাঝে ছাইয়ের গাদা, ভগ্নস্তূপ। পথে অনেক বন্ধু-পরিচিতদের বাড়ী পড়ে। খবর নেবার জন্যে ফটক পার হয়ে দেখি, ভেতর থেকে বরাবর আকাশ দেখা যায়, মাটির ওপর ছাইয়ের গাদা। হঠাৎ দিদি, তাঁর রুগ্ন স্বামী ও তাঁর বৃদ্ধা মার কথা মনে পড়ে। যদি সেখানেও— এর পর আর ভাবতে সাহস হয় না। পিঠে ছাব্বিশ-সাতাশ সের করে' বোঝা নিয়ে পেছল পথ দিয়ে আমরা দু'জনে পাগলের মত পথ চলি।

দিদির বাড়ী সেখান থেকে অনেক দূর। তুষারের ওপর দিয়ে বোঝার ভারে নুইয়ে পড়ে' চলবার সময় দু'পাশে তাকাতে ভরসা হয় না। সারি সারি বিধ্বস্ত বাড়ী ঘরদোর। পথের ওপরেও জায়গায় জায়গায় ভগ্নস্তূপ। কখনো কখনো চোখে পড়ে, প্রকাণ্ড বিধ্বস্ত বা অর্দ্ধ-দগ্ধ বাড়ীর কাঠাম, তার তলায় জার্মান ভাষায় কাঠের ওপর আলকাতরা দিয়ে লেখা—আখ্‌টুং! সাবধান!—অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে বাড়ীগুলো হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে পারে। সেসব জায়গা এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব। ভারশৌএর পথে লোক ধরে না। এতলোক যুদ্ধের আগেও ভারশৌএ দেখা যেত না। পশ্চিমের জার্মান-অধিকৃত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে

লাখে লাখে পোল ভারশৌএর ভগ্নস্তূপে আশ্রয় খুঁজতে এসেছে। বিধ্বস্ত সহরের ভেতর দিয়ে উন্মত্ত জনতা লক্ষ্যহীনভাবে কেবলই পথ ধরে' চলে, হয়তো কোথাও একটা ভাঙ্গা বাড়ীর তলায় আশ্রয় মিলবে, হয়তো কোনো আত্মীয় বা পরিচিতের কাছে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। তারা পথে পথে ঠিকানা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সে পাড়াকে পাড়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আবার তারা নতুন ঠিকানার খোঁজে ছোটে। ভারশৌএর অধিবাসীরাও চলেছে হন্যে হয়ে খাবার আর জলের খোঁজে। পথে দেখি, সেই রকম বিশৃঙ্খল জনতা যাদের সঙ্গে লক্ষ্যহীনভাবে দিনের পর দিন চলতে হয়েছিল।

এদিকে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলতে আরম্ভ করে একটু একটু করে'। ভাঙ্গা বাড়ীর ভেতরে অল্প অল্প করে' জল ঢোকে গাঁথুনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তার পর পাঁচ-ছ' তলা কাঠামখানা হুদ্দাড় করে' পড়ে রাস্তার জনস্রোতের ওপর। চোখের সামনে এরকম দৃশ্য ঘটলো। কুড়ি পঁচিশ জন এক নিমেষে পিষে ছাতু হয়ে গেল। পথের দু'ধারে এইসব বাড়ীর কঙ্কাল দিনামিত্ না হোক্ এমনকি কামান দেগে বা অন্য কোনো উপায়ে ভূমিসাৎ করবার কোনো ব্যবস্থা নেই। যে অস্ত্র দিয়ে সহরটাকে ভাঙ্গা হ'লো, তাই দিয়েই অবশিষ্ট নগরবাসীদের নিরাপত্তার জন্যে ভাঙ্গা বাড়ীগুলোকে মাটিতে ফেলবার কথা অধিকারীদের মনেও হয় না। কারণ সে ভার প্রকৃতি নিজেই নিয়েছে। বোমার চোটখাওয়া বাড়ীগুলো বাসোপযোগী কি না, সে বিষয়েও কারো মাথা ঘামাবার সময় নেই। অধিকারীরা বড় বড় ক্যান্টীন্ খুলেছেন, সেইখানেই মদ্য-মাংসে ও বারাঙ্গনার প্রেম-বিলাসে তাঁদের সময় কাটছে। শুনতে পাই, ক্যান্টীন্গুলো থেকে নাচের বাজনা আসছে। ভস্মীভূত সহরে স্ফূর্তির খেম্টা বিকট শোনায়।

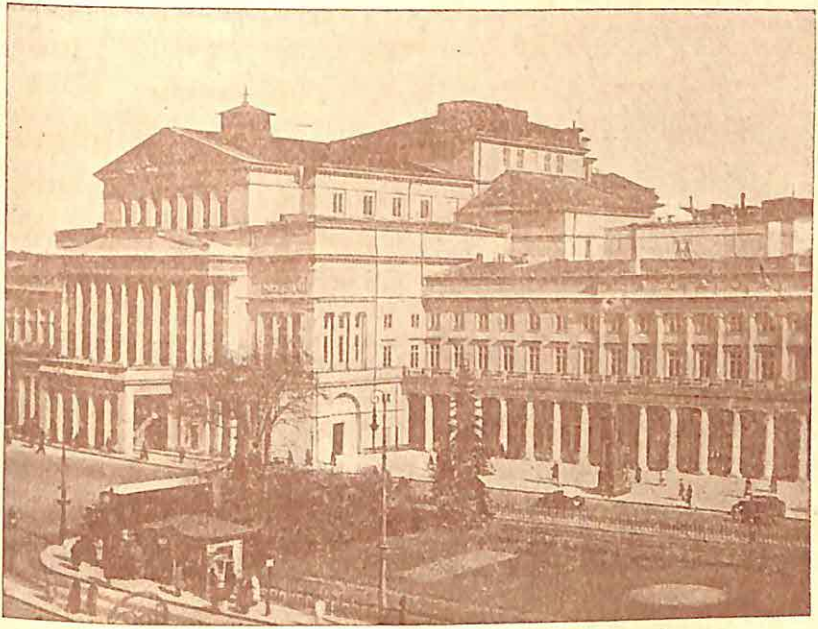
সুধু কর্ত্তব্যপালনের জন্যে ভাঙ্গা বাড়ীগুলোর তলায় আলকাতরা দিয়ে "আখ্‌টুং" লিখে দিয়েই অধিকারীরা খালাস। অথচ এই যে হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ, যাদের মাত্র এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টার নোটিস্ দিয়ে পশ্চিম অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং যারা নিরুপায় হয়ে ভারশৌএ এসে আশ্রয় নিয়েছে, তারা যে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে যেখানে সেখানে মাথা গুঁজবে, এতে আর আশ্চর্য্য কী? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তারা ভাঙ্গা, পোড়া বাড়ীতে আশ্রয় নিলে হাজারে হাজারে। তার পর একদিন বরফ গলবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর কাঠামের গাঁথুনি আলগা হয়ে যায়, নতুন-পাতা সংসার চোখের নিমিষে ভগ্নস্তূপের তলায় মিশিয়ে যায়। দিদির বাড়ী লক্ষ্য করে' যেতে যেতে প্রায়ই শুনি, বোমার মত আওয়াজ হ'চ্ছে চারিদিকে। পথ-চলা মানুষ নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে বলে, আবার কোথায় ভাঙ্গা বাড়ী পড়লো!

উলীৎসা ভ্যেঝ্‌বভা যেখানে একদিন হোতেল আঙ্গ্যেল্‌স্কির ভিতের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেই ভদ্রপল্লীর রাস্তাটার ভেতর দিয়ে আমাদের পথ পড়লো। এপাড়াকে চেনবার উপায় নেই। একমাত্র পররাষ্ট্র-মন্ত্রিত্বের প্রাসাদটি চোট খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছে। এর একটু আগেই ভারশৌএর কেন্দ্রস্থল প্লাৎস্ তেআত্রাল্‌নী, বেশ অনেকখানি খোলা জায়গা। একদিকে নগরসমবায়-ভবন, অপর দিকে প্রকাণ্ড অপেরা-গৃহ, এবং অন্য অন্য দু'একটি নাট্যশালা। নগরসমবায়-ভবনটি বেঁচে গেছে, কিন্তু প্রকাণ্ড অপেরা-গৃহ এবং নাট্যশালা ক'টির ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে সুধু বাইরের কাঠামগুলো। ইউরোপের নাট্যকলায় রুশীয় প্রতিভার সঙ্গে একসঙ্গে পোলীয় প্রতিভার নাম করা যেত। বহু বৎসর অধ্যবসায় ও আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে পোলরা যে অপেরা ও নাট্যকলার কেন্দ্রগুলি গড়ে' তুলেছিল, এবং যা দেশে পরিমার্জিত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি,

সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচি-বিচারের প্রসারণ-কার্য্যে প্রধান সহায়ক ছিল, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে।

একটু দূরে পোলীয় চিত্র-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র জাহেন্তা। বিশ্ববিশ্রুত পোল চিত্র-শিল্পী মাতেইকো, খ্রেমিরাৎস্কি, প্রভৃতির আঁকা নানা চিত্র জাহেন্তার তথা সমগ্র পোলদেশের গৌরবের বস্তু ছিল। সারা জাহেন্তাটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার কাঠামের দোর-জান্‌লা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। অদৃষ্টের পরিহাসেই হোক্, আর জার্মান বৈমানিকদের রস-বোধের প্রসাদেই হোক্, পোল সংস্কৃতির দু'টি বিশেষ অংশ নাট্য ও চিত্র, এ দু'টিই সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে।

জার্মান বৈমানিকরা যে ইচ্ছে করলে এগুলিকে নষ্ট না করতেও পারতো, তার পরিচয় পাই যখন দেখি যে, যে বাড়ীগুলি নিজেদের ব্যবহারের জন্যে তারা আগে থেকেই ঠিক করে' রেখেছিল, যথা পররাষ্ট্র-মন্ত্রিত্ব, সামরিক মন্ত্রিত্ব, ভারশোএর সবচেয়ে বড় পান্থশালা হোতেল এউরোপেইস্কি ইত্যাদি, সেগুলি ছাড়া যে যে বাড়ীগুলো পোল সংস্কৃতি বা ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, সেগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে' দেওয়া হয়েছে। আমাদের পর্য্যবেক্ষণে আরো একটা মজার জিনিষ পড়লো তা এই : জাহেন্তার কাছেই পোলীয় এভাঙ্গেলীয়দের একটা গম্বুজওয়ালা গির্জা ছিল। জার্মানদের সঙ্গে সমধর্মী হওয়াতে তারা মনে করেছিল, এই এভাঙ্গেলীয় পোলরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে বা অন্ততঃ গুপ্তচরের কাজ করবে। বহু বছর ধরে' তাদের ভেতর জার্মানদের নানা প্রোপাগান্দাও চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্তও তারা ধর্মকে দেশাত্মবোধের ওপর স্থান দিতে সম্মত হয় নি। সুতরাং জার্মানরা তাদের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠে তাদের উপাসনাস্থলটি ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। কিন্তু এই ভাঙ্গার কায়দাও অদ্ভুত। নিশ্চয়ই খুব নীচে নেমে এসে ঠিক গম্বুজ লক্ষ্য করে' বোমাটি ফেলা



প্লাৎস্ তেআ-ত্রাল্নী।
বিশাল অপেরা-গৃহ ও পার্শ্ববর্তী নাট্যশালাগুলির যুদ্ধের আগেকার চেহারা। এখন সুধু তাদের দগ্ধপ্রায় কাঠামগুলি দাঁড়িয়ে আছে।

হয়েছিল। কারণ এর চারিপাশের বর্তুলাকার দেওয়াল অক্ষতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্থধু প্রকাণ্ড ক্রুশ-কাষ্ঠ সমেত গম্বুজটি এবং ভেতরের যা কিছু অতি নিপুণভাবে অপসৃত করা হয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, গির্জাটিকে এমন নিখুঁতভাবে ভাঙ্গতে পাকা হাতের দরকার হয়েছিল।

জাহেন্তার সাম্‌নাসাম্‌নি প্রকাণ্ড বাড়ীটায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্য-বিদ্যা নিকেতন। এইখানেই আমার বেশীর ভাগ সময় কাটতো। এখানে ছিল প্রকাণ্ড প্রাচ্য-গ্রন্থালয় আর ছিল একটি ছোট-খাটো ভারতীয় মুজেউম্ বা যাদুঘর। সুরাটের নিকটবর্ত্তী ধরমপুরের মহারাণার অনুগ্রহে এই মুজেউম্‌টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরই কয়েকটি বিশেষ মুল্যবান দান নিয়ে এই অধম পোলদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারকল্পে যাদুঘরটি সুরু করে। এবং অল্পে অল্পে তা হয়তো একদিন পারীর মুজে গ্যিমে বা লন্দনের ভারতীয় মুজেউমের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াতো। এইখানেই ছিল অধম-প্রতিষ্ঠিত ভারত-মিত্র-পরিষদ যার সভ্যদের অধ্যবসায়ে ভারতবর্ষ ও পোলদেশের ভেতর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পণ্য সামগ্রীর আদান-প্রদান ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভারশৌএ ফিরে দেখলাম, বাড়ীখানি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টিও পুড়ে ছাই হয়েছে। বেঁচে আছে স্থধু গ্রন্থাগারটি। সেখানে জার্মান সৈনিকদের ঘাঁটি বানানো হয়েছে। সেখান দিয়ে যাবার সময় একটি পরিচিত দারোয়ানের কাছে খবর পেলাম, জার্মানরা বইগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে আপন আপন প্রাতঃকৃত্যের কাজে লাগাচ্ছে। কেউবা বই জ্বালিয়ে কাফি বা চায়ের জল গরম করছে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে দেখি, প্রায় সমস্ত ভারশৌ সহরটা ভস্ম-স্তূপ বা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রায় একক্রোশব্যাপী লম্বা রাস্তা নভ্যী শ্বিআত্, যেখানে ব্রিতানী রাষ্ট্রদূতের দৌলৎখানে ছিল, এবং যেখানে ওরা

সেপ্টেম্বর হাজারে হাজারে নরনারী এসে জমা হয়েছিল ইংরেজদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্যে, সেই সমস্ত রাস্তাটা একটা এক-টানা ভগ্নস্তূপ। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাষ্ট্রদূতাবাস এখনো সামান্য চোট খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং আরো তাজ্জব লাগলো এই দেখে যে, জার্মানরা সেখানে এসে তাদের ক্যান্টীন্ বা ঐজাতীয় কোনো পানাহার বা খেম্টা নাচের ঘাঁটি খোলে নি। তবে পরে কে একজন হোটেলওয়ালা ফ্যাসান্-বিলাসী স্ত্রী-পুরুষ ও জার্মান অফিসারদের কাফির জল খাইয়ে দু'পয়সা উপার্জ্জন করবার জন্যে সেখানে বিরাট এক কাহ্‌বে-খানে খুলেছিল, মনে আছে।

যাই হোক্, দিদির বাড়ীর পথে সমস্ত ভারশৌ সহরটার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, এবং সেদিন এই ভারশৌএর বিধ্বস্ত রূপ দেখে মনে হয়েছিল তার বিশেষ কিছু বাকী নেই। পোলদেশ ছাড়ার পর খবর পেয়েছিলাম, ভারশৌএর ধ্বংসের হিসেব এই রকম ঃ শতকরা ৪৩টি বাড়ী একেবারে চূর্ণ; ২৮% দগ্ধপ্রায়, যেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া উপায় নেই ; ২৯% বেঁচে আছে, যদিও তাদের বেশীর ভাগই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত। সেদিন পথ দিয়ে চলবার সময়েও মনে হয়েছিল, ভারশৌএর মাত্র চতুর্থাংশ মোটা-মুটি রক্ষা পেয়েছে, বাদবাকী স্রেফ্ ভস্মস্তূপ, ভগ্নস্তূপ, আর পোড়া বাড়ীর কাঠাম। যুদ্ধের পর প্রায় ছ'মাস ভারশৌএ বাস করেও আমার এই ধারণার পরিবর্ত্তন হয় নি।

দিদির বাড়ীর কাছে পৌছে বাইরে থেকে দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, অন্ততঃ বাড়ীখানা এখনো অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচ তলায় তাঁর ফ্ল্যাট। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে দেখি তাঁর ফ্ল্যাটে ওঠ্‌বার সিঁড়ি বন্ধ। ওপরতলার একখানি ফ্ল্যাট্ নষ্ট হয়েছে, এবং সিঁড়ির ধাপগুলো শ্র্যাপ্‌নেল্ ও গ্রেনেডে এমনভাবে জখম হয়েছে যে, ওপরে ওঠবার উপায় নেই।

পরিচিত দারোয়ান সেলাম করে' সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তাকে দিদির খবর জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে—"যান্ না ওপরে, তবে পেছনদিককার রান্নাঘরে যাবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে, এদিককার সিঁড়িটে ভেঙ্গে গেচে।"

পানী * ভালো আছেন ?

হ্যাঁ প্রশেঁ পানা।

পান্ ? †

পান্ও ভাল আছেন।

মাকে দেখেচ ?

হ্যাঁ, তিনিও ভালো আছেন ?

কেউ জখম হয় নি ?

না প্রাশেঁ পানা, ভগমানের দয়ায় সবাই ভালো আছেন। আপনারা এই ফিরলেন বুঝি সহরে ? ওপরে যান্।

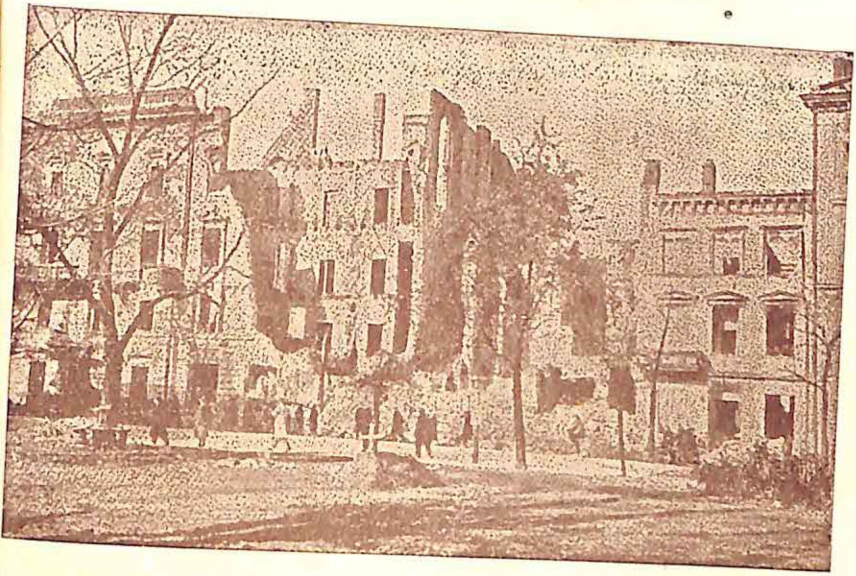
পিঠের বোঝা নিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আমরা হু'জনে পাঁচতলার ওপর উঠে দিদির ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিলাম। সাম্‌নে দেখি, একখানা ফ্ল্যাট্ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। অথচ দিদির ফ্ল্যাটের দোরে একটু আঁচড়ও লাগে নি।

দিদির শরীর অক্ষত থাকলেও তাঁর চেহারা দেখে তাঁকে হঠাৎ চেনা যায় না। ভারশৌএর ওপর মাসখানেক ব্লিৎস্-যুদ্ধ, তার ওপর অনিদ্রা, অনাহার। আমরা যে সত্যিই ফিরেছি, একথা হঠাৎ তাঁর মন মেনে নিতে চাইলে না। খানিকক্ষণ আমাদের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, তার পর আমাদের হু'জনকে জড়িয়ে ধরে' কেঁদে ফেললেন। আমাদেরও অশ্রু বাধা মানলে না। তাঁর স্বামীর অবস্থা ভালো নয়।

* মাদাম। † মস্তো।

শরীর তাঁর যুদ্ধের আগেই আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছিল। যুদ্ধের সময়ে ভারশৌএর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণের উত্তেজনায় তা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। এখন আর তাঁর ওঠবার ক্ষমতা নেই। দিদির কাছে তাঁর মা'র খবর পাওয়া গেল। তাঁর ফ্ল্যাট্‌টি ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না, যুদ্ধের সময় তাঁকে সব সময়েই হাসপাতালে থাকতে হতো। এছাড়া দিদিদের আত্মীয়বন্ধু কারো কোনো বিশেষ ক্ষতি হয় নি। যাই হোক্, দিদির কনিষ্ঠাকেও যে অনাহত অবস্থায় তাঁর কাছে ফিরিয়ে এনে দিলাম, তাও কম সুখের বিষয় নয়।

এইবার আমার নিজের ফ্ল্যাট্‌টির তত্ত্বাবধান করবার জন্যে আবার প্রাচীন পল্লীর দিকে ধাওয়া করতে উদ্যত হ'লাম। কিন্তু দিদির কাছে শোনা গেল, তার প্রয়োজন নেই। কারণ আমার পাশের ফ্ল্যাট্‌টি বোমার চোটে চূর্ণ হওয়াতে তার আওয়াজে আমার ফ্ল্যাটের দোরের চাবি ভেঙ্গে তা হাট হয়ে খুলে যায়। তখন ভীষণ যুদ্ধ চলছে। পশ্চিম অঞ্চলের একটি পথিক আমার অবারিতদ্বার আ-স্রা-মাটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তার পর তারা কোথায় চলে' গেল জানা যায় না। দিদি প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ মাথায় করে' আমার যাবতীয় জিনিষপত্র ও সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার অল্প অল্প করে' সরিয়ে এনে একটি ছোট্ট ঘরে ভর্তি করে' রেখেছেন। উদ্দেশ্য দু'টি। এক : আমার খুচরো দু'একটা জিনিষ হারানোতে কর্তব্যপরায়ণা দিদি, যাঁর হাতে আ-স্রা-মাটির ভার দিয়ে গিয়েছিলাম, বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে ওঠেন। দুই : যদি আমি ফিরি, ত আমার পুরাণো ঠিকানায় থাকা নিরাপদ হবে না, কারণ জার্মানরা এসেই সটান আমার আ-স্রা-মাটিতেই আমার খোঁজ করতে লোক পাঠাবে। কাজেই প্রাচীন পল্লীর কাছে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর পাঁচতলার ওপর একটি



ভারশৌএর প্রাচ্য-বিদ্যা নিকেতনের ভগ্নাবশেষ। এই-খানে একটি ভারতীয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১০ নং উলীৎসা ক্রুলেফ্স্কা।

ছোট ঘর আমার জন্যে মজুত আছে, যেখানে অন্ততঃ কিছুদিন অনায়াসে গা-ঢাকা দেওয়া চলবে। আশ্চর্য্য এই দিদির পূর্বানুভবের ক্ষমতা! এইখানে বলে' রাখি যে, দু'একদিন পরে আমার আগের বাড়ীর দ্বারোয়ানের কাছে খোঁজ পেলাম, জার্মানরা সত্যিই আমার খোঁজ করতে এসেছিল। এবং ঠিক সেই সময়ে যখন বিজয়োন্মত্ত জার্মান সৈনিকরা মদে চুর হয়ে স্ফুর্তির ফাঁকে ফাঁকে শাসনকার্য্য চালাচ্ছিল, তখন তাদের হাতে ব্রিতানী প্রজারূপে এবং ভারতীয় হওয়া সত্বেও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে ধৃত হ'লে, হয়তো এতদিনে আমাকে পারত্রিক জগতে বিচরণ করতে হ'তো।

যাই হোক্, দিদির নির্বাচিত এই ঘরখানিকে আপন নির্দিষ্ট বাসারূপে মোতায়েন রেখে আমি মাস দুই বন্ধু-পরিচিত এবং এর ওর তার বাড়ীতে গা-ঢাকা দিয়ে, রাত কাটালাম। তার পর একদিন আমার ওপর সমন এলো, এবং আস্বাব-পরিপূর্ণ ছোট ঘরখানিতে আমার প্রকাণ্ড লেখবার টেবিলটার ওপর ঘরের ছাদ থেকে তিন হাত নীচুতে আমার আস্তানা নিরূপিত হ'লো। কীটানুকীট মাষ্টারটির বিরুদ্ধে তখনো কিছু পাওয়া যায় নি, এবং পরে পাওয়া গেছে কিনা, জানিনা। যাই হোক্, মাষ্টারের দৌড় ইস্কুল অবধি, এবং ইস্কুলটিই যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তখন আমার আর পদার্থ কী থাকতে পারে?—এই জ্ঞান করেই বোধ হয় গুলিতে আমার খুলিটিকে উড়িয়ে দেওয়া হ'লো না। কিন্তু বেচারী জার্মানরা তখনো জানতো না, একটি পোলভাষায় লেখা বইয়ের মুখপত্রে এই অধম ঠিক যুদ্ধের আগে নাৎসীদের লক্ষ্য করে' যেসব শব্দ প্রয়োগ করেছিল, তাতে তার মৃতদেহেরও নানা অসম্মানসূচক ব্যবহার প্রাপ্য ছিল। এখানেও দৈবের সাহায্য পাওয়া গেল! বইখানি ছাপা হয়েছিল, এবং সেপ্টেম্বরেই তার বাজারে বেরুনো উচিৎ ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় জার্মানদেরই

একটি অগ্নিবর্ষী বোমা ছাপাখানাটিকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে। শোনা গেল, বইখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের বাড়ীতে কোথায় চাবী দেওয়া আছে। তিনি দেশে নেই, এবং জার্মানরাও তাঁর খোঁজখবর করে নি।

খ্রীষ্টানদের পুঁথিতে একটি সন্তের বিবরণ পাওয়া যায়, যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করে' পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিচ্যুত হবার জন্যে মরুভূমির মাঝে একটি থাম্বায় তাঁর আধ্যাত্মিক বাসা বাঁধেন। ভারশৌএ ফিরে আমার অবস্থাও কতকটা উক্ত সন্তের অনুরূপ হয়ে উঠলো। যেখানে আমার আস্তানা ঠিক হ'লো, সেটি একটি ছোট্ট কামরা, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে হাত পাঁচ-ছয়ের বেশী হবে না, পাঁচতলার ওপরে, এবং তার চারিপাশের বাড়ীগুলো পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জানালাস্বরূপ দেওয়ালের গায়ে যে একটু ফাঁক আছে তা দিয়ে দেখি যতদূর দৃষ্টি চলে ইট-কাঠ আর ভস্মের স্তূপ। তুলনাটা সুধু এই পর্য্যন্ত মরুভূমির ভেতর থাম্বা, আর পোড়াভূমির ওপর পাঁচতলার ঘর। তফাৎ এই যে, সন্তটির নির্বাসন স্বেচ্ছায় এবং আমার অজ্ঞাতবাস অনিচ্ছায়।

কথনো কথনো কোনো পরিচিতের মুখ দেখতে পাই। রাস্তাঘাটে যা একটু আধটু বেরুবার সুযোগ পাই তা অনেক সময়ে মনকে এমনভাবে আহত করে যে, বাধ্য হয়ে স্বাধীনতার বিলাসটুকু বর্জন করতে হয়। জার্মান অধিকারে পোলদেশের ওপর কুলটুর্‌কাম্‌পৃফ-এর যে রূপ চোখে পড়লো, যুদ্ধের পর দু'মাস স্বাধীন অবস্থায় এবং প্রায় পাঁচ মাস পরাধীন অবস্থায় ওদেশে বাস করবার সময়, তার বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো কোনোদিন অন্য পুঁথিতে দেবার সুযোগ ঘটবে। আপাততঃ তার কঙ্কাল-রেখাগুলো আপনাদের সামনে ধরে' দিই।

যুদ্ধে ক্ষাত্রধর্মের পালন যদিই বা হাস্যকর বলে' গণিত হয়, এবং তার অতিক্রমণ যদি বুদ্ধিমত্তা বা রণকৌশল বলে' বিবেচিত হয়, ত পরাজিত শত্রুর ওপর খড়্গাঘাত যে বিজেতার পক্ষে গর্হিত ও লজ্জাকর, সে বিষয়ে অন্ততঃ মতদ্বৈধ থাকা উচিত নয়। জার্মান অধিকারে পোলদেশে দেখি সর্বত্র এই নিতান্ত অক্ষাত্র, অমানুষিক ধর্মের জয়জয়কার। পরাজিতের নির্য্যাতন।

জার্মানরা পরাজিত পোলদের সর্বস্বান্ত করে' তাদের অবশিষ্ট আহার্য্য, পরিচ্ছদ, ইন্ধন ও অর্থ লুটেপুটে নিয়ে গেল।

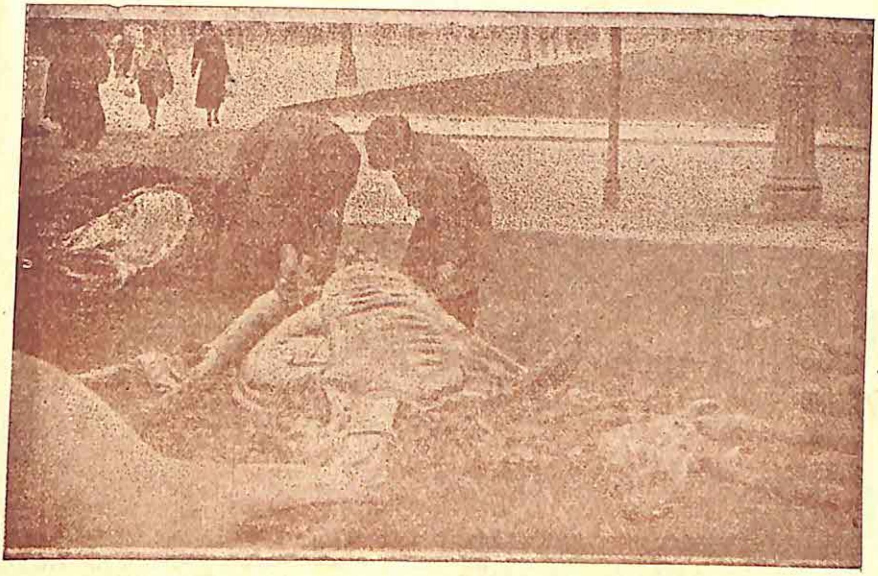
কুলটুর্‌কাম্‌প্‌ফ্-এর প্রসাদে পোলদের এক নূতন শত্রু জুটলো যা মৃত্যুর চেয়ে শাশ্বত, ধর্মের চেয়ে কঠোর এবং সত্য—বুভুক্ষা। মানুষের অন্তঃস্থলে শীতের ক্ষুধার্ত নেকড়ের থাবার আঁচড়ের মত সে তীক্ষ্ণধার। জীবনের সমস্ত চিন্তা ও ভাববিলাসকে ছাপিয়ে ওঠে তার বীভৎস রব। পোলদেশে খাবার নেই। ডাষ্ট্‌বিনের চারিপাশে রোগা, হ্যাংলা কুকুরের মত সমগ্র পোলজাতি খাবারের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে। একমাত্র খাদ্য মরা ঘোড়া বা অন্য মরা পশু, যুদ্ধের সময়ে জার্মান বৈমানিকরা যেসব পশু মাঠে-ঘাটে শিকারের ছলে মেরে রেখে গিয়েছিল, অথবা যেসব ঘোড়া যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। দলে দলে লোক গিয়ে তাদেরই দেহাংশ যে যা পাচ্ছে কেটে নিয়ে আসছে। দেখছি, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত মরা ঘোড়া বা অন্য পশুর মাংস কেটে নিয়ে এসে আপন আপন পরিবারের আহার জোটাচ্ছেন। আর এই নিরন্ন, বুভুক্ষু পোলদের চোখের সামনে দিয়ে মস্ত মস্ত লরী-বোঝাই হয়ে চলেছে ভারে ভারে, বস্তা বস্তা ময়দা, মাংস, মাখন, ডিম, চিনি, আলু, সব্জী এইসব। শিশু বা রুগ্নদের আহারের জন্যে এক ফোঁটা দুধ পাওয়া যায় না। ক্ষুধার্ত শিশুর অবোধ, বুভুক্ষু চীৎকার সে এক বীভৎস

রব, তা কানে শুনে সহ্য করতে হ'লে প্রচুর স্নায়বিক সংযম ও শক্তি দরকার।*

রুটি যা একটু আধটু পাওয়া যাচ্ছিল, তিন আনার জায়গায় তিনটাকায় তাও দু'দিন পরে জার্মানদের দয়ায় বন্ধ হয়ে গেল। চড়া দামে রুটি বেচা এবং কেনা, দুইই মৃত্যুদণ্ডার্হ বলে' ঘোষিত হ'লো। এই ধরণের সাউখুড়িতে, জার্মানী প্রোপাগান্দার জোরে জগতের লোক, তাদের সাধুতায় হয়তো চমৎকৃত হ'লো। কিন্তু বাইরের লোকে হয়তো কেউ জানতে পারলে না, পোলীয় শস্যাগার জার্মানীতে তুলে নিয়ে গেলে অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে আহার্য্যের মূল্যবৃদ্ধি নিতান্ত স্বাভাবিক জিনিষ। চাষাদের ঘরে সামান্য শস্য ছিল বটে, কিন্তু তাও বেচে তারা দেশলাই, কেরোসিন আর নন্, চিনি কিনতে গিয়ে দেখলে, এক বাক্স দেশলাইয়ের দাম দু'পয়সার জায়গায় দু'টাকা, কেরোসিনের দাম দু'আনার জায়গায় তিন টাকা এবং চিনি ও নূন পাওয়াই যায় না। সুতরাং পণ্যসামগ্রী যখন অর্থনীতির নিয়মে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত, তখন সব জিনিষের দাম বাড়বে অথচ আহার্য্যের দাম বাড়বে না, এরকম হুকুম জারী করা জবরদস্তি মাত্র।

সুধু আহার্য্য নয়, জার্মানরা পোলদেশের যাবতীয় পরিচ্ছদও একদিন ক্রোক্ করলে। মুখে বলা হ'লো বটে, পরিচ্ছদের দাম যাতে ব্যবসায়ীরা অযথা না চড়াতে পারে সেইজন্যে সেগুলো সরকারের কাছে গচ্ছিত রইল; কিন্তু বাস্তবে পশম, রেশম, রোম, অতসী, বা তুলোর সূতোয় তৈরী সমুদয় দ্রব্য লরী-বোঝাই হয়ে কোথায় যে গিয়ে হাজির হ'লো, তার হদিস্ পাওয়া গেল না। ক্রোক্ করতে এসে জার্মান

* লেখকের রাদিও-বক্তৃতায় বিবৃত।



ভারশৌএর পথে-ঘাটে ভদ্র-ঘরের মেয়েরা কিছুদিন এই উপায়ে আপন আপন পরিবারের আহার্য্য সংগ্রহ করেছেন।

সৈনিকরাও বেশ কিছু কিছু পশমের সোয়েটার ইত্যাদি হাতালে, দেশে আপন আপন ফ্রাউদের পাঠাবার জন্যে।

উদরে অন্ন নেই, অঙ্গে বস্ত্র নেই' তার ওপর নিদারুণ শীত, সে শীতের শৈত্য এদেশের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মাপ-কাঠির হিসেবে তা প্রায়ই —৪,—১৩,—২২,—৩১ ফার্ন্‌-এ গিয়ে হাজির হ'চ্ছে। ও দেশে নাকি একশ বছরের মধ্যে ওরকম শীত পড়ে নি। এই প্রচণ্ড শীতে এক টুক্‌রো কয়লা নেই। দেখি, দলে দলে লোক কয়লা পাবার আশায় সেই অসহ্য শীতে সারি দিয়ে বন্ধ দোকানের সামনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ অবশিষ্ট আস্‌বাব্ ভেঙ্গে জ্বালাচ্ছে, কেউ বা পোড়া বাড়ী থেকে টুক্‌রো টুক্‌রো পোড়া কাঠ বেছে এনে তাই জ্বালিয়ে কোনো রকমে শীত নিবারণ করছে।

তারপর একদিন জার্মান সরকারের হুকুমে দেশবাসীর সামান্য অর্থ ও ঐশ্বর্য্য জার্মানী কোষাগারে স্থানলাভ করলে। সে সম্বন্ধে দু'এক কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলতে চাই।

পোলদেশ অধিকার করবার পর কিছুদিন সৈনিকরা ও তথা-কথিত সেনাবিভাগ সেই ধরণের শাসন কার্য্য চালালে যাকে জার্মান ভাষায় বলে Militaerverwaltung অর্থাৎ সামরিক শাসন। সে শাসন সৈনিকদের পান, অশন, এবং নাচন- কোঁদনে পর্য্যবসিত হ'লেও পোলদের পক্ষে তার সুবিধা ছিল এই যে, সেনাবিভাগ স্ফূর্তি ও ব্যক্তিগত লুটত-রাজ ছেড়ে দেশটাকে সুব্যবস্থিতভাবে শোষবার সময় পেত না, আর সে কর্মকুশলতাও তাদের ছিল না। অক্টোবরের শেষাশেষি পোলদেশের শাসনকার্য্যের ভার নিলে Zivilverwaltung অর্থাৎ অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা। এরাই শাসনকার্য্যের নামে চালালে দেশ-জোড়া শোষণ-কার্য্য।

একদিন সহরের সর্বত্র দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় বিজ্ঞপ্তি দেখা গেল

এই মর্মে যে, দেশের যেখানে যত বিদেশী টাকা আছে তা যেন অচিরে জার্মান সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। সরকার অবশ্য তার যথোচিত মূল্য দেবেন। অর্থাৎ মার্কিনী ডলারের দাম যুদ্ধের আগে ছিল পাঁচ জ্লতী (২॥০) এখনো সেই দরেই সরকার তা কিনে নেবেন। বলা বাহুল্য, এই পাঁচ জ্লতীতে তখন মাত্র দু'তিন বাক্স দেশলাই বা একখানা পাউরুটি কেনা চলে। সরকার আশা করেন, জনসাধারণ টাকাগুলি স্বেচ্ছায় তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে আসবে।

এর কিছুদিন পরে আবার দেখি দেওয়াল-ভরা বিজ্ঞপ্তি। বিদেশী টাকাগুলি যেন অচিরে জমা দেওয়া হয়, কারণ বিদেশী টাকাকড়ি কারো কাছে পাওয়া গেলে তার কঠোর শাস্তি (অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে মৃত্যুদণ্ড)। এই সঙ্গে আরো বলা হ'লো, সরকার আশা করেন, জনসাধারণ স্বেচ্ছায় তাদের সোনার তাল যা কিছু আছে তাও জমা দেবে। আরো কিছুদিন পরে কড়া হুকুম এলো, বিদেশী টাকা ও সোনার তাল প্রভৃতি না জমা দিলে ঐসব সামগ্রীর অধিকারীরা দণ্ডিত হবে।

এইবার চললো ঐ দু'টি জিনিষের তল্লাস করবার জন্যে বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান। বিদেশী টাকার সঙ্গে দেশী টাকাও সৈনিকদের পকেট ভারী করতে লাগলো। এবং সোনার তালের সঙ্গে সঙ্গে গহনার বাক্স, রূপোর থালা-বাসন, কাঁটা-চামচ, বাতীদান, দামী গালিচা, এটা ওটা সেটা সখের মূল্যবান জিনিষ সৈনিকদের সম্পত্তিবৃদ্ধি করতে লাগলো। কারো প্রতিবাদ করবার সাহস হয় না। সৈনিকরা পেটির পিস্তলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, সরকার সৈনিকদের বিরুদ্ধে নালিশ রাজদ্রোহিতা জ্ঞান করে। এমনি করে' চললো কিছুদিন।

তার পর একদিন অখ্‌বার মার্ফৎ দেশবাসীদের জানিয়ে দেওয়া হ'লো, দিন দশেকের মধ্যে এক শ ও শতোর্দ্ধ জ্লতীর যাবতীয় নোট যেন নতুন—

খোলা জার্মানী বাঙ্কে জমা দিয়ে আসা হয়। সুধু এইটুকু অনুগ্রহ করা হ'লো যে, যার একখানিমাত্র এক শ জ্লতীর নোট সম্বল সে তার বদলে খুচরো টাকা পাবে। জমা দেওয়ার জায়গা মাত্র তিনটি। সময় সকাল ন'টা থেকে বেলা দু'টো। দণ্ডের ভয়ে ভারশৌ এবং আশপাশের সমস্ত সহর ও গ্রাম থেকে লাখে লাখে লোক এসে জড়ো হ'লো এই তিনটি বাঙ্কের সাম্‌নে। এক এক জায়গায় পাশাপাশি দশবারো জন করে' মানুষ ক্রোশখানেক জুড়ে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। কেউবা ভয়ে টাকা জমা দিতে চায়, কেউবা তার শেষ সম্বল একশ জ্লতীর নোটের বদলে খুচরো টাকা চায়। এ নোট বাজারে চলবে না, স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে সে খাওয়াবে কী?

দেখি, দিনের পর দিন মানুষ সেই রকমই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের নিজের জায়গা হারিয়ে ফেলবার ভয়ে অনেকেই বাড়ী ফেরে না। সেই নিদারুণ শীতে এক হাঁটু জমা শক্ত বরফের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরের যেটুকু অনাবৃত পায় সেইটুকুই একেবারে যেন কসাইয়ের মত ছুরী দিয়ে কেটে নেয়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মানুষের অবসন্ন দেহ যখন ডিসিপ্লিনের চোখ-রাঙানি মানতে চায় না, এ ওর গায়ে ভর করে' সামান্য বিশ্রাম লাভ করতে চায়, এবং লাইন হয়ে যায় বাঁকা-চোরা, তখন জার্মানী সৈনিক কিংকণ্ডের মত দাঁত বের করে', বিকট হুঙ্কারে তেড়ে আসে। বন্দুকের বাঁট নির্বিচারে বসিয়ে দেয় যাকে সামনে পায় তারই মাথায়। মানুষের লাল রক্ত পথের ময়লা তুষারের সঙ্গে মেশে।

একশ ও শতোর্দ্ধ জ্লতীর নোটগুলি যখন জার্মানী কোষাগারে প্রবেশ লাভ করলে, তখন আবার কর্তৃপক্ষীয়রা নতুন লাভের পথ বের করলেন। একশ জ্লতীর নোটগুলোয় রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ দিয়ে আবার

বাজারে চালু করলেন। এবং কিছু দিন পরে ছাপের জাল হ'চ্ছে, এই অজুহাতে আবার সেগুলিকে সিন্দুকস্থ করলেন।

কিছুদিন পরে পঞ্চাশ জ্লতী-গুলোর পালা এলো, এবং তার পর কুড়ি জ্লতীর। খুচরো টাকা-পয়সাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হ'লো। কিছুদিন পরে কুড়ি ও তার নীচের অঙ্কের নোটগুলোর বদলে নতুন "পোলীয়" বাঙ্কের ছাপা নোট চালু করা হ'লো। তবে মোটা টাকাগুলো কর্তৃপক্ষের কাছে চিরতরে গচ্ছিত রইল। ফলে দেশে এক অদ্ভুত কমুনিজ্মের সৃষ্টি হ'লো। সবারই সর্বোচ্চ মূলধন দাঁড়ালো একশ জ্লতী অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা, এবং তা দিয়ে একটি সংসারের বড়জোর এক সপ্তাহের খরচ চলতে পারে। তাছাড়া পয়সা ঘরে রেখেই বা লাভ কী? জার্মানদের যুক্তি, পয়সা দিয়ে যখন কিছু কেনবারই উপায় নেই, তখন কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন তদ্ধনম্।

বাঙ্ক-সমুদয় যা যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা আর খুললো না। খুলেই বা লাভ কী? টাকা-কড়ির লেন-দেনের রেওয়াজই যখন দেশ থেকে উঠে গেল, তখন তারা থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী? যার যা সঞ্চয় বাঙ্ক-গুলির কাছে গচ্ছিত ছিল, যথা এই অধমেরও বেশ কিছু, তা ফেরত দেবার কোনো বাধ্যবাধকতা রইল না। কারণ সরকার সব টাকা সিন্দুকে পূরেছেন, এবং কাউকে একটি পয়সাও দেবার হুকুম নেই। জার্মান ম্যানেজারের কাছে স্বীয় প্রাপ্যের যৎকিঞ্চিৎ চাইতে গিয়ে ব্রিতানী প্রজা হিসেবে আপন ধৃষ্টতার জন্যে ভর্ৎসিত হয়ে ফিরে আসি নিজের আস্তানায়। যুদ্ধের আগে কেনা কিছু খাদ্যসামগ্রী ও কয়লা না থাকলে এই অধমকে যে কিছুদিনের মধ্যেই পটলোৎপাটন করতে হ'তো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার ওপর ভাগ্যক্রমে একটি চাষার কাছে কিছু আলু আর পেঁয়াজও কেনা গিয়েছিল। পচা পেঁয়াজ আর পচা

আলুর স্যুপ যা মাসের পর মাস গলাধঃকরণ করে' জীবনধারণ করা গেল, তার সম্যক্ বিবরণ দিয়ে আপনাদের বিবমিষার উদ্রেক করতে চাই না।

যাই হোক্, দেশে টাকাকড়িও নেই এবং পণ্যসামগ্রীও নেই। অথচ দেখা গেল, যাদের একটু হাত সাফাই আছে তারা হু হু করে' বড় মানুষ হ'চ্ছে, অর্থাৎ খুচরো টাকাগুলি তাদের হাতে এসে গ্রীন্‌ষ্ঠী স্তক্-এর মাছগুলোর মত আত্মসর্পণ করছে। পোলদেশে এক নতুন ব্যবসা সুরু হ'লো, স্পেকুলেশন্। দেখা গেল, সরকারের দণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করে' লোকে ডলার, গুল্ডেন্, তুর্কী মোহর, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং হীরে-জহরৎ সোনা-দানা নিয়ে বড় বড় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এ ব্যবসার মূলধন দরকার নেই। স্রেফ্ দালালী। পয়সাকড়ির ওপর যাদের আস্থা কম, এবং যাদের হাতে বিস্তর খুচরো পয়সা জমেছে, তারা ঐ পয়সায় ডলার, মোহর আর সোনা-দানা কিনছে, মাটিতে পুঁতে বা দেওয়ালে গেঁথে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাদের কোনোরকমে জিইয়ে রাখবার জন্যে। আর যাদের বিদেশী টাকা-কড়ি ও সোনা-দানা হাতে আছে, অথচ ঘরে দানা নেই, তারা বাধ্য হয়ে সংসার প্রতিপালনের জন্যে ঐ গুলি বেচছে অল্প অল্প করে'। জার্মানদের চোখে ধূলো দিয়ে যারা ক্রেতা ও বিক্রেতার মোলাকাৎ ঘটিয়ে দিচ্ছে তারা দস্তুরি খেয়ে ফেঁপে উঠেছে।

এ ধরণের ব্যবসার কোনো আফিস, কেরাণী, বেয়ারার প্রয়োজন নেই। ব্যবসা চলছে রেস্তোরাঁ বা কাহ্‌বে-খানেয় যেখানে গুঁড়ো বার্লি পোড়ার জলে ভরা পেয়ালা কাফিকে স্মরণ করে' চুমুক দিতে দিতে দালালরা ক্রেতা বা বিক্রেতার সঙ্গে চুপি চুপি ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা চালিয়ে চলেছে। জার্মানরা অবশ্য অচিরেই এই ধরণের ব্যবসার সন্ধান পেলে, এবং আচম্‌কা রেস্তোরাঁ ঘেরাও করে' পকেট-সার্চ্ করা সুরু করলে। কিন্তু যারা এ ব্যবসায়ে নেমেছে তাদের হাত-সাফাই স্বয়ং সর্বদর্শী বিধাতারও

চোখে পড়বার উপায় নেই। আমারই একটি পরিচিত একদিন রেস্তোরাঁ থেকে বাড়ী ফিরে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, শখানেক ডলারের একটি তাড়া। প্রতি ডলারের দাম তখন পাঁচ জ্লতীর জায়গায় একশ' জ্লতীতে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক্, এক কথায়, জার্মানরা পোলদের অবশিষ্ট আহার্য্য, পরিচ্ছদ, ইন্ধন ও অর্থ সব লুটেপুটে নিয়ে গেল। ফলে পোলদেশের দৈনন্দিন জীবন একবারে পঙ্গু হয়ে পড়লো। সমাজের উর্দ্ধতন এবং অধস্তন স্তরের মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হ'লো কোনোরকমে জীবনধারণ করা। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান একটা অগ্রগামী, সভ্য দেশ থেকে কিছুকালের জন্যে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হ'লো।

বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্কুল, পাঠশালা সব বন্ধ করে' দেওয়া হ'লো। ভারশৌএর সাধারণ পাঠাগারের ভালো ভালো বইগুলি এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি লরী-বোঝাই হয়ে জার্মানী-মুখো ধাওয়া করলে। পশ্চিম অঞ্চলে পজ্নান্ সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে বই জান্‌লা দিয়ে ছুড়ে ফেলে জার্মানী সৈনিকরা পথ-ঘাট বিকীর্ণ করলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তারা ধ্বংসের উত্তেজনায় জার্মান সাহিত্য বা দর্শন বিষয়ক গ্রন্থেরও খাতির করলে না।

পোলদেশে সাহিত্য বলে' কোনো জিনিষের অস্তিত্ব রইল না। বেশীর ভাগ বই বাজেয়াপ্ত করা হ'লো। সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক বন্ধ করে' দিয়ে একটিমাত্র সরকারী দৈনিক চালাবার ব্যবস্থা করা হ'লো। থিয়েটারের কথা আগেই বলেছি। লেখক-লেখিকা, নট-নটী এবং আঁকিয়ে, বাজিয়েরা উপলব্ধি করলে, পৃথিবীতে শিল্প বা আর্ট্ বলে' যে জিনিষটা সভ্যতার গোড়া থেকে মনুষ্য-সমাজে স্বীকৃত হয়ে আসছিল তা জীবনের একটা নিতান্ত

সঙ্কীর্ণ অংশ মাত্র, যা বুভুক্ষার মত আদিম নয়। সুতরাং তারাও শিল্প ছেড়ে হ'লো রেস্তোরাঁর ঝি-চাকর। ছেলেপুলেরা যাতে বাড়ীতে বসেও পড়াশুনো না করতে পারে সেই জন্যে পোলভাষায় ছেলেদের ইস্কুলের বইগুলোও বাজেয়াপ্ত করা হ'লো। এমন কি মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পোলীয় চিত্র, মর্মর বা ব্রন্‌জ্‌ প্রতিমূর্তি প্রভৃতিও কেড়ে নেওয়া হ'লো।

পোলদের অবশ্য বেকার বসিয়ে রাখা হ'লো না। তাদের দিয়ে রাস্তায় বরফ সাফ্ করানো হতে লাগলো, এবং লরী বোঝাই করে' মেয়ে-পুরুষ সবাইকে জার্মানীতে ক্ষেত-খামারের কাজ করবার জন্যে পাঠানো হ'তে লাগলো। এক কথায় দেশ জুড়ে চললো পোলদের সকল দিক দিয়ে ausrotten ও vernichten করার কাজ—ধ্বংসীকরণ, নিশ্চিহ্নীকরণ।

সঙ্গে সঙ্গে চললো পোলদের অনুভূতি ও চৈতন্যের ওপর যথেচ্ছ কষাঘাত।

যুদ্ধের সময় কতলোক যে প্রাণ হারিয়েছিল, তার হিসেব করা সহজ নয়।* পথে-ঘাটে সর্বত্র দেখতে পাই, আগে যেখানে ঘাস বা ফুলের গাছ ছিল, সেখানে কাঠের ক্রুশ। ১লা নভেম্বর রাতে ভারশৌএর যে মূর্তি দেখলাম তা হয়তো কখনো ভুলবো না। ঐ দিনে আমাদের দেশের ভূতচতুর্দশীর মত বিগত আত্মার উদ্দেশে প্রদীপ দেওয়া পোলদের রেওয়াজ। ১লা নভেম্বর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিচিতেরা মৃতের আত্মাকে লক্ষ্য করে' তার কবরের ওপর ছোট ছোট বাতী বা প্রদীপ জ্বেলে রেখে আসে। যুদ্ধের পর এই ১লা নভেম্বর। সন্ধ্যা সাতটার পর পথে চলবার হুকুম নেই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুপ-রিচিতেরা এসে তাড়াতাড়ি মৃতের উদ্দেশে কবরের ওপর প্রদীপ জ্বেলে ত্রস্ত, ক্ষিপ্ত পদে বাড়ী ফিরছে। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ,

* অনুমান ভারশৌএ মোটামুটি দু'লাখ।

এবং সমস্ত সহর প্রদীপের আলোয় ঝলমল করছে। সহরের এমন জায়গা নেই, যেখানে বাতী দেওয়া হয় নি। যে মাটি মাড়িয়ে কতবার যাওয়া আসা করেছি, তারই তলায় যে এক একটি সমগ্র পরিবার চিরবিশ্রাম লাভ করেছে, একথা মনে হ'লে মানুষ বেশ একটু বিচলিত হয় বৈ কি। কিন্তু মৃতের অবমাননা কতদূর পর্য্যন্ত নৃশংসভাবে করা যেতে পারে তার রূপ দেখলাম এর কয়েক দিন পরে।

যাদের কবর দেওয়া হয়েছে রাস্তার ধারে তাদের অন্যকোনো সদ্গতির উপায় ছিল না। গোরস্থানের পথে মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণে শববাহীরা যখন বারে বারে রাস্তার মাঝখানে শব নামিয়ে কোন রকমে কোথাও মাথা গুঁজে আত্মরক্ষা করেছে, এবং বেশী দূর যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তখনই তারা বাধ্য হয়ে পথের ধারের মাটি খুঁড়ে মৃতের গতি করেছে। যুদ্ধের পর তাদের স্থানান্তরিত করতে হ'লে তাদের প্রতি যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন করা, আমি ঘটা করে' বৃষোৎসর্গের কথা বলছি না, অন্ততঃ সহরের বাইরে কোনো নতুন কবরস্থানের স্থষ্টি করা, এইটেই সভ্য সমাজের কাছ থেকে আশা করা যায়। কিন্তু জার্মানরা এই সহস্র সহস্র মৃতের সংকারের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করলে। বেগার খাটাবার মজুর পাওয়া গেল হাজারে হাজারে ইহুদী। তারা কোদাল-খোন্তা নিয়ে মাটির গর্ভ থেকে বিগলিত, অর্দ্ধ-বিগলিত শবদেহ খুঁড়ে বার করবার জন্যে নিযুক্ত হ'লো। পথের ধারে ধারে পূতিগন্ধময় শবদেহের দৃশ্য, সে যে কী ভীষণ তা বর্ণনা দিয়ে বোঝান যায় না। তারপর এলো সারে সারে নগর-সমবায়ের ময়লা-গাড়ী ; এবং মা, বাবা, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন, পুত্র, কন্যার শব ময়লা-গাড়ী বোঝাই হয়ে সহর ছেড়ে চলে' গেল। পোলরা অশ্রুসম্বরণ করে' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।*

* লেখকের রাদিও-বক্তৃতায় বিবৃত।

মৃতদেহের অবমাননা দেখলাম ভারশৌএর কবরস্থান পওঁস্কি-তে। ইউরোপে অত বড় এবং অত প্রাচীন কবরস্থান খুব অল্পই আছে। যুদ্ধের সময়ে বোমা ফেলে জার্মানরা এই কবরস্থানটিকে এক বীভৎস দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে। বোমার চোটে মৃতদেহ চারিদিকে ছিটকে পড়েছে। সর্বত্র মানুষের বিগলিত, বিচ্ছিন্ন দেহাংশ। গাছের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে'-থাকা একটি কঙ্কালের কথা জীবনে ভুলবো না। যুদ্ধের পর যে নূতন শাসন-কার্য্য সুরু হ'লো, এই প্রকাণ্ড কবরস্থানের মোটামুটি পুনর্ব্যবস্থা তার অন্তর্ভুক্ত বলে' গণ্য হ'লো না। মাসের পর মাস নিদ্রোত্থিতেরা গাছের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে' কাটিয়ে দিলে।

দেশে চলেছে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। মানুষ অনাহারে থাকে যতটা পারে, এবং না পারলে যা তা দিয়ে উদরপূর্তি করে। গাড়ীতে-জোতা ঘোড়া রাস্তার কাগজ চিবোয়, না হয় গাড়ী থেকে খালি চটের বস্তা টেনে নিয়ে তার অনেকটা খেয়ে শেষ করে। গৃহহীন, প্রভুহীন কুকুরগুলো শেয়ালের মত মৃতদেহ খেয়ে খেয়ে ফেরে। এমন সময় জর্মান সরকার ঘোষণা করলেন, ক্ষুধার্তকে স্যুপ দেওয়া হবে বিনা পয়সায়। একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে স-স্বস্তিক নাৎসী পতাকা উড়িয়ে স্যুপ-বিতরণের আয়োজন করা হ'লো। এলো হাজারে হাজারে অভুক্ত মানুষ, এলো চাষা, মজুর, এলো মেথর, ঝাড়ুদার, এলেন নিরন্ন ভদ্রলোক, ভদ্র-মহিলা। রুগ্ন স্ত্রী-পুত্রের জন্যে এক হাতা স্যুপ ও একটুকরো রুটির আশায় এলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় দু'এক জন। মাথা হেঁট করে', অপমানের ভারে নুইয়ে পড়ে' তারা সবাই এসে দাঁড়ায় স্যুপ-সত্রের সুমুখে। হাতা ভরে' স্যুপ বিতরণ করা হয় এক সার, বড়জোর দু'সার। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা সর্-সর্ শব্দে ফিল্ম তুলে চলে। সৈনিকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে, ব্যঙ্গোক্তি করে এবং ক্লিক্-ক্লিক্ শব্দে ফটো তোলে। ফটো তোলা শেষ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়

২১

স্যুপ-বিতরণ। জার্মানরা বন্দুক উঁচিয়ে, গালিবর্ষণ করে' ভিড় ভেঙ্গে দেয়। প্রার্থীর দল শূন্যহাতে বাড়ী ফেরে। *

দেখি জার্মান সৈনিকদের ফটো তোলার সখ। যেসব পথ দিয়ে ধ্বংস-স্তূপের দৃশ্য এড়িয়ে পোলরা তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করে' চলে' যায়, সেইখানে তিন-চার তলার সমান উঁচু ভগ্নস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জার্মানরা পরস্পরের তস্বীর খেঁচে আর চীৎকার করে' হাসে। ভারশৌএর ধ্বংসাবশেষের পটভূমির সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বামীর বীরত্বে মুগ্ধ হবে জার্মানী ফ্রাউ-বৃন্দ, এ আনন্দ তাদের রাখবার জায়গা নেই।

প্রাণের দাম এখন পোলদেশে নেই বললেই হয়। যুদ্ধের পর পোল সমাজ যখন আবার স্থির হয়ে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছে, তখন জার্মানদের মনে পড়ে' গেল, প্রতিশোধটা যেরকম হওয়া উচিৎ ছিল, ঠিক সেরকম হয় নি! সুরু হ'লো প্রতিহিংসার অগ্নিকাণ্ড। পথে-চলা পুরুষের দলকে রাস্তার দু'দিক বন্ধ করে' জালে ধরার মত পাকড়াও করা জার্মানদের একটা স্পোর্ট্ হয়ে দাঁড়ালো। পথে বেরুলে স্বামী-পুত্র যে ঘরে ফিরবেই এমন কোনো স্থিরতা নেই। রাত দুপুরে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা শোনা যায়। দরজা খুলে বুড়ী মা অস্ফুট আর্তনাদ করে' ওঠেন। ছেলের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে জার্মানরা হল্লা করতে করতে চলে' যায়।

এই যে দিনের পর দিন এত পুরুষ ধরা হ'চ্ছে এদের কোনো খবর নেই। কখনো কখনো কোনো ইহুদীর কাছে শুনি, ব্যবস্থাপক সভার সংলগ্ন মাঠে তাকে ধরে' নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বেগার খাটাবার জন্যে। সেখানে তাকে দিয়ে লম্বা খানা খোঁড়ানো হয়েছে। বলে, তারপর এলো সারি সারি পুরুষ! তাদের দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হ'লো। কল-বন্দুকের গুলিতে তাদের অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়ে। তাদের টেনে

* রাদিও-বক্তৃতায় বিবৃত।

এনে খানা ভর্তি করা হয়, তার পর ইহুদীদের দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। ইহুদীদের দিয়ে এ কাজ করানোর উদ্দেশ্য, তাদের কথা জগৎ-সুদ্ধ লোক হেসে উড়িয়ে দেবে। প্রায়ই রাত্রির বুক চিরে ওঠে কল-বন্দুকের ধক্‌ধকানি, শুনতে পাই নিজের ঘর থেকে। আর এক সারি লোক হয়তো শুয়ে পড়লো।

পাদ্রীদের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর শুনতে পাই। তারাই নাকি যত নষ্টের গোড়া। পোল জনসাধারণ এবং বিশেষ করে' চাষাদের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ। সুতরাং তাদের নিশ্চিহ্ন করা চাই। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দিয়ে নিজের হাতে কবর খুঁড়িয়ে নিয়ে তবে গুলি করে' মারা হয়। মারার পর তাদের পা ধরে' টেনে নিয়ে এসে খানায় ফেলবারও প্রয়োজন হয় না। খানার ওপরেই দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় এমনভাবে যাতে দণ্ডিতের দেহ হুমড়ি খেয়ে খানায় গিয়ে পড়ে আপনা আপনি। *

এইসব "অপরাধী"দের "ফেউ" † অথবা গ্রেপ্তার করবার ভার পড়েছে বিশ্ব-কুখ্যাত গেস্তাপোর হাতে। তারা সর্বত্র দেশের মানুষের পেছনে পেছনে ছায়ার মত চলেছে। সুধু নিজেরা নয়, তারা এই কাজে লাগিয়েছে আবোধ পোলীয় ইস্কুলের ছেলেদের। এদের বয়েস বারো থেকে ষোল সতেরো। ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, বাড়ীতে খাবার নেই। সুতরাং এদের কাঁচা পয়সায় কেনা হ'চ্ছে দলে দলে। ভেতরকার কথা বাইরে আনতে এদের দ্বিতীয় নেই। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে এই অবোধ বালকগুলি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়ে নানা রংচঙে খবর এনে হাজির করছে।

* রাদিও-বক্তৃতায় বিবৃত।

† Shadow, বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের ভাষা।

তাতে তাদের নিজেদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। মোটা মোটা পুরস্কার আছে, হোক্ না তাদের খবর সম্পূর্ণ অলীক। বেচারীরা এত ছেলেমানুষ যে, অনেক সময়ে বুঝতে পারে না, তাদের খবরে একজনের প্রাণনাশ হ'লো। দেশের ছেলেদের এইভাবে নীতিভ্রষ্ট করা, এও ausrotten und vernichten করার একটা উপায় কিনা বলা যায় না।

গেস্তাপোদের গ্রেপ্তার করবার এক অভিনব কায়দাও চোখে পড়লো। যেখানেই তিন-চার জন লোকে একত্র হয়ে গল্প-গুজব করছে রেস্তোরাঁ বা অন্য কোথাও, সেইখানেই গেস্তাপোর শিকারস্থল। হঠাৎ কয়েকজন সাধারণ পোষাক পরা লোক এসে ঢোকে। গল্পরত লোকদের কাছে গিয়ে তাদের প্রত্যেককে এক একজন তফাতে নিয়ে যায়। তার পর চলে জেরা। কী কথা হ'চ্ছিল বল। এই অবস্থায় সবার কথা সবার সঙ্গে মেলা সম্ভব নয়, কারণ সবার স্মৃতিশক্তি সমান নয়, এবং প্রত্যেকেরই বিবরণ-ভঙ্গী অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। এটুকুও উপলব্ধি করবার মত বুদ্ধি নেই বা প্রবৃত্তি নেই এই গেস্তাপোর গোয়েন্দাদের। একজনের বিবৃতির সঙ্গে অপরের বিবৃতি না মিললে তারা তৎক্ষণাৎ আপন আপন শিকারকে পাকৃড়াও করে' নিয়ে চললো। তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, তার আভাষ একটু ওপরেই দেওয়া হয়েছে। কারো কারো কপালে দুর্ভোগ লেখা থাকলে, প্রাণদণ্ডের বদলে হয় অজ্ঞাত কারাবাস। অর্থাৎ তাদের অল্পে অল্পে দগ্ধে' দগ্ধে', হাত পা ভেঙ্গে, অনাহারে এবং নানা ছোট ছোট অসম্মান ও নির্য্যাতনে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে' মারা হবে। দৈববলে যে দু'একজনের আত্মীয়-স্বজন গেস্তাপোদের মোটা ঘুষ খাইয়ে তাদের খালাস করেছে তাদের চেনা যায় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা মস্তিষ্কের বিকৃতি বা দুরারোগ্য স্নায়বিক ব্যাধিতে ভুগছে।

জার্মান-অধিকৃত পোলদেশে মৃত্যুদণ্ড পদে পদে, এমন কি রাদিও রাখাও মৃত্যুদণ্ডার্হ। জার্মানরা পোলদেশে Zivilverwaltung চালু করার দু'এক দিনের মধ্যেই ঘোষণা করলে, সর্বসাধারণ যেন তিন দিনের মধ্যে আপন আপন রাদিওযন্ত্র স্থানীয় পুলিসে জমা দেয়। ওদেশে রাদিওর চলন ছিল অন্য দেশের চেয়ে একটু বেশী। সামান্য গৃহস্থ বা মুটে-মজুরের ঘরেও রাদিও দেখা যেত। সুতরাং পয়সাকড়ি জমা দেবার সময়েও যে কাণ্ড ঘটলো রাদিও জমা দেবার সময়েও তাই। হাজারে হাজারে মানুষ ছোট বড় নানা আকারের এবং নানা প্রকারের রাদিওযন্ত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হ'লো থানার সাম্‌নে। সেখানেও ক্রোশখানেক লম্বা মানুষের সারি নিদারুণ শীতে রাস্তায় রাত কাটাতে লাগলো রাদিও জমা দেবার জন্যে, এবং সেখানেও তাদের অনেকের ভাগ্যে জুটলো জার্মানী সৈনিকদের বন্দুকের গুঁতো। এই যন্ত্রগুলি সরকার থেকে সুধু জমা নেওয়া হ'লো, এবং তাদের পেছন দিকে কাগজের ওপর মালিকদের নাম-ধামও লিখে দিতে বলা হ'লো। কিন্তু কয়েকদিন পরেই পোলরা অবাক্ হয়ে দেখলে, পথ দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লরী-বোঝাই হয়ে গাদা গাদা রাদিওযন্ত্র চলেছে সহর ছেড়ে জার্মানী-মুখো।

যুদ্ধের পর ভারশোএ টেলিফোঁক্‌ও খোলা হ'লো। কিন্তু সে যন্ত্রটি ফোঁকাও যা আর শিঙ্গে ফোঁকাও তাই। কার সঙ্গে কী কথা হ'লো, সব শুনছে গেস্তাপোর অনুচরেরা। টেলিফোনের কথা বেশীর ভাগ সময়েই সাঁটে হয়ে থাকে। এবং কথা যত সাঁটে হয়, গেস্তাপোর সন্দেহ ততই বাড়ে।

হ্যালো, অমুক ?

হ্যাঁ।

খবর ভালো ?

না খুব ভালো নয়। সে অনেক কথা, দেখা হ'লে বলবো।

এই ধরণের কথোপকথন যে উভয় বক্তার কারাবাসের কারণ হয়েছে, একথা প্রায়ই শুনি।

জার্মান-অধিকৃত পোলদেশে নিকৃষ্ট অত্যাচারগুলো প্রায়ই হ'চ্ছে বেচারী ইহুদীদের ওপর। তার দু'একটা উদাহরণ এই : ইহুদীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এবং তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে বেগার খাটাবার জন্যে ধরে' আনা হ'চ্ছে। দেখি রাস্তা জুড়ে ইহুদী "রেজিমেণ্ট্" শীতে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে সহরের মেথর ও ঝাড়ুদারগিরি করবার জন্যে। রাস্তায় ভদ্র ইহুদীকে পাক্ড়াও করে' নিয়ে গিয়ে সৈন্যদের পায়খানা সাফ্ করানো জার্মানদের একটা প্রিয় স্পোর্ট্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো একটি স্পোর্ট্ হ'চ্ছে দু'জন ইহুদীকে পরস্পরকে চপেটাঘাত করতে বলা। তারাও নিরুপায় হয়ে প্রথমে ঠুস্ করে' চড় মেরে যুদ্ধ আরম্ভ করে। পরে চড়ের ওজন বাড়তে থাকে এক অদ্ভূত উপায়ে এবং শেষে তারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে ভীষণ মারামারি সুরু করে' দেয়। সে দৃশ্য দেখে জার্মানী সৈনিকরা চীৎকার করে' হাসে। ইহুদীদের ওপর যেসব পাশবিক অত্যাচার চলেছে তার বিবরণ দু'একখানা বইএ দেওয়া সম্ভব নয়। তাকে "পাশবিক" অত্যাচার বললে, সমগ্র পশুজাতির প্রতি অবিচার করা হয়। মানুষে পশুতে তফাৎ, মানুষের হাসবার ক্ষমতা আছে, পশুর তা নেই। আশ্চর্য্য হ'তে হয় এই জার্মান মানুষদের রসবোধের দৃষ্টান্তে। ইহুদী স্বামীর হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে স্ত্রীকে বিবস্ত্রভাবে প্রহারের ব্যবস্থা বা অন্য স্পোর্ট্ কোনো পশুর মাথায় ঢুকেছে বলে' বিশ্বাস হয় না।

জার্মানদের রসবোধের একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তের বিবরণ, যা দু'একজন সত্যনিষ্ঠ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বয়স্ক অধ্যাপকের কাছে শুন্‌লাম, আপনাদের

কাছে তার পুনরুক্তি করা কর্তব্য মনে করি। ঘটনাটি ভারশৌএর নয়, ক্রাকুভের।

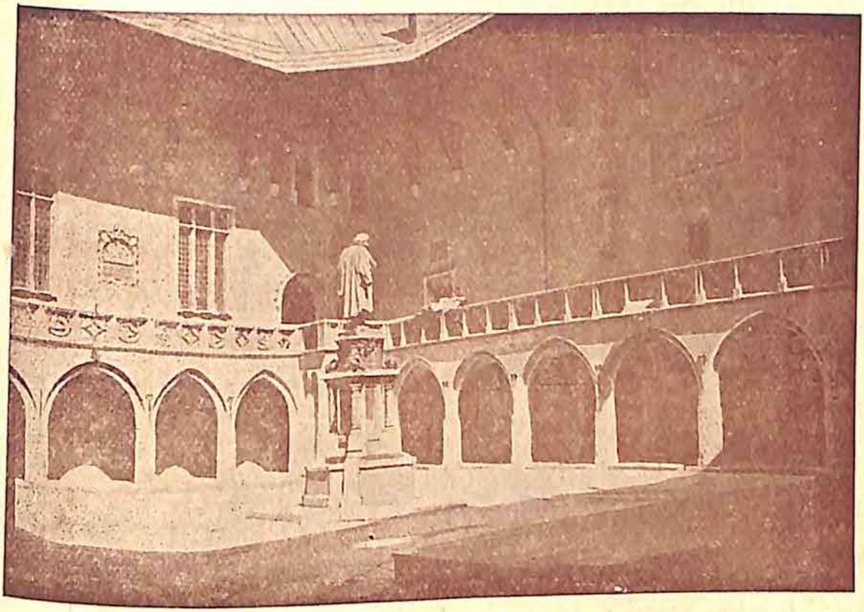
ক্রাকুভের বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের প্রাচীনতম শিক্ষানিকেতনের একটি, একথা যেকোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক যেকোনো জ্ঞান-ভারতীর পাতায় উল্লিখিত দেখতে পাবেন। এইখানেই পোল জ্যোতির্বিদ্ কোপের্নিক্ (কোপের্নিকুস্ পোলীয় নামের লাতিনীকৃত রূপ) আপন শিক্ষা অর্জন করেন। পোলীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থল এই ক্রাকুভে। নগরটি যে সম্পূর্ণরূপে পোলীয় সেবিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে তার স্থাপত্য ও জনসংখ্যা, ইতিহাসের সাক্ষ্য না হয় নাই স্বীকার করা গেল। মাত্র শতাব্দীকাল এই ক্রাকুফ্ আউস্ত্রিয়ার অধীনে অতিবাহিত করে, যদিও তাতে তার পোলীয়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। তত্রাচ জার্মনরা ক্রাকুফ্ অধিকার করবার পর সেইখানেই বিজিত পোলদেশের শাসন-কেন্দ্র স্থাপন করলে, এবং সর্বত্র সোল্লাসে ঘোষণা করলে—Krakau wieder ein Deutsche Kulturzentrum—অর্থাৎ ক্রাকুফ্ পুনরায় একটি জর্মান সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত হ'লো। নব-নিযুক্ত লাট সাহেব ফ্রাঙ্ক্ ক্রাকুভে তাঁর হুকুমৎ-এর ঘাঁটি করে' শাসন ও শোষণকার্য্য চালিয়ে চললেন। কিন্তু এতেও তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না।

যে ডক্টর ফ্রাঙ্ক্ কিছুদিন আগে ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরের উপাধি লাভ করেছিলেন, এবং যাঁকে পোলরা একদিন তাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী জ্ঞান করতো, সেই ফ্রাঙ্ক্ সাহেব তাঁর অধ্যাপকের মগজ থেকে পোলদের জব্দ করবার এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। অধ্যাপক হিসেবেই তাঁর একথাটা স্পষ্টরূপে জানা ছিল যে, কোনো অধিকৃত দেশের পূর্ণাঙ্গ ধ্বংসীকরণের কাজে চাই তার শিক্ষা-সংস্কৃতির ধ্বংসীকরণ। এবং একাজে যত নষ্টের গোড়া মাষ্টারকুলকে বিনষ্ট না করতে পারলে

পোলরা একদিন না একদিন মাথা তুলবেই। সুতরাং নিতান্ত ভালো মানুষের মত ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত হুকুমৎ-এ বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় চালু করতে চান্। অর্থাৎ ক্রাকুফ্ বিশ্বাবিদ্যালয়ের তোরণ অচিরে উদ্‌ঘাটিত হবে। এইসূত্রে তিনি প্রাক্তন অধ্যাপকবৃন্দের মূল্যবান পরামর্শ নিতে ইচ্ছুক। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট ক্ষণে যেন অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হাজির হন্।

অধ্যাপকরা এতদিন বেমালুম গা ঢেকে ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটনের সংবাদ শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ছেলে ঠেঙাবার মোহ যে আফিং-কোকেনের নেশার চেয়েও প্রবল, সেকথা মাষ্টারমাত্রেরই বোধ হয় জানা আছে। যাই হোক্ খবর পেয়ে বেচারীরা আপন আপন দরবারী পোষাক-পরিচ্ছদ রোদে দিয়ে ঝেড়ে মুছে, টপ্-হ্যাট্‌টি বগলে পূরে নির্দিষ্ট দিনে দলে দলে এসে হাজির হ'লেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংখ্যায় তাঁরা জন চল্লিশ ছিলেন, কারণ যুদ্ধের পর অনেকের খবর পাওয়া যায় নি। বেশীর ভাগই অতি বৃদ্ধ, পঞ্চাশ ষাটের নীচের বয়েসের মানুষ খুব কমই। তাঁদের কেউ কেউ অশীতিপর।

নির্দিষ্ট ক্ষণে ডক্টর ফ্রাঙ্ক্ বক্তার মঞ্চে দণ্ডায়মান হয়ে সংক্ষেপে জানালেন, যেহেতু পোলীয় অধ্যাপকরা বরাবর জার্মানদের বিরুদ্ধাচরণ করে' এসেছেন, সেইহেতু তাঁদের আজ গ্রেপ্তার করা হ'লো। বেচারী অধ্যাপকদের গাড়ী বোঝাই করে' ধরে' নিয়ে যাওয়া হ'লো। দু'একজন অধ্যাপক সময়মত এসে উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি, তাঁরাই অদৃষ্টগুণে বেঁচে গেলেন। তাঁরাও জোরজবরদস্তি করে' বন্ধ দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কয়েকটি সহৃদয় জার্মান সান্ত্রী তাঁদের বলে—Sind Sie verrueckt—ক্ষেপেছেন আপনারা!—এবং ইসারায় প'এ আকার দেবার পরামর্শ দেয়। তাঁরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে প্রাণ বাঁচান।



ক্রাকুফ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের
আভ্যন্তরীণ দৃশ্য।

যাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'লো, তাঁদের হালকা দরবারী পোষাক সমেত ছাদহীন মালবাহী রেলের গাড়ীতে পূরে জার্মানী চালান করা হ'লো। এবং সেখানের কোন্ এক অজ্ঞাত বন্দীশালায় অজ্ঞাত সময়ের জন্যে তাঁরা আটক রইলেন। এই নিদারুণ শীতে বন্দীশালার পথেই কেউ কেউ মারা গেলেন। যাঁরা গিয়ে বন্দীশালায় পৌছলেন তাঁদেরও অনেকে সেখানে প্রাণত্যাগ করলেন। তার প্রধান কারণ অনাহার ও শীত। শোনা গেল, দিনে একবার কিছুক্ষণ ধরে' নল দিয়ে তাঁদের ঘরে গরম বাষ্প ছাড়া হ'তো। তার পর বাষ্প ক্রমে জল হয়ে তা বরফে পরিণত হ'তো, এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বাইশ ঘণ্টা তাঁদের এই অভিনব ফ্রিজিডেয়ারে অতিবাহিত করতে হ'তো। একটি একটি করে' প্রাণ হারিয়ে যখন বন্দী অধ্যাপকদের সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশের জায়গায় আঠারো, তখন তাঁদের ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। এঁদের সবাই ছিলেন পোলদেশের জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক। অশীতিপর বৃদ্ধ, পোল সাহিত্যের ঐতিহাসিক অধ্যাপক হ্শানফ্স্কির ভাগ্যে দেশে ফেরা হ'লো না।

পথে জার্মানী সৈনিকদের দৌরাত্মে স্ত্রীলোকের চলা-ফেরা দুরূহ হয়ে উঠেছে। পোলদেশ জয় করার পর সেখানে হিট্লারের দুলালদের লীলাভূমি তৈরী হয়েছে। কোনো সুকীর্তির জন্যে পারিতোষিকরূপে সৈনিক বা অফিসারদের পোলদেশে পাঠানো হয়, প্রথমতঃ দুধ-ঘি খাওয়াবার জন্যে, দ্বিতীয়তঃ বিশ্রামের জন্যে। মোটকথা ছুটি পেলেই জার্মানরা এসে হাজির হয় পোলদেশে। এখানে চলে যেমন আহার সেই পরিমাণে বিহার। আসে ঝলঝলে, ঢলঢলে উর্দি নিয়ে, দু'সপ্তাহ যেতে না যেতে তারা উর্দির বোতাম আঁটতে পারে না। পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোনো পছন্দসই স্ত্রীলোকের মুখ দেখলে নানা অশ্লীল

প্রস্তাব করতে দ্বিধা করে না। দুঃখের বিষয়, এই ছোকরাগুলিকে দেখলে অনেক সময়ে ভদ্র-ঘরের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র বলে' মনে হয়। অথচ এরাই পথে-চলা মহিলার মাথা থেকে টুপি ফেলে দিতে বা তাঁদের গায়ে ছপটি লাগাতে সামান্যমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।

জার্মান অধিকারের কিছুদিন পরে পোলদেশে সুরু হ'লো এক অভিনব বৈজ্ঞানিক ধ্বংসলীলা। এ ধ্বংস আধুনিক পোলজাতির নয়, ভবিষ্যতে পোলভূমিতে জন্মগ্রহণ করে' যারা হয়তো একদিন দেশের বিলুপ্ত গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতো, চললো তাদেরই নিশ্চিহ্নীকরণ। চললো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক উপায়ে যুবক-যুবতীর জনন-শক্তির বিনাশ।

Ausrotten! Vernichten!

যুদ্ধে বিধ্বস্ত পোলদের কথা যখন ভাবি তখন একটা দৃশ্য মনে পড়ে। সমস্ত ভারশৌ যেন একটা একটানা কবরস্থান। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ তিন চার তলার সমান উঁচু হয়ে পড়ে' রয়েছে। সহরের সর্বত্র গলিতদেহের পূতিগন্ধ। রাস্তা দিয়ে চলেছে সারি সারি ছিন্নবাস, ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্ষুধার্ত মানুষ। শুনতে পাই জার্মান সৈনিকদের ভোঁতা বুটের কুচ্‌কাওয়াজী চাল আর তাদের উল্লসিত জয়-সঙ্গীত। জগতে তারা Kultur এর, সংস্কৃতির বিস্তার করতে চায়। শেষ কথাগুলো একসঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করে' বাজে—und morgen die ganze Welt!

পোলরা উন্মত্তের মত শূন্য আকাশের দিকে তাকায়, ফরাসী ও ইংরেজ বোমারু বিমান তাদের মুক্তি দিতে এলো বুঝি!

ছ'মাস পরে পোলদেশ ছাড়বার অনুমতি পেলাম। মার্কিনী কন্‌সুল্ হয়তো বিবেকের তাড়নায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার তত্বাবধান সুরু করলেন। Morning Post-এর ভারশৌস্থিত সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত সাইক্‌স্ পোলদেশ থেকে ব্রিতানীদের উদ্ধারের বিবৃতি দিয়ে শেষকালে লিখেছিলেন—রোমানিয়ার সীমান্ত পার হয়ে যখন দেখলাম, পোলদেশ-প্রবাসী প্রত্যেকটি ব্রিটিশ প্রজাকে উদ্ধার করা গেছে, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাই হোক্, শুন্‌তে পেলাম মার্কিনী কন্‌সুল্ আমার তদ্বির করছেন। আমার নিজের দিক থেকেও চেষ্টা কম করতে হ'লো না। যতদুর বোঝা গেল, এ ক্ষেত্রে আমার প্রধান সহায় হ'লো, আমি শিখ নই, পাঠান নই, জাঠ নই, মারাঠা যোদ্ধ-ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, গুর্খা নই। আমি মাষ্টার-পুঙ্গব বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, আমি জীবনে হাতিয়ার ধরি নি, কুচ্‌কাওয়াজ করিনি, এমন কি ইস্কুলে ড্রিল পর্য্যন্ত করি নি। আমি পিস্তল ও রিভল্‌বারের ফারাক্ জানি না, রাইফেল এক-নলা কি দো-নলা হয় তাও জানি না। জীবনে একটিমাত্র অস্ত্র ধারণ করবার সৌভাগ্য ঘটেছে, সেটি হ'চ্ছে পেন্সিল-কাটা ছুরী, তাও হাত কাটবার ভয়ে অভিভাবকরা নিজেদের তত্বাবধানে রেখে দিতেন। সুতরাং এহেন অকর্ম্মণ্য মানুষকে জার্মানদের আটকে রেখে লাভ কী?

আমার বাগ্‌দত্তা এর আগেই দেশ ছাড়বার অনুমতি পেয়েছিলেন। কেন জানি না, জর্মান সরকার মেয়েদের দেশ ছাড়ার বিশেষ পক্ষপাতী দেখা গেল। অবশ্য তিনি যে কখনো দেশে ফিরবেন না এবং তাঁর স্থাবর সম্পত্তির কোনোদিন দাবী করবেন না, এই মর্মে তাঁকে মুচল্‌কা লিখে দিতে হ'লো। দিদি ও মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এবং জার্মানদের অনুমতিতে দশ মার্ক্ (৮৲) ও ইতালীয় সীমান্ত পর্য্যন্ত ত্ব'খানি টিকিট পকেটে নিয়ে আমরা একদিন ট্রেনে উঠে বসলাম।

তাতেও নিস্তার নেই। আউস্ত্রিয়ার সীমান্তে আমাদের কিছুক্ষণ আটক করে' রাখা হ'লো, আমাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু থাকে ত শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ধরে' রাখা যাবে এই উদ্দেশ্যে। সেখানেও আমায় একই কৈফিয়ৎ দিতে হ'লো, আমি শিখ নই, গুর্খা নই, আমি হাতিয়ার ধরতে জানি না, আমি মাষ্টার-পুঙ্গব বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে আছে, অবশেষে যখন নিষ্কৃতি পেয়ে আমরা ইতালীয় সীমান্ত অতিক্রম করলাম, তখন আমরা পাগলের মত চীৎকার করে' উঠলাম—Viva la libertà, viva viva !

কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৪৮।

পরিশিষ্ট।

বলা বাহুল্য, সমগ্র পোলদেশে মাসাধিক কাল ধরে' যে যুদ্ধ চলেছিল, তার পরিপূর্ণ রূপ সর্বদর্শী বিধাতা ব্যতীত কোন একজন মর-মানুষের চোখের সুমুখে একই কালে ব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। কাজেই কয়েকটি সাংবাদিকের বিবৃতি থেকে পোল-জর্মান সংগ্রামের যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তারই চুম্বক উপস্থিত গ্রন্থকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করবার জন্যে অত্র সংযোজন করলাম।

৩১শে আগষ্ট পোলদেশের আক্রমণকল্পে যে জর্মানসেনা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সীমান্ত-প্রদেশে অপেক্ষা করছিল তার মোটামুটি হিসেবটা এই :

মোট ৫৪ ডিভিশন্ ও ১৬ ডিভিশন্ মজুত। অর্থাৎ সর্বসমেত ৭০ ডিভিশন্।

বিমান-বাহিনী—২০০০।

আগেই বলা হয়েছে, পোলদেশে "সার্বজনীন রণসজ্জা" শেষমুহূর্তে ঘোষিত হ'লেও, সৈনিকরা আপন আপন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌছতে পারে নি, এবং পোল জনবলের অর্দ্ধাংশকেও প্রস্তুত করা হয়ে উঠে নি। ফলে যুদ্ধের প্রথম দিনে পোল সেনার যে রূপ দাঁড়ালো তা এই :

২২ ডিভিশন্ সীমান্তদেশে।

৮ ডিভিশন্ সহকারী।

৬ ডিভিশন্ মজুত।

মোট ৩৬ ডিভিশন্। এদের অধিকাংশই পদাতিক ও অশ্বারোহী।

বিমান-বাহিনী—৪০০।

জার্মানদের রণ-কৌশল—চিম্‌টা-গতিতে (pincer movement) অগ্রসর হওয়া। এবং এই চিম্‌টের গতি বিদ্যুৎগতিকে হার মানিয়ে দেয়। উপরন্তু অরক্ষিত নগর ও গ্রাম এবং পোলসেনার পেছনে সমগ্র দেশের ওপর বোমারু কর্তৃক বজ্র-অভিযান।

১লা সেপ্টেম্বর।

জার্মান আক্রমণ। উত্তরে—চ্যেহানুক্, মদলিন্, গ্রু দ্‌জিয়াদ্‌জ্, তরুন্, ব্যীদ্‌গশ্চ্, হেল্‌ম্‌নো। দক্ষিণে—শ্রেরাদ্‌জ্ লুদ্‌জ্, লভিচ্, ক্যেল্‌ৎসে। এই দুই আক্রমণ-রেখার মাঝখান দিয়ে ব্লিৎস-গতিতে ছুটে চললো বিরাট আর্মার্ড্ ও মোটার ডিভিশন্ চেঁস্তোহোভা—প্যত্র্‌কুফ্—ভারশৌএর বড় রাস্তা ধরে'। দক্ষিণে কার্পাত্যী-পাহাড় ভেদ করে', স্লোভাকিয়া থেকে আক্রমণ করা হ'লো ক্রাকুফ্ ও তার্নফ্-এর দিকে।

বিমান আক্রমণের প্রসাদে পোলদের রণসীমান্তের সব খবর জার্মানরা পেলে নখদর্পণে, তাছাড়া রেল, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের ধ্বংসীকরণে যুদ্ধরত সৈন্য ও হুকুমৎ-কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে সৈন্যচালনার ব্যবস্থা একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে আকাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যদের মধ্যে ছত্রভঙ্গভাব দেখা দিলে।

৫ই সেপ্টেম্বর।

৪৮ ঘণ্টা ক্রমাগত যুদ্ধ চালানোর পর পোলদের আত্মরক্ষার শক্তি

ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়লো। উত্তরে হেল্‌ম্‌নো ও মদ্‌লিনের কাছে গ্রামগুলি অধিকৃত হ'লো—দক্ষিণে লূদ্‌জ্‌, প্যত্রকুফ্‌, ক্যেল্‌ৎসে। তাছাড়া দক্ষিণ-পূবে ও উত্তর-পশ্চিমে জার্মান বাহিনী হানা দিলে। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের যুদ্ধের মাল-মসলা তৈরী করবার কারখানাগুলি অচল হয়ে পড়লো।

৯ই সেপ্টেম্বর।

জেনা রাইন্‌হার্ৎ ভারশৌ দখল করবার জন্যে প্রণপণ চেষ্টা করে' বিফলমনোরথ হন্‌। ভারশৌএর প্রতিটি বাড়ী কেল্লায় পরিণত হ'লো। বিফলকাম রাইন্‌হার্ৎ, যিনি ভারশৌ অধিকার করার খবর কিছু আগে হিট্‌লার-চরণে নিবেদন করেছিলেন, তিনি হন্তদন্ত অবস্থায় নগর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেন।

১২ সেপ্টেম্বর।

পশ্চিমে পোল জেনা কুট্‌ছেবা ও বর্ত্‌নফ্‌স্কি জার্মানদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন্‌। জেনা কুট্‌ছেবা জার্মানদের রীতিমত ঘায়েল করে' শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হন্‌ এবং ভারশৌএ পৌছে দেখেন, জেনা রূম্মেল্‌ আগে থেকেই নগর রক্ষা করছেন। জেনা বর্ত্‌নফ্‌স্কি ভারশৌএর পথে মিন্‌স্ক্‌ ও কালূশিনের কাছে বিরাট পূর্ব প্রুশীয় সেনাদল প্রায় ধ্বংস করে' ফেলেন।

সেনানায়ক শ্মীগ্‌ল্যি-রীদ্‌জ্‌ ভারশৌ থেকে পিন্‌স্ক্‌ জলা-ভূমি (যেখানে গত মহাযুদ্ধে একটি জার্মান সৈন্যদল সশরীরে পাতাল-প্রবেশ করেছিল) ও ভীস্‌লা-সান্‌ রেখা জুড়ে একটি সমকোণ সৃষ্টি করবার প্লান্‌ ঠিক করেন। কিন্তু ল্‌ভূফ্‌ থেকে জার্মান আক্রমণে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এইবার দক্ষিণ অঞ্চল রক্ষা করবার ভার পড়লো জেনা সস্ন্‌কফ্‌স্কি'র ওপর। পোলরা যেভাবে যুদ্ধ চালিয়ে চললো, এবং এই জেনারেল-চতুষ্টয়, কুট্‌ছেবা, রূম্মেল, বর্ত্‌নফ্‌স্কি ও সস্ন্‌কফ্‌স্কি যেভাবে জার্মানদের ঘায়েল করতে

লাগলেন তাতে আশা হ'লো, পোলরা বেশ কিছুদিন যুঝ্‌তে পারবে। ১২ই থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জার্মানরা তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আর্মার্ড্‌ ও মোটার ডিভিশন্‌ নিয়েও পোলদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করতে পারলে না। অবশেষে ১৭ই রুশীদের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে পোলরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো।

১৭ই সেপ্টেম্বর।

পোলদেশের ইতিহাসে বরাবর যা ঘটেছে এবারও তাই ঘটলো; জার্মানী ও রুশিয়ায় মিলে পোলদেশকে ভাগাভাগি করে' নিলে। অতর্কিতে "পিঠের ওপর ছুরী" খেয়ে পোলরা পঙ্গু হয়ে পড়লো। দেশরক্ষা করা অসম্ভব জ্ঞান করে' পোল সরকার যথা, শ্মীগ্‌লি্য সাহেব, বেক্‌ সাহেব, অধ্যাপক মশ্চীৎস্কি প্রভৃতি দেশ ছেড়ে সরে' পড়লেন। একগুঁয়ে জেনারেলরা সেনানায়কের তোয়াক্কা না রেখে লড়ে' চললেন। শ্মীগ্‌লি্য, বেক্‌ এবং কোম্পানী রোমানিয়ায় নজর-বন্দী হ'লেন। তবে তাঁদের সঙ্গে যে লাখে লাখে সামরিক ও অসামরিক পোল পুরুষ দেশ থেকে বেরিয়ে গেল, তারাই আজ সর্বত্র ইংরেজদের সেনায় ভর্তি হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে, এবং যাদের প্রশংসা আমরা আজকাল কাগজপত্রে আকছার দেখতে পাচ্ছি।

২১শে সেপ্টেম্বর।

জেনা বর্ত্‌নফ্‌স্কি কুৎনো-তে চারদিন ভীষণ যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। জার্মানরা এই কুৎনোর যুদ্ধকে ইতিহাসের একটি বৃহত্তম যুদ্ধ বলে' স্বীকার করেছে।

২২শে সেপ্টেম্বর।

জেনা লাঙ্গের রুশদের কাছে ল্‌ভূফ্‌ সহর সমর্পণ করতে বাধ্য হন্‌।



Free Europe, July 26, 1940

…জার্মানী ও রুশিয়া কর্তৃক
পোলদেশের অংশীকরণের
সীমান্ত-রেখা।

রুশ-আক্রমণের পূর্ব্বাহ্নে পোল-
জর্মান যুদ্ধের অবস্থা।

৯—২৪ সেপ্টেম্বর। ভারশৌ।

ভারশৌ তিনটি কৃতকর্মা জেনারেল, রূমেল, চুমা ও কুট্‌ছেবার নেতৃত্বে অলৌকিক বীরত্বের সঙ্গে আত্মরক্ষা করেছে। নগরপতি শ্রীযুত স্তাঝীন্‌স্কি এক মুহূর্তের জন্যে নগরবাসীদের সাহস বা ধৈর্য্যের বিচ্যুতি ঘটতে দেন নি।

২৫শে সেপ্টেম্বর।

ভারশৌ ভীষণভাবে আক্রান্ত হয় এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে সহরের প্রায় তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হ'য়ে যায়। সহরে তখন দস্তুরমত দুর্ভিক্ষ সুরু হয়ে গেছে। একটি বিবরণে পড়লাম, নাকি পোলসেনা নগরবাসীদের খাদ্যের জন্যে প্রতিদিন সাতশ' করে' উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া বধ করতে বাধ্য হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর।

ভারশৌএর ত্রি-চতুর্থাংশ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। নগর রক্ষা করতে মরেছে প্রায় দু'লাখ মানুষ। অবশিষ্ট নগরবাসিরা পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত। সহরে খাদ্য নেই, এক ফোঁটা জল নেই, আলো নেই। সর্বত্র গলিত জীবদেহের পূতিগন্ধ। পাড়ায় পাড়ায় মহামারী প্রেত-নৃত্য সুরু করেছে। তার ওপর লড়বার হাতিয়ার ও গোলা-বারুদের অনটন ঘটলো। জার্মানরা একদিন আগে নগরবাসীদের জানিয়ে দিয়েছে যে, এখনও আত্মসমর্পণ না করলে তারা গ্যাস ছেড়ে সহরের যাবতীয় প্রাণীকে নিঃশেষ করে' দেবে। গ্যাসের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার মত জান্‌লার শার্শীগুলি বোমার আওয়াজে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

বিধ্বস্ত নগরী যুদ্ধে বিরত হ'লো।

২৯ সেপ্টেম্বর।

জার্মানদের ভারশৌ-প্রবেশ। ঐদিনই হেল্ ও মদ্‌লিন্-এর দুর্গ আত্মসমর্পণ করে।*

৬ই অক্টোবর।

কৎস্ক্-এর কাছে ঘোরতর যুদ্ধ।

১৩ই অক্টোবর।

মিন্‌স্ক্-এর কাছে যুদ্ধ চলেছে।

১৯৪০ সাল, এপ্রিল।

কার্পাত্যী ও তাত্রী পাহাড়ের ওপর পোলরা জার্মানদের বিরুদ্ধে সমানে গেরিল্লা-যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে।

ইতালীয়দের সঙ্গে হাব্‌শীরা যুঝেছিল ছ'মাস, আর জার্মানদের সঙ্গে পোলরা এক মাসের বেশী লড়তে পারলে না, এই নিয়ে হাটে বাজারে পোলদের সম্বন্ধে যে দুর্নাম রটেছিল, তার চেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তাদের নিজেদের আত্মসম্মান। ইউরোপের অন্যান্য দেশের অনুরূপ অবস্থায় পোলদের সে আত্মগ্লানি আজ ঘুচলো। হিট্‌লারের ব্লিৎস্-যুদ্ধের প্রথম চোট্‌টাই যে পোলদেশের ওপর পড়েছিল, যখন পোলরা সম্পূর্ণরূপে অ-সজ্জিত, এবং সমগ্র পোলদেশে যে বোমা ফেলা হয়েছিল তার অধিকাংশ কেন, প্রায় সবগুলিই যে এক টন্ ওজনের, অর্থাৎ হিটলার সাহেব প্রায়

* K. Smogorzewski—Free Europe, December 1939.
St. Ordon—Luna nad Warszawą—Bucureşti, 1940.

বোমার ভাণ্ডার শূন্য করে' পোলদের দু' হাতে বিতরণ করেছিলেন, সেকথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। পোল-জর্মান যুদ্ধের পর প্রায় আট মাস কাল ইউরোপের অন্যান্য দেশ প্রস্তুত হবার সময় পেয়েছিল, এবং সে কাজে তাদের পয়সার অভাব হয়নি, সেকথাও না হয় ধর্তব্যের মধ্যে না হ'লো। কিন্তু সমানে সমানে ধরলেও পোলদের বীরত্বের পরিচয় পাই যখন এই মহত্তর যুদ্ধে ইউরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাদের তুলনা করি। উদাহরণস্বরূপ ঃ

ওলন্দাজরা পাঁচদিন পরে আত্মসমর্পণ করে।

সতেরো দিনের দিন বেল্‌জ্‌দের রাজা লেওপল্‌দ্‌ সসৈন্য বশ্যতা স্বীকার করেন।

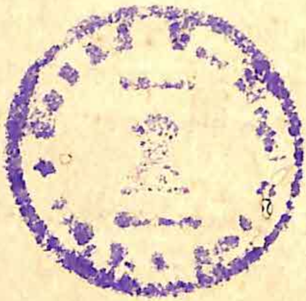
প্রবল পরাক্রান্ত ফ্রাঁস্‌ও সাঁয়ত্রিশ দিন লড়বার পর অসঙ্কোচে সন্ধি প্রার্থনা করে।

ভারশৌ আত্মসমর্পণ করে আটাশ দিন পরে। অক্টোবরের মাঝামাঝিও প্রদেশে প্রদেশে পোলরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে। আর আজ হাজারে হাজারে পোল সৈনিক গৃহহারা, ছন্নছাড়া অবস্থাতেও শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করেনি।

যখন একথা ভাবি, তখন মনে পড়ে ভারশৌএ সামরিক-বিভাগের প্রকাণ্ড অট্টালিকার ওপর লেখা দু'টি কথা ঃ

Honor i Ojczyzna

আত্মসম্মান ও মাতৃভূমি!



প্রচ্ছদপটের বিবরণী

লাল ও শাদা, পোলদেশের দ্বিবর্ণ পতাকা। শাদা জমীর ওপর নক্সাটি পোলরাষ্ট্রের প্রতীক, বিস্তৃত-পক্ষ ঈগলের পরিকল্পনা, মোটা কাপড়ের ওপর সুতো-তোলা, একটি চাষার মেয়ের নিরাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ। ছবিখানি শ্রীমতী Maria Stefkowa প্রকাশিত পোলীয় গ্রাম্য সূচী-শিল্পের নিদর্শন-সংগ্রহ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থকারের অন্য বই

হাতের কাজ

গল্প-সমষ্টি। পোলীয় দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি বাস্তব চিত্র। সম্পূর্ণরূপে রোমান্তিকতা-বর্জিত জীবন্ত কাহিনী। মৌলিক রচনা।

THE NATIONAL LITERATURE CO.
CALCUTTA